

গোলকচন্দ্রের আত্মকথা।



"চেহ্‌ল্‌ সাল ওম্‌রে আজিজৎ গুজাশ্‌ত,
মেজাজে তু আজ হালে তিফ্‌লি না-গাশ্‌ত।"
(অমূল্য চল্লিশ বর্ষ বিগত হইল,
সারল্য, চাপল্য বাল্যের তবু না ঘুচিল।)

—করিমা—শেখ সাদী।



শ্রীমান মিছা-গোলকচন্দ্র ঠাকুর
বিবৃত
এবং
কাজী দীন মোহাম্মদ, বি-এ, বি-টি,
প্রণীত।

[মূল্য ১৷৵০]

৮২, সদর বক্সী লেন, হাওড়া
হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতার বড় বড় পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মুদ্রাকর :—শ্রীনফর চন্দ্র সরকার।
বিজয় প্রেস
১২নং খুরুট রোড, হাওড়া।

স্নেহের সতীশ,

মাত্র পনর বৎসর বয়সে নিষ্ঠুর বেরি বেরির ক[illegible]ড়িয়া ইংরাজী ১৯৩৮ সালের ৫ই জুন [illegible]বারে সকাল ৯ ঘটিকার সময়ে হাওড়া জেনারল হাঁসপাতালে তুমি যখন শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলে তখন যে কলিজা-ফাটা করুণ-দৃশ্য আমার চোখে পড়িয়াছিল তাহা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তুমি আজ এ পাপময় ভব-দরিয়ার ওপারে পরম শান্তিতে রহিয়াছ। এ নশ্বর পৃথিবীতে এই পুস্তকের সহিত আমি তোমার স্মৃতি জড়াইয়া রাখিয়া ভাল করিলাম কি না তাহা আমি নিজেও বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমার—

'মনাকাকা'।

উপহার।



তারিখ

গোলকচন্দ্রের 'গোল'-এর হিসাব।

১।	গোলকচন্দ্রের নামে গোল	১
২।	গোলকচন্দ্রের পায়ে গোল	৪
৩।	গোলকচন্দ্রের নেশায় গোল	১৬
৪।	গোলকচন্দ্রের সাহিত্য-সেবায় গোল (প্রথম উদ্যম)	৩৭
	(দ্বিতীয় উদ্যম)	৫৪
	(তৃতীয় উদ্যম)	৬৬
	(চতুর্থ উদ্যম)	৭০
	(পঞ্চম উদ্যম)	৭৫
৫।	গোলকচন্দ্রের পাটীগণিতে গোল ...	৮৩
৬।	গোলকচন্দ্রের রাজনীতিতে গোল	৯০
৭।	গোলচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষায় গোল	১০৫
৮।	গোলকচন্দ্রের পেটে গোল	১১৭
৯।	গোলকচন্দ্রের চরিত্রগঠনে গোল	১২৯
১০।	গোলকচন্দ্রের বিবাহে গোল	২০৫

পরিচয়-লিপি।

আমার "গোলকচন্দ্রের আত্মকথা" অনেকে শুনিতে চাহিয়াছেন; সেইজন্য, ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ৺ললিত বাবু লিখিয়াছেন.—"লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্য কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছেলের নাম কার্ত্তিক; তথা ব্যাকরণের গ্রন্থের নাম - মনোরমা, দর্শনের গ্রন্থের নাম—কুসুমাঞ্জলি ও পঞ্চদশী! ইহা ছাড়া, যমকে ফাঁকি দিবার জন্য হেলা ফেলা নাম, যথা,—ফেলারাম, কেনারাম, বেচারাম, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি। তথা, সমালোচককে ফাঁকি দিবার জন্য পুস্তকের নাম—ছাইভস্ম, মশলাবাঁধা কাগজ, পাগলের প্রলাপ!" আমার 'গোলকচন্দ্রের আত্মকথায়' তত্ত্বকথাই বেশী। এটাও একটা গোল।

৺বঙ্কিম বাবু তাঁহার 'কমলাকান্তের দপ্তরে' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'; ৺ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'ফোয়ারায়' ও 'পাগলা ঝোরায়' এবং আরও অনেকে এই ধরণের অনেক-কিছুতে কত আবোল তাবোল বকিয়াছেন। আমিও না হয় একটু বকিলাম। ছোট কথা বড় মুখে বলিলে বড় শুনায়, আর বড় কথা ছোট মুখে বলিলে মানায় না। সুতরাং ছোট কথাগুলি ছোট মুখেই বলিলাম। ইহাতে

পাঠকদের কিঞ্চিৎ মনস্তুষ্টি এবং সমাজের ও জাতির ছোট রক
কল্যাণ সাধিত হইলে আমি নিজেকে বড় মনে করিব।

যত্ন করিয়া প্রুফ দেখা সত্ত্বেও বর্ণাশুদ্ধির কবল হইতে
মুক্ত হইতে পারি নাই। ছাপার কাজ চলিতে চলিতে
চন্দ্রবিন্দুগুলি ভাঙ্গিয়া ভাগিয়া পড়ে। এমতাবস্থায় অনুনাসিকের
জন্য পাঠকদিগকে ঘরের পত্নী ও ঘরের কানাচের পেত্নীর
উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। মারাত্মক ভুলের মধ্যে
আমার মান্যবর প্রফেসর রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর লিখিত
'বিবি-বউ' ৫৯ম পৃষ্ঠার ১ম লাইনে 'ক'নে-বউ' হইয়া গিয়াছে
আমাদের দেশের মেয়েদের ম্যাচুরিটি (Maturity) নাকি
এক্সটিক (Exotic)। অতএব, এ প্রকার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা না
চাহিলেও চলিত। কিন্তু, শাস্ত্রকারেরা ছাড়িলেও নীতিকারের
ও আইনজ্ঞেরা যে রেহাই দিবেন সে ভরসা কম। সুতরাং ক্ষমা
চাহিলাম। মওলবী নজির আহম্মদ চৌধুরী তাঁহার 'ফারুক
চরিতে' লিখিতেছেন,—"হজরত হাফ্‌ছা ও আবদুল্লাহ্ ব্যতীত
হজরত ওমর ফারুকের সন্তানবর্গের মধ্যে ওবেদুল্লাহ্, আ'ছেম
আবু-শাহ্‌মা, আব্দুর রহমান, জায়দ এবং আবু-তল্‌হা
প্রসিদ্ধ। আ'ছেম কবি বলিয়া আরবময় বিখ্যাত ছিলেন।"
অতএব, ১৪৪ম পৃষ্ঠার ৯ম লাইনের 'একমাত্র' শব্দটী 'একটি'তে
পরিবর্ত্তিত হইবে। ৩০শ পৃষ্ঠার ৩য় লাইনে 'শরণে' এবং ৪৬
পৃষ্ঠার ২১ম লাইনের 'সাক্ষর'—ইহাদের উপর সময়মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি
নিক্ষেপ করিতে পারি নাই, পারিলে উহারা যথাক্রমে 'শরণে

ও 'স্বাক্ষর' হইয়া যাইত। ৫৭ম পৃষ্ঠার ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ লাইনে 'ক্লাস্'.ও 'ক্লাশ'—এই দুইটি ওলটপালট করিয়া লইবার ভার পাঠকদের স্কন্ধে চাপাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম। আরও দুই একটি ভুল থাকিতে পারে, সেগুলিও সংশোধন করিয়া লইবার ভার সর্ব্বংসহ পাঠকদের উপর ন্যস্ত রাখিতে বাধ্য হইলাম। যদি আমার তেমন সৌভাগ্য হয়—তবে আগামী সংস্করণে পাঠকদিগকে এই-সব 'পরের বোঝা বহিবার' মত অপ্রীতিকর কার্য্য হইতে রেহাই দিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

রোমীয় পুরাণে একটা গল্প আছে। জুপিটার (Jupiter) মানুষের নিজের দোষ ও অন্যায় কার্য্যগুলি একটি থলিয়ায় পুরিয়া উহা তাহার সম্মুখভাগে এবং পরের দোষ ও অপকর্ম্মগুলি আর একটি থলিয়ায় পুরিয়া উহা তাহার পশ্চাদ্ভাগে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—মানুষ পরদোষ দেখিবার পূর্ব্বেই আত্মদোষ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া আত্মলীন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আত্মবিসর্জ্জন, আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু, এ সমাজে স্ব-সম্বন্ধে সকলেই আত্মবিস্মৃত ও উদাসীন, প্রত্যেকে মাথাটী ঘুরাইয়া লইয়া পরের দোষই দেখিতেছে। কবি জসীম উদ্দীন তাঁহার 'নক্সী কাঁথার মাঠে' একখানা নক্সা আঁকিয়াছেন। যুবক রূপাই দূরসম্পর্কীয় খালাত বোনের (মাসতুত বোন) প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহার খালা আম্মার বাড়ীতে কেবল ঘোরা-ঘুরি করে—খালাকে ও বোনকে এটা,

ওটা, সেটা কিনিয়া দিয়া আসে,—রুপাইয়ের মা এসব জানিয়াও ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

"কান্-কানা-কান্ ছুটল কথা গুন্-গুনা-গুন্ তানে,
শোন্-শোনা-শোন্ সবাই শুনে, কিন্তু কানে কানে।
'কী করগো রুপার মাতা, খাচ্ছ কানের মাথা?
ওদিকে যে তোর রুপার নামে রট্‌ছে গাঁয়ে যা-তা'।
রুপার মা কয়,—'রুপা আমার একরত্তি ছেলে,
আজও তাহার মুখ শুঁকিলে দুধের ঘিরাণ মেলে।
তার নামে যে এমন কথা রটায় গাঁয়ে গাঁয়ে,
সে যেন তার বেটার মাথা চিবোয় বাড়ী যেয়ে।'
ক'জনকে আর ঠেকিয়ে রাখে? বুঝ্‌ল রুপার মা,
রুপা তাহার সত্যি ক'রেই এত টুকুন না।"

এদেশের অনেকের ছেলে-মেয়ে চিরকালই এইপ্রকার 'দুধের ছেলে' থাকিয়া যায়, প্রয়োজনমত নিজেরাও দুধের ছেলে সাজেন। সেইজন্য, দোষের বোঝাগুলি সম্মুখে ঝুলাইয়া দিলাম। কেহ যে সত্য করিয়াই 'এতটুকুন না' তাহা নিজে নিজে বুঝিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব। পিতা ও পুত্র-কন্যা, স্বামী ও স্ত্রী, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী, লেখক ও পাঠক এবং সমালোচক—এক কথায় মুরব্বি ও মোখ্‌লেস্ সকলেই এই পুস্তক হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন—এরূপ ভরসা রাখি।

ভাব ও ভাষার ক্রম সর্ব্বস্থানে বজায় রাখিতে পারি নাই,—সেটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ। কেননা,—বিরহ, দুঃখ, বিচ্ছেদ

এগুলিকে সরস করিতে চেষ্টা করিলে আরও বেশী অপরাধ হইত। জ্ঞাত অবস্থায় কাহারও ভাব বা ভাষা চুরি করি নাই,—যথাস্থানে যথারীতি বন্ধনীর মধ্যে—(“ ”)—প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়াছি। তবে, ‘পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়া’টা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হইয়াছে। যে-সব মনীষীর দ্রব্য লইয়াছি তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই এ বিশ্বাস আমার আছে। সুতরাং তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া এ অধমকে মাফ্ করিলে এ যাত্রা রক্ষা পাই। শেষ দুইটী পরিচ্ছেদ লিখিতে স্মাইল্‌স্ সাহেবের ‘ক্যারাক্টার’ (Smiles' Character) নামক পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছি।

চব্বিশ পরগণা জিলার সাউথ গোরিয়া নিবাসী উদীয়মান তরুণ শিল্পী শ্রীমান শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রচ্ছদপটখানি আঁকিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অভিজ্ঞতার চেয়ে অজ্ঞতাই আমার বেশী। সেইজন্য, পাঠকদিগের নিকট এই পরিচয়-লিপি পাঠাইয়া মাফ্ চাহিতেও লজ্জা পাইতেছি। দোষদর্শী সমালোচকদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবার অঙ্গীকার করিয়া, খোশ্-মেজাজে ও বাহাল-তবীয়তে নিম্নে স্বাক্ষর করিলাম।

পোঃ-পাটগাতি
(ফরিদপুর)

বিনয়াবনত,
কাজী দীন মোহাম্মদ।
১লা জুলাই, ১৯৩৯।

গোলকচন্দ্রের আত্মকথা।

গোলকচন্দ্রের আত্মকথা।

গোলকচন্দ্রের নামে গোল।

জন্মিয়াছিলাম কোন্ সালে ঠিক মনে নাই। মনে থাকিলেও বলিতাম না, কারণ, তাহা হইলে এই আত্মচরিতের ভূমিকাতেই তোমরা আমাকে ঠাওরাইয়া বসিতে একটা মায়ের পেটের ইঁচড়েপাকা ইশ্‌কাবনের টেক্কা। যাহারা মায়ের বা বাপের নিকট হইতে নিজেদের জন্ম-তারিখ শিখিয়া লইয়া যেখানে সেখানে হু-বহু নকল করিয়া ব্যবহার করে তাহাদিগকে আমি দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। সেইজন্যইত সেবৎসর কাঠগড়ায় সাক্ষ্য দিবার সময় "তোমার বয়স কত" প্রশ্নের জবাবে হাকিম বাবুকে বলিয়াছিলাম—এ প্রশ্নের জবাব বাবাই দিতে পারেন, আমি যখন জন্মিয়াছিলাম, তখন সাল ও তারিখ হিসাব করিবার মত ক্ষমতা আমার হয় নাই। শিখান কথা বলিব কেন? উহা যদি ঠিক না হয়।

তারপর আমার নাম? আমার নাম লইয়া ওলটপালটের অভিনয় হইয়া গিয়াছে অনেক। জন্মের পরমুহূর্ত্ত হইতে কে আমাকে কী বলিয়া ডাকিতেন অনেকদিন ধরিয়া আমি তাহা জানিতে পারি নাই। জানিলেও মনে নাই। আবছা আবছা

মনে পড়ে, যখন এক পা দুই পা করিয়া হাটিতে শিখিয়া তখন মা ডাকিতেন 'হীরে', বাবা ডাকিতেন 'হরি', দাদা ডাকিতে 'হরু' আর ঠাকুর-দাদা-বুড়া ডাকিতেন 'হারুদা'। বড় ঘরে ছেলে, দুধ-কলা খাইয়া মোটা হইয়া উঠিলাম। দাদা একদি গ্রাম্য পাঠশালায় লইয়া গেলেন। গ্রাম্য পাঠশালার স্কু পণ্ডিতের কাছে এমনভাবে নাকাল হইতে হইবে আগে জানিলে সেই প্রথম দিনই দাদার পশ্চাদ্দিক হইতে চম্পট দিতাম ভাবিয়াছিলাম—পাঠশালা বুঝি বাড়ীর রান্নাঘরের চাইতেও লোভনীয়। সেকথা থাক্। দাদা বলিলেন—"আমাদের হরুর নাম লিখিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লয়েন।" এক পণ্ডিতছাত্র আবার দাদার মোটা গলায় উচ্চারিত 'হরু' স্থানে 'গরু' বুঝিয়া লইল। সেই অবধি পাঠশালার ছোঁড়া বন্ধুরা ডাকিত 'গরু'। আর একটু বড় হইলে এই অপমান আমার সহ্য হইত না। কিন্তু অত অল্পবয়সে কীল চুরি করিয়া বুদ্ধিমানের মত হার মানাই ভাল (দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য) মনে করিতাম।

ক, খ, ছাড়াইয়া বানান, পরে ফলা এবং তাহারও পরে নাম লিখিতে শুরু করিলাম। এইবার জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলাম। শুধু 'হীরে', 'হরি', 'হরু' বা 'হারুদা' ইহার কোনটাই যে নাম হইতে পারে না তাহা বুঝিয়া লইলাম। হিরণ্ময় ঠাকুর, হরিহর ঠাকুর, হরিসদয় বা হারাণচন্দ্র ঠাকুর—ইহার কোন্‌টী যে আমার নাম তাহা বুঝিতে না পারিয়া পড়িলাম মহা ফাঁপরে। সেইজন্যই বাপের দেওয়া নামের প্রতি ছোটবেলা হইতেই জন্মিয়া গেল

একটা বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ। আর তাহারই ফলে নামের গোল আমার আজিও মিটিল না। এইস্থানে একটা সূক্ষ্ম তত্ত্ব-কথা বলিয়া রাখি,—মানুষের মনে প্রথম যে রংএর ছোপ লাগিবে তাহা শত ধৌতেন ন মুঞ্চতিঃ। মনোমত নাম আর আমার ইহজন্মে মিলিবে না।

হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।—পাঠশালার ক্ষুদে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সরাসর উঠিয়া গেলাম মধ্য ইংরাজী স্কুলের লাইব্রেরী ও আফিস-হলে। বাবা পাকা খাতায় আমার নাম লেখাইলেন হরিকিষণ—বয়স লেখাইলেন আট বৎসর। হরিকিষণ নাম কিন্তু আমার পছন্দ হইল না। নামের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা যে জন্মিয়াছিল তাহাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আবার আর এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “বাঙ্গালীর ঘরে মাড়োয়ারী নাম কিছুতেই শোভা পায় না।” মোসলমানের ঘরে পবন হালদার, গগন মণ্ডল ও গোপাল বিশ্বাস যেমন গোল পাকাইয়া তোলে,—বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে হরিকিষণ নামও তেমনি অশোভন মনে হয়। খেয়ালের বশে বাবা ও মা তো নাম রাখিয়া ভবনদী পাড়ি দিয়া সরিয়া পড়িবেন, তখন জের টানিতে হইবে আমাকেই। তাই, হরিকিষণ নাম আমূল পরিবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। কিন্তু বাবা ও মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে মনে সাহস পাইলাম না।

তারপর হাইস্কুলে গিয়া ঘানি টানিতে শুরু করিলাম। ঘানি টানিয়া টানিয়া আরও নিস্তেজ ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু পাড়ার বন্ধু-মহল স্ফূর্ত্তিদান করিতে কসুর করে নাই কোনও দিন। ঐ স্ফূর্ত্তিটুকুর নেশা না থাকিলে হয়ত এতদিন মা বাপের আগেই ভবনদী পাড়ি দিয়া পরপারের যাত্রী সাজিতে হইত। হরিকিষণ ঠাকুর কী করিয়া গোলকচন্দ্র ঠাকুরে পরিবর্ত্তিত হইল তাহা পরে জানাইব। শুধু এইটুকু জানিলেই হইবে যে, মনের মত বউ না হইলেও সংসারে স্ফূর্ত্তি করিয়া দিন কাটান যায়, তাহাকে লইয়া সুখে গৃহসংসারও সাজাইয়া বসা যায়, কিন্তু নামটা মনের মত না হইলে জীবনে মনের সুখে দিন কাটান দুষ্কর হইয়া উঠে। সেই নিমিত্ত ভগবানের নিকট বাবা ও মায়ের মৃত্যু কামনা করিয়া কত প্রার্থনাই করিয়াছি—বাবা ও মা মরিলেই ত আমি নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু ভগবান সে করুণ ক্রন্দন কানে তুলিলেন না। সেইজন্য আমার নামে রহিয়া গেল একটা মস্তবড় গোল।

গোলকচন্দ্রের পাশে গোল।

কথায় বলে—"ভগবানের মার দুনিয়ার বার," তাহা না হইলে এই পূর্ণ সাতসাতটা বৎসর ধরিয়াও ঠাউরিয়া উঠিতে পারিলাম না যে, স্কুল হইতে কলেজে উঠিবার সিঁড়িটা কতখানি উঁচু। এই একটা সিঁড়ি ভাঙ্গিতেই আমার দফারফা হইয়া গেল। নীচের সিঁড়িগুলিতেও হোচট খাইয়াছি, তবে একেবারে চিৎ হইয়া পড়িতে হয় নাই। আমাদের শিক্ষক গিরীশ বাবুর মত বাত্তিকওয়ালা ফুটবল খেলোয়াড় যদি ঐ দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস্এর

বৃহৎ প্রকোষ্ঠে আর একজন থাকিতেন, তাহা হইলে, ইণ্টার-ইউনিভার্সিটী কম্পিটীশনের দোহাই দিয়া অনেক আগেই টেক্কা মারিয়া বসিতাম। গিরীশ বাবু এই স্কুলে না থাকিলে অনেক আগেই স্কুলের সঙ্গে ননকো-অপারেশন করিয়া ঐ ভুঁড়িওয়ালা হেড্মাষ্টার মহাশয়কে একটা দীর্ঘ নমস্কার ঠুকিয়া সরস্বতীর নিকট হইতে ছাড়পত্র লইতে হইত। প্রত্যেক বৎসর প্রমোশনের সময় ঐ বেঁটে বেয়াড়া পেটমোটা লোকটী আমাকে আটকাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফুটবলদেবের দৌলতে আমি হেড্মাষ্টারের উপরেও এক চাল মারিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছি। গিরীশ বাবু যখনই শুনিয়াছেন যে, প্রমোশন না পাইলে আমি তাঁহাদেরই রাইভাল স্কুলে কোনও উপরের ক্লাসে বেহেসাব দাখিল হইয়া যাইব, তখনই তিনি চিংড়ি মাছের মত তিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছেন এবং স্কুলের বোনাফাইড্ ফুটবল টীমের ইজ্জৎ রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ভুঁড়িওয়ালা লোকটীর হাত ধরিয়া আমার নামের শেষে লালকালীতে "P" বসাইয়া দিয়াছেন।

ইউনিভার্সিটীর এই প্রথম সার্টিফিকেটখানা যোগাড় করিতে পারিলে বোধ হয় এম্-এ. ডিগ্রি অনায়াসেই পাইতে পারিতাম, কারণ, যতই উপরে উঠা যায় ততই কম বিষয় (Subjects) পড়িতে হয়! তাহার উপর আবার কলেজে নাকি পড়িতে হয় না, কলেই মানুষ জন্মায় অর্থাৎ লেখাপড়া কলকব্জা দ্বারাই শিখান হয়, সেইজন্যইত এইসব বিদ্যামন্দিরের নাম দেওয়া

হইয়াছে কলে-জ। সকলে বলে, এই ফুটবল খেলার দোহাই দিয়া আমি প্রমোশন পাইয়া নাকি একটু কাঁচা ছিলাম, তাই, প্রবেশিকার প্রবেশদ্বারে বার বার আঘাত পাইয়া ফিরিতে হইতেছে। কিন্তু আমি নিজে বুঝিতে পারিলাম না—কাঁচা আমি কিসে? ফুটবল খেলার দৌলতে শরীরটা হইয়াছে হাড়ের মত শক্ত—একথা কেবল আমি কেন—যাহার সঙ্গে একবার টক্কর লাগিয়াছে সে-ই স্বীকার করিবে। আর আমার মনটা যে একেবারে ইঁচড়ে পাকা একথা স্কুলের শিক্ষকছাত্র, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, শত্রুমিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন. এতদ্ভিন্ন ফৌজদারিতে একদিন সাক্ষ্য দিবার সময় স্বয়ং হাকিম বাবুও বলিলেন যে, 'ছোকড়া একদম ইঁচড়ে পাকা'। অতএব, আমার নামের শেষে "ইঁচড়ে পাকা" কথা দুইটী সরকার বাহাদুরের পাকা খাতায় পর্য্যন্ত লেখা হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ উহাই আমার রেজিষ্টার্ড ট্রেড্‌মার্ক। মন এবং শরীর এই দুইটী লইয়া মানুষ গঠিত—এই দুইটীতে আমি পাকা—তাহা হইলে কাঁচা আমি কিসে?

তবে ফুটবল খেলাটা যে আমার পরীক্ষাপাশের একটা অন্তরায় তাহা আমি চোখ বুজিয়াই স্বীকার করিব; কিন্তু তোমরা যেভাবে ধর সেভাবে নয়। পরীক্ষার পরেই যখন শিক্ষক মহাশয়েরা এবং ছাত্রবন্ধুরা শুনিতেন যে, আমি পরীক্ষায় ভালই লিখিয়াছি, তখন হইতে তাঁহারা আদা-জল খাইয়া ভগবানের কাছে কেবল এই প্রার্থনাই করিতেন যেন আমি পাশ না করি,

পাশ করিয়া কলেজে দাখিল হইলে তো স্কুলের বোনাফাইড্ ফুটবল টীম একদম কানা হইয়া যাইবে। বুকে টোকা দিয়া বলিতে পারি এ ধারণাটী আমার একদম সত্য।

কিন্তু মুশ্‌কিল হইয়াছে এই যে, শতকরা একশ' জনের ধারণা যে যাহারা আমার মত বেপরিমান ফুটবলের ভক্ত তাহারা শতকরা নিরানব্বই জন আমারই মত স্কুলে আর কলেজে ভোঁতা ছাত্র বলিয়া পরিচিত। ফুটবল খেলুয়া ছাত্ররাই নাকি সরস্বতীর most neglected। কিন্তু তবু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, সরস্বতীর বরপুত্র হওয়া যতটুকু কৃতিত্বের, ফুটবলদেবের দাস হওয়া তাহা হইতে ঢের বেশী কৃতিত্বের। ফুটবলদেবই কলিকালের স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ—এবং সেই কারণে ওঁরই পিছনে আমি পরম বৈষ্ণব।

ফেল হইবার আর একটি কারণ কী তাহা বলিতেছি।—হেড্‌মাষ্টার মহাশয় এবং বাবা—ইঁহারা বকিয়া বকিয়া আমার বুকের বল কমাইয়া ফেলিয়াছেন, সেকারণেও দুই একবার আবার ডিগবাজী খাইতে হইতেছে। পরীক্ষার পরে যখন বাবার কাছে বলিতাম—"ভালই লিখিয়াছি" তখন তিনি দাঁত খিঁচুনী মারিয়া বলিতেন,—"তুই ভাল লিখিয়াছিস্ না মন্দ লিখিয়াছিস্ তাহা বুঝিবারও ক্ষমতা তোর নাই। আমি জানি যে টাকা দেওয়া আমার বোকামী।" আর হেড্‌মাষ্টার মহাশয় বলিতেন,—পূর্ণ বিশটী বৎসরেও যদি আমি পাশ করিতে পারি তাহা হইলে তিনি হাতে চুড়ী পরিয়া স্ত্রীলোক সাজিবেন।

এখন মনে কর—আমি যদি চেষ্টা চরিত্র করিয়া পাগ্লই করিয়া বসি তাহা হইলে ঐ বেঁটে বেয়াক্কেল বিদ্যাদিগ্‌গজ লোকটার কী উপায় হইবে। সাধে কি আর লোকটাকে আমার বেয়াক্কেল বলিতে ইচ্ছা হয়? মনে পড়ে, কুমুদ আমার চেয়ে বেশী নম্বর পাইত বলিয়া সে বৎসর পরীক্ষার সময় তাহার বই আনিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম। তাই যখন জানাজানি হইয়া গেল তখন হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সকল শিক্ষকের সামনেই বলিয়াছিলেন—"দেখ বাপু, সোজা কথা বলি—তোমার চোখ দেখিলে আমার ভয় হয়—তোমার মনে যা আসে তাই যদি তুমি কর তবে তুমি বছরে ছয়মাস জেলে থাকিবে।" সেই অবধি হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের সামনে আর চোখ খুলিয়া দাঁড়াই না, আর মনে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাও করি না,—দুই এক সময়ে মনে ইচ্ছা হয় বই খুলিয়া পড়ি, কিন্তু অক্ষয় কথা ঐ হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের, তাই ছয়মাস জেলের ভয়ে বই খুলি না।

আর একটা ছোট্ট কানকথা তোমাদের না বলিয়া পারিতেছি না। কোন সময়েই জোরে পড়িতাম না; কী জানি যদি আমার বিদ্যা-বুদ্ধি সব ধরা পড়িয়া যায়! "টু ফাইণ্ড দি সেণ্টার অফ্ এ গিভেন্ সার্কেল"কে "টু ফিণ্ড দি কেণ্ট্রী অফ্ এ জাইভেন কির্কেল" (To find the centre of a given circle) বলিয়া পড়িলে কাহারও বাবারও সাধ্য ছিল না যে ভুল ধরিতে পারে, আমার নিজের বাবার কথা ত দূরে। তাহাছাড়া, একবার জোরে পাঠ শুরু করিলে চুপ করিয়া কিছু চিন্তা করিবার যোটি

থাকে না, বাবা ও মা চেঁচাইয়া উঠিবেন—"কিরে পড়ছিস্ না কেন, ঘুমুচ্ছিস্ নাকি ?" এসব ফ্যাসাদের ভিতর পড়িয়া অযথা হয়রাণ হইতে যাইব কেন ? চুপ করিয়া পাঠ করিবার গুণ অশেষ। খাতির-জমাভাবে, দেলদরিয়া মেজাজে বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া আমি যদি আমার মন-ঘুঘুকে কলিকাতায় গড়ের মাঠের ফুটবল ক্ষেত্রে অথবা চৌরঙ্গীর ছোট্ট মেমটীর সঙ্গে অচেনা বিলাতের কোন বায়স্কোপের ঘরে পাঠাইয়া দেই, তাহা হইলে তাহাকে ধরিয়া আনিবার সাধ্য কাহারও আছে কি ? আর যদি পাঠ্যপুস্তক ফেলিয়া রাখিয়া উপন্যাস পড়িয়া দিন কাটাই, তাহা হইলেও বাবা মনে করিবেন--আমি তাঁহার পড়ুয়া ছেলে বিকালে খাইবার সময় বড় কই মাছটী আমার পাতে আসিবেই। সেই কারণে, অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন—তাঁহারা তিনবার 'হাঁ' এর সঙ্গে একবার 'হেঁ'ও বলিবেন—বলিবেন—হাঁ হে, হাঁ, হাঁ আস্তে পড়াই ভাল, ব্যাঙের মত গলা কচ্লানোতে ফল কী ? তবে ঐ বেয়াক্কেল হেড্মাষ্টার মহাশয় দুই একদিন বলিতেন—"তোরা জোরে পড়িস্—তাহাতে কান আর জিহ্বা এই দুইটী ইন্দ্রিয়ের কাজ বাড়িবে। অতএব, মনে রাখিবার সুবিধা হইবে।"

সময়মত বিবাহ দেওয়া মা বাপের কর্ত্তব্য, না দিলে অনেক বিষময় ফল ফলে। জীবন-সঙ্গিনীকে পাইলে বোধ হয় পাশ করাটা সহজ হইত। যে বৎসর প্রথম ক্লাস টেনে উঠি সেই বৎসরই ষোলর কোঠায় পা দিয়াছিলাম। তখন হইতে অবিশ্রান্ত ভাবরাজ্যে বিচরণ আরম্ভ করিয়াছিলাম। মনটী আমার পাড়ায়

যতটুকু ঘুরিত পড়ায় ততখানি ঘুরিত না। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পজেটিভ্ ও নেগেটিভ সাজেস্‌শান দিয়া মাতৃদেবীর কাছে প্রকাশ করিলাম,—পড়া ছাড়িব, সন্ন্যাসী সাজিব, দেশত্যাগ করিব ইত্যাদি। মাও বুঝিলেন, কিন্তু সুফল ফলিল না। বাবা আমার কৃপণের একশেষ,- বি- এ পাশ করিলে যে একটা মস্ত ডাউরী পাওয়া যাইবে। তাহার উপর আবার মেজদাদা পরিষ্কার ফৎওয়া দিয়া বসিলেন যে, নববধুর বদনমণ্ডলের দিকে চাহিলেই বিদ্যামন্দিরের দ্বার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয়। অথচ আমার মনে হইত যেন বিবাহই আমার জীবনের স্পর্শমণি—ফুটবলদেবের রাইভাল পরীক্ষা-পাশের ভাগ্য-বিধাতৃ সরস্বতী দেবী বিবাহের সঙ্গেই জড়িত। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার পরে মানুষের উপকারে লাগিতে পারে এই ধারণা লইয়া এই স্থানে এবং এই প্রসঙ্গে একটা উপদেশবাণী না শুনাইয়া পারিলাম না। আমি ভুগিয়া ভুলি নাই, ভুগিয়া শিখিয়াছি। কিন্তু দুঃখ হয়,—এই চরম অভিজ্ঞতার সুফল নিজের জীবনে একটুও ভোগ করিতে পারিলাম না। কেননা, জীবনের ভুলের কোনও প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না। একবার ভুলপথে অগ্রসর হইলে ফিরিবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। "আমার মন-তুরঙ্গ ছুটে চলে, লাগাম মানে না" বয়সের সময় যাহারা এই প্রকার বন্ধনহারা, ছন্নছাড়া গান গায়,- তাহাদের জীবনের শোচনীয় পরিণতি—"মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারি না," "আমার ভুলের নাহি অন্ত দুঃখের নাহি শেষ" প্রভৃতি গানে

ফুটিয়া উঠে। ভাবরাজ্যে বিচরণ করিবার স্পৃহা বালক বা বালিকার মনে যে বয়সে প্রবল হইয়া উঠে,—যখন কিছুতেই তাহার মন শান্ত হইতে চায় না,—সেই দারুণ সন্ধিক্ষণে তাহার ভীষণ ক্ষুধার মুখে নূতন নূতন তথ্যপূর্ণ বিষয় পরিবেশন করিতে হইবে। রাশীকৃত পুস্তকের নীচে ফেলিয়া তাহার মনের উগ্রতাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে। পাড়ায় ঘুরিবার স্পৃহা—পড়ায় ঘুরিবার স্পৃহাতে পরিণত করিতে হইবে। মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি (instinct) যখন দমন (inhibit) করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই তখন উহাকে সুপথে চালিত করিতে চেষ্টা করাই সুবুদ্ধির কাজ। বিচক্ষণ অভিভাবক এ বিষয়ে কখনও ভুল করেন না,—তিনি বালক-বালিকার এই বয়সের উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। দুর্দ্দমনীয় মনতুরঙ্গকে লাগাম কষিয়া ঘানির জোয়ালের নীচে ফেলিতে তাঁহার মোটেই কষ্ট হয় না। এ অবস্থায় পড়িলে ঘোড়া সহজেই পোষ মানে এবং উহার দ্বারা অসম্ভব কার্য্য সম্ভব করিয়া লওয়া চলে। যে অভিভাবক ইহা না বুঝিয়াছেন তাঁহাকে আত্মগ্লানিতে পুড়িতে হইবে ইহা স্থির নিশ্চিত;—তিনি কৃপার পাত্র।

যাহা হউক, সরস্বতীদেবী বিবাহের সহিত জড়িত এবং বিবাহ আমার জীবনের স্পর্শমণি,—এ সব কথা বাপ-মা আত্মীয়স্বজনের নিকট বলিবার যো নাই। বিবাহ না দিলে আমি পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিব না—এই খোশ-খবরটী

মা বাপের নিকট বিলাতী ঢঙে প্রকাশ করিবার ভাষা বাঙলাদেশের আদবকায়দা লেহাজ-তমীজ-পূর্ণ অভিধানের পাতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে এই নিখুঁত মনের কথাটী মোলায়েম করিয়া পরীক্ষকদের অন্তরে একবার ঢুকাইবার ইচ্ছা ছিল,—হয়ত তাহাতেও উৎরে যাইতে পারিতাম। কিন্তু ঘরপোড়া গরুর সিন্দুরে মেঘ দেখিলে যেমন ভয় হয়, আমারও তেমনি ভয় হইতেছে—আবার সেবৎসরের মত উল্টোরকমের ফল ফলিয়া না বসে। পঞ্চমবারে যখন সে বৎসর পরীক্ষা দেই—সেই বৎসর কি কঠিনই না হইয়াছিল প্রশ্ন! অঙ্কের পরীক্ষার দিন সরল গুণ অঙ্কটী ছাড়া আর কোন অঙ্কের ভিতরেই ঠোঁট বসাইতে পারিলাম না। খাতার দুই একখানা পাতা তো অন্ততঃ ভরা চাই। আবার মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া থাকিলে হাঁড়গিলার মত সব গার্ডগুলা চাহিয়া চাহিয়া দেখে—তাই কাগজের উপর কলম ঘষিয়া আইনের খসড়া করিলাম।—"গভর্ণমেণ্টের ফৌজদারি বা আদালতের আইন অনুসারে—কোন ব্যক্তির কোন প্রকার দণ্ডবিধান হইলে সাধারণতঃ সেই অপরাধটীর জন্য পুনর্ব্বার দণ্ডবিধান হয় না,—এমত অবস্থায় যে অঙ্কের জন্য ক্লাসে শিক্ষকের নিকট বেত খাইয়াছি, বাড়ীতে বাবার নিকট হইতে বকুনি শুনিয়াছি আর সহপাঠীদের বিদ্রূপবান সহ্য করিয়াছি—এই তিন তরফা শাস্তির পরেও সেই অঙ্কের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা যে কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না বা করিলেও আমার প্রতি অন্যায় অবিচার করা হইবে ইহা

ধ্রুব সত্য।" আবার সেই বৎসর বাঙলায় প্রবন্ধ ছিল— "Write a letter to your friend stating the events of your life affecting your moral and intellectual activities." প্রবন্ধ লিখিবার কায়দা অবশ্য আমি জানিতাম— "An essay should have a glorious beginning, an argumentative middle and a more intensified glorious end" এই প্রবন্ধের মারফতে পরীক্ষকের মনে ঢুকিয়া কাজ বাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। প্রবন্ধটীর শেষ কয়েকটী লাইন তোমাদিগকে না শুনাইয়া পারিলাম না,— "শৈশবের শত আশা, শত বাসনা লইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম,—যৌবনের উদ্দাম তেজে সমস্ত বাধা বিঘ্নকে হেলায় উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর সমক্ষে আমিও একজন কালিদাস বা মোহাম্মদ মোহসীন বা রবীন্দ্রনাথ অথবা মহাত্মা গান্ধীর মত বিরাট মহাপুরুষরূপে পৃথিবীর প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারিব। কিন্তু পরীক্ষারূপ নিদাঘমার্ত্তণ্ড আমার সমস্ত আশাভরসা ভস্মীভূত করিয়াছে। পরীক্ষার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার জীবন প্রায় ক্ষয় হইয়া গেল। এই আমার পঞ্চমবার, এবারেও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের সুমতি না হয়, তাহা হইলে পৃথিবী বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে দেখিবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষে একজন কৃতী ক্ষণজন্মা বাঙ্গালী মহাপুরুষ অকালে আত্মহত্যা করিয়াছে। সেইদিন অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা তাঁহাদের জুলুমবাজীর ফল দেখিয়া আফ্‌সোস্ করিবেন।" বাঙলা

ভাষার পরীক্ষকের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, কিন্তু অঙ্কের পরীক্ষকের নিকট ফল ফলিল উল্টোরকমের। তিনি হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন—"তোমার স্কুলের অঙ্কের কাগজ আমার নিকট আসিয়াছিল। তুমি আমার বাল্যকালের বন্ধু, তোমার স্কুলের রিপিউটেশন নষ্ট করিতে পারি না, তাহা না হইলে, এই আজব জানোয়ারটীর কাগজখানা সোজা কণ্ট্রোলারের নিকট প্রেরিত হইত। ইহার পর হইতে তাহাকে সাবধান হইতে বলিও।" তারপর আবার শুনিতে পাইলাম আমারই সাগ্‌রেদ্ একজন—পরীক্ষার খাতায় লিখিয়াছিল "Sir, এবার নানাপ্রকার অসুখের জন্য পড়িতে পারি নাই, অনুগ্রহ করিয়া পাশের নম্বর দিবেন।" একটা বিরাট রসগোল্লা নাকি তাহার কাগজের উপর দেওয়া হইয়াছিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া একটু ভয় লাগিতেছে, তাই, আমার মনের ভাবটা পরীক্ষকের নিকট জানাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সাহস পাইতেছি না।

মোটকথা, ফেল করিবার তো মুখ্য-গৌণ আরও কত কারণ আছে—কিন্তু বলিবার সুবিধা পাই কই? তোমরা মনে করিতেছ, আমি গর্দ্দভ ছেলে বলিয়া প্রতিবৎসর ফেল মারিতেছি, কিন্তু এখন হয়ত আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ। ফেল করিবার এইসব কারণ বন্ধুবান্ধবদের নিকট প্রকাশ করিতে সময়ও লাগে ভাষারও দরকার হয়, তাই, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই বলি, - বৎসর ভরিয়া রোগে ভুগিলাম, পড়িব কখন? আরও

দেখ, এই একযুগ ধরিয়া একই স্কুলে যাইতেছি—অপরিচিত কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলি,—এই স্কুলে মাষ্টারি করি। আবার গত বৎসর ফেল করিবার পর বাবা পরিষ্কার বলিয়াছেন—"এবারেও ফেল মারিয়াছ—বেশ করিয়াছ—যাও এখন গরু চরাও আর ঘাস কাট।" সেই অবধি বাবা পড়ার খরচ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বাবাগুলার কি আর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে? সাধে কি আর বলি যে, মাষ্টার গুলাকে যেমন ট্রেনিং দিবার বন্দোবস্ত আছে—গার্জ্জিয়ানগুলাকেও তেমনি করিয়া ট্রেনিং দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এ মাসের টাকা ওমাসের ১৫ই তারিখে আবার ওমাসের টাকা দুই মাস পরে এমনি করিয়া যাহাতে গার্জ্জিয়ানেরা টাকা না পাঠান তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এবার পরীক্ষা দিয়া আসিলাম, কেহই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না যে আমি কেমন লিখিয়াছি। বাবা অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু মায়ের সাক্ষাৎ ভাই মামাতো আর জিজ্ঞাসা না করিয়া পারেন না। তিনি ইংরাজী প্রশ্ন-পত্র-খানা ধরিয়া Correction টা কী লিখিয়াছি তাহাই প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন। গড় গড় করিয়া বলিয়া গেলাম্। মামা জিজ্ঞাসা করিলেন—"By hook or by crake কে By hook or by prek কেন করিয়াছিস্?" আমি বলিলাম "একটা যদি hook হয় তাহা হইলে অন্যটা ঐ জাতীয় একটা কিছু অর্থাৎ পেরেক না হইয়া যায় কোথায়?" ঠাকুরদা কাছেই ছিলেন—তিনি বলিলেন—

"দাদা, ইংরাজীতে ওসব বুদ্ধির চাল চলে না। – ছোটকালে B, u, t – বাট; P, u, t, – পুট; B, u, s, y – বিজি; B, u, r, y,— ব্যারি—F, u, r, y,—ফিউরি; – প্রভৃতির ধাক্কা কুলাইয়া গিয়াছ, কিন্তু ক্রেক এর স্থানে পেরেক লিখিয়া ধাক্কা সামলাইতে পারিবে না।" দেখা যাউক, পরীক্ষার ফলতো বাহির হউক, হয় এসপার, না হয় ওস্পার। তবে এস্পারে যদি থাকিয়াও যাই তাহা হইলে দুঃখ হইবে না—কেননা, মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহসীন, রামদুলাল সরকার; মহর্ষি রত্নাকর, কামাল পাশা প্রভৃতি কয়জন ইউনিভার্সিটীর খেতাবধারী? অথচ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জলন্ত অক্ষরে ইঁহাদের নাম রহিয়াছে। মোটকথা, পাশ করিতে এত গোল হইল বলিয়া যে জীবনটীর কার্য্য-কলাপ এত তালগোল পাকাইয়া যাইবে তাহাই বা কেমন করিয়া কল্পনা করা যায়?

গোলকচন্দ্রের নেশায় গোল।

সত্যিকারের নেশা অবশ্য কোনদিন করি নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে নেশা করিতে হয় – যেমন,—আফিং, গাঁজা, চরস, ভাং, মদ প্রভৃতির সদ্ব্যবহার – ইহার কোনটীই করি নাই। ছোট নেশা করিতে যাইয়া যে সব এড্ভেঞ্চার করিতে হইয়াছে তাহাই বলিতেছি।—

তখনও কথা মুখে ভাল করিয়া ফুটে নাই। আধা আধা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গৎ বলিয়া ঠাকুরদার কাঁধে চড়িতে কত আরাম ছিল! দাঁত বলিতে যাহা বুঝায় – ঠাকুরদার মুখগহ্বরে তাহার

শানাও ছিল না। অতএব, পাণ* বা তামাকের সেবা করিবার সময়, তাঁহার ঐ লোলঃচর্ম্ম-বিশিষ্ট মুখ-গহ্বরটী যেন আস্ত কামার-শালার হাপরের মত কাজ করিত। গুড়গুড়ির নলের ভিতর দিয়া দৈনিক যে পরিমাণ ধূম্র টানিয়া আমার ঠাকুরদা উদ্গিরণ করিতেন, তাহার দ্বারা, বোধ হয়, ধূম্র-সরবরাহ করপোরেশন স্থাপন করিয়া কলিকাতা সহরের বিড়ি-সিগারেট দোকানগুলির দফা রফা করা যাইত। আর পাণের পিকে বাড়ী লালে লাল। বাড়ীর ধার দিয়া কেহ তামাক না খাইয়া যাইতে পারিত না। গ্রামোফোনে 'একটি কথা কও না কও, বন্ধু, তামাক খেয়ে যাও' রেকর্ডখানা চড়াইয়া ঠাকুরদা মাথার ভঙ্গী করিতেন আর তামাক টানিতেন। সুরুচি-সম্পন্ন কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিলে বুঝিতে পারিতেন যে, পাণের পিক নদীতে বাহির করিয়া দিবার জন্য পাকা ড্রেনের দরকার। আমাদের ঘুমের ব্যাঘাতও কি কম হইত? রাত্রি চারিটা না বাজিতেই পাণ-সুপারি গুঁড়া করিবার ঠক্কর ঠক্কর শব্দ। ঠাকুরমার উপর কড়া হুকুম ছিল,—'বেড্‌পাণ (বেড্‌প্যান নহে) তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে।' ঐ পাণ তামাকের কোনটীকে সময়মত না পাইলে নাকি আমার ঠাকুরদার পেট ফাঁপিত আর গা বমি বমি করিত।

*পাণ চর্ব্বণ করিতে হয়, উহা পান করা চলে না। অতএব, 'পান' ছাড়িয়া পর্ণ শব্দের অপভ্রংশ 'পাণ'ই গ্রহণ করিলাম, কেননা, পাণ সকল পর্ণের (পাতার) শ্রেষ্ঠ।—গ্রন্থকার।

ঠাকুরদার পাণ তামাক খাওয়া দেখিতে আমার বড় ভাল লাগিত। পাণ খাইবার সময়ে অপরিচিত কেহ দেখিলেই মনে করিত যে, ঠাকুরদা মুখের ব্যায়াম করিতেছেন। ঠাকুরদার নিমিত্ত চূর্ণ পাণ-সুপারির অংশ গ্রহণ না করিয়া আমি ছাড়ি নাই। ঠাকুরদার গুড়গুড়িটা ছাড়া একটা হুকাও ছিল, সেটাকে আমরা ডাব্বা বলিতাম। আমরা যখন ঠাকুরদাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিতাম, অর্থাৎ কিনা, তাঁহার ঘাড়ে চড়িয়া দোল দিতে ইচ্ছা হইত তখনই ডাব্বার যোগাড় করিয়া দিতাম। ডাব্বা যদি দূরে থাকিত তাহা হইলে, দুই হাতে তুলিয়া পেটের সহিত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিতাম,—'এই নেও তোমার ডাব্বা।' তখন বুড়ার কত আনন্দ! আমাদের ধাক্কায় ধাক্কায় যেটুকু হয়রাণ হইত, ডাব্বাকে একটিবার মাত্র চুম্বন করিয়া বুড়া তাহা হইতে অনেক বেশী আহ্সান বোধ করিত।

এইভাবে, খেলা করিতে করিতে ডাব্বার সহিত কুটুম্বিতা ঘনিষ্টতর হইয়া উঠিল। এইবার আমিও ডাব্বাকে চুম্বন দিলাম। বড় মধুর লাগিল। আরও চুম্বন দিলাম। এইরূপে, প্রতিদিন চুম্বনের অজস্র শ্রাবণ-ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে এমন হইল যে, ডাব্বা ছাড়া আর আধা ঘণ্টাও থাকিতে পারিতাম না। আর একটু বড় হইয়া ঠাকুরদার লেজ—অর্থাৎ—কাছা ধরিয়া হাটে যাইতাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন,—"কী খাবিরে?—এক পয়সার বাতাসা কিনে



"এই নেও তোমার ডাব্বা।" তখন বুড়ার কত আনন্দ !

দেই"*। আমি বলিতাম,—'না, এক পয়সার বিড়ি কিনে দেও।' তিনি বলিতেন,—"আচ্ছা তাই-ই সই।" ঠাকুরদার সহিত এত, কিছু হইত বাবা তাহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। তার পরে, মধ্য-ইংরাজী স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধুবান্ধবের নিকট

হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া, কখনও বা কাগজ ও কাঠ-পেন্সিল কিনিবার পয়সা হইতে কিছু চুরি করিয়া বিঁড়ির যোগাড় করিতাম এবং বাবুগিরির নেশায় সিগারেট বা বিড়ি ধরাইয়া ধূম্র উদ্গিরণ করিতে করিতে পথ দিয়া চলিতাম, মনে করিতাম— –হাম, কী হুজুর!

এই সময়ে তুন্‌য়ার সমস্ত মাধুর্য্য, মুখভরা হাসি আর বুকভরা অনাবিল স্নেহধারা লইয়া বৌদি আসিয়া ঘর আলো করিয়া বসিল। মুখভরা হাসি আর বুকভরা ভালবাসা দান করিবার সঙ্গে বৌদি আমাকে পাণও দান করিতে কসুর করে নাই। অনেক কষ্ট করিয়া চন্দ্রাপীড় পত্রলেখাকে পাইয়াছিল, কিন্তু আমি বিনা-কষ্টেই পত্রলেখার চাইতেও মধুরতর, সুন্দরতর তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনীর সন্ধান পাইলাম। আমার ঠোঁট দুইটী লাল না দেখিলে নাকি আমার বৌদির ভালই লাগিত না। আর পাণের সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া গল্প করিতে না পারিলে আমার বৌদির গল্পে স্ফুর্ত্তি লাগিত না।

বৌদি বোধ হয় পাণ লইয়া একটু বেশী নাড়া-চাড়া করিয়াছিল (মানে—research work)। অতএব, এই প্রসঙ্গে একটা ছোটখাট বক্তৃতা ঝাড়িতে তাহার কষ্ট হইল না। "পাণ খাওয়া না শিখিলে বাঙলাদেশ হইতে পাণের চাষ উঠিয়া যাইবে। তাহা হইলে, 'শুভদৃষ্টির সময়ে ক'নের ঢলঢলে মুখ পাণ দিয়া ঢাকা' চলিবে না, স্ত্রী স্বামীকে বশ করিবার জন্য 'পাণের সহিত শিকড় বাটিয়া' খাওয়াইতে পারিবে না, কবিরাজ 'পাণের

অনুপান' পাইবেন না, দারোগা বাবুদের 'পাণ খাইবার বক্‌-শিস্‌' মিলিবে না। ডাঁনাঝরা পরীরা আর 'মিঠাপাণের খিলির' সহিত মিঠাকথা বেচিবে না, 'ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসিকে' 'বাঁটা ভরে পাণ' দেওয়া চলিবে না। অতএব, খোকাখুকি ঘুমাইবে না,--ফলে, স্বামী-স্ত্রীর আলাপের সময় মিলিবে না।

"পাণ কিন্‌লাম, চূণ কিন্‌লাম, ননদভাজে খেলাম।
একটি পাণ হারালে দাদাকে বলে দিলাম॥"—

এই সব মধুমাখা ছড়া আর বাঙ্‌লা ভাষার মধুরতা বর্দ্ধন করিবে না। এই প্রকার বিপদ হইতে বাঙ্গালী সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সে-বৎসর ('১৩১৭ সাল) যখন 'পাণে পোকা' আছে এই পাণাতঙ্ক (Panic) বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিয়াছিল তখন ৺রায় চূণীলাল বসু বাহাদুর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া খবরের কাগজের মারফতে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্র-দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়াও পাণে পোকা পান নাই। কায়েমী-ভাবে পাণের গাছ যাহাতে বাঙ্‌লার মাটিতে শিকড় বসাইতে পারে তাহার জন্য তিনি তাঁহার "শারীর-স্বাস্থ্য বিধান" পুস্তিকায় পাণের যথেষ্ট গুণ গাহিয়া গিয়াছেন। Pan-creatic juice খাদ্যদ্রব্য পরি-পাকের জন্য অপরিহার্য্য। আহারান্তে পাণ চিবাইলে নাকি ঐ Juice অবাধে নিঃসৃত হয়, সেইজন্য, উহার নাম হইয়াছে Pan-creating (পাণ-নিঃসৃত ?) Juice।" বৌদির বক্তৃতা শুনিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ দোল খাইতেছিল। এইস্থানে

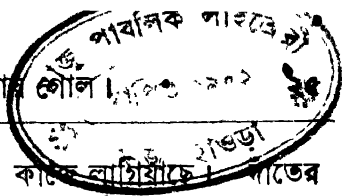
সেটা বলিয়া রাখা ভাল বিবেচনা করিতেছি। বোধ হয়, ইউরোপীয় দেশবাসীরা আগে খুব বেশী পাণ খাইত। তখনও বাঙলায় পাণের প্রচলন হয় নাই। ইউরোপ আবিষ্কার-ক্ষেত্রে অগ্রণী। সেদেশে একবার কে নাকি পাণের বরজের মধ্যে ভূতের আবাস আবিষ্কার করিয়াছিল। সেই সময় হইতে তাহারা পাণের চাষ তুলিয়া দিল এবং Panic (পাণাতঙ্ক) শব্দের সৃষ্টি করিয়া লইল। কালক্রমে, ঐ শব্দের ব্যাপ্তি ঘটিয়া সকল প্রকার আতঙ্ক বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

বাঙলাদেশে ঠিক এমনি একটা পাণাতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া পাণকে চিরতরে বিতাড়িত করিবার জন্য হয়ত কেহ সে-বৎসর (১৩১৭ সাল) 'পাণে পোকা' আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার কল্পনাপ্রসূত আতঙ্ক সত্যই বাঙ্গালী সমাজে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। ৺চূণী বাবু দেখিলেন তাহার নামটা যখন চূণ হইতে উদ্ভূত তখন পাণকে বিতাড়িত করিতে পারিলে অচিরেই চূণ ও খয়েরের দেশান্তর (দ্বীপান্তর নহে) হইবে। এইরূপে হয়ত তাঁহাকেও বিপদে পড়িতে হইবে। তাই, তিনি পাণকে পোকা হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলেন। কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরে, কাঁচা বয়সে মানুষকেও ঘুণে ধরিতে পারে; কিন্তু পাণকে পোকায় ধরা অসম্ভব—ইহাই তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। হুজুগে বাঙ্গালীরা তাহা শুনিবে কেন? ইহারা গ্যালিলিওর মত জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিল,—"অনুবীক্ষণে না দেখিলে কী হইবে—Still it moves!" কিন্তু এত করিয়াও পাণ শেষ পর্য্যন্ত

বিতাড়িত হইল না। যাক, আবার ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতেছি। আমার আত্মকথার মধ্যে ওসব তত্ত্বকথার দরকার কী? আবার আমার আত্মকথায় ফিরিয়া আসিলাম।

যদিবা দুই একবার পাণ খাইতে না চাহিতাম তাহা হইলে, আমার বৌদি আমাকে ভয় দেখাইত। বলিত,—"পাণ-খাওয়া শেখ, না হইলে বউয়ের সঙ্গে, শালীদের সঙ্গে আলাপ জমাইতে পারিবে না।" আমি ভয়ে ভয়ে পাণকে আঁকড়াইয়া ধরিলাম। শেষে, এমন হইল যে পাণের ডিবা সঙ্গে না লইয়া আর স্কুলে যাইতে পারিতাম না। বৌদি বলিতেন,—"কুস্ পরোয়া নাই, আমিতো আছি,—গণ্ডায় গণ্ডায় পাণ তৈয়ার করিয়া দিব।" শার্টের হাতায়, বুকে, ধুতির কোঁচায় প্রভৃতি স্থানে চূণ খয়েরের ও পাণের পিকের রং বেরংয়ের কিম্ভূত-কিমাকার দাগ না লাগিলে ভালই লাগিত না। মনে পড়ে, একদিন স্কুলে সম্মুখের একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া খাতির-জমাভাবে পাণ চিবাইতেছি, আর ডিবাটী খুলিয়া তদারক করিয়া দেখিতেছি বাকী কয়টীতে সেদিনকার মত চলিবে কিনা। এমন সময়ে পড়িলতো নজর—বাবা, একেবারে—যমদূতের মত হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের। তিনি বেশী কিছু আর বলিলেন না, কেবল হোমিওপ্যাথিক ডোজে—"জাবর কাটিতেছ বুঝি"—বলিয়া আপ্যায়ণ করিলেন এবং পুকুরের জলের সাহায্যে তখনই মুখ পরিষ্কার বা সাফ্ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। ধুইয়া আসিলে চলিবে না, একেবারে সাফ্ করিয়া আসিতে হইবে! সেই অবধি স্কুলে পাণ খাওয়া ছাড়িয়াছি। কারণ, মদের

বোতল যাহারা একচুমুকে ফতুর করিয়া থাকে তাহারা পাণের কিম্বৎ না বুঝিয়া পাণ খাওয়াকে অপবিত্র একটা কিছু খাওয়ার মত মনে করিবে,—এহেন কাহারও কাছে পাণের মর্য্যাদা নষ্ট হইল, বা পাণের মুখে চূণকালী পড়িল, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব কেন? কিন্তু কিছুদিন পরে একবার পড়িলাম মুশ্‌কিলে। খাইতে স্বাদ্‌ পাইতাম না, যাহা কষ্টে-সৃষ্টে গিলিয়া ফেলিতাম তাহাও হজম হইত না। মনে পড়ে, বাবা বলিতেন যে, তিনি লোহা খাইয়া হজম করিতে পারিতেন, আর তাঁহারই সুপুত্র (ভাল করিয়া শুনিও, সু যেন কু হইয়া না যায়) হইয়া আমি ডালভাত যাহা মুখ-গহ্বরেই অর্দ্ধেক হজম হইয়া যায়—তাহাও হজম করিতে পারিতাম না। বাবা প্রমাদ গণিলেন। ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার বাবুর ফৎওয়া শুনিয়া বাবা চক্ষু তুলিলেন চড়ক-গাছে, আর আমি পড়িলাম মহা ফাঁপরে। ডাক্তার বলিলেন,—পাণ খাওয়াতেই আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। পাণ খাইলে জিহ্বার উপরে আবরণ পড়িয়া জিহ্বার কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, স্বাদ না পাইলে লালা নির্গত হয় না এবং লালা নির্গত না হইলে হজম শক্তির হ্রাস হয়। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কী হইবে?" ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"হইবে আর কী? রোজ সকালে দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইবার সময় খেজুর গাছের একটি পাতার সাহায্যে টানিয়া টানিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করিতে হইবে, জিহ্বা সাফ্‌ হইলেই খাইতে স্বাদ পাইবে এবং হজমও হইবে।" চারি পাঁচ দিন



পরে দেখিলাম ডাক্তার বাবুর কথাই কাজে লাগিয়াছে। দাঁতের অবস্থাও নাকি ঐ পাণেই বড় কাহিল করিয়াছিল। ডাক্তার বাবুর পরামর্শ মত ডেণ্টাল হাঁসপাতাল হইতে দাঁত পরিষ্কার (Scrape) করাইলাম। মাংসপেশী হইতে দাঁতের সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। দাঁত যখন পরিষ্কার করা হইতেছিল তখন যে পরিমাণ রক্ত পড়িয়াছিল তাহার ভিতরে মানুষ সাঁতার কাটিতে পারুক বা না পারুক, পিপীলিকা যে তিন চারিটা তাহার ভিতরে ডুবিয়াই মরিয়া গিয়াছিল—এ সত্য কথা আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি। যাহা হউক, কয়েকদিন পরে যখন বাড়ী আসিলাম তখন বাড়ীর পাশের অন্য মানুষের, কথাতো দূরে, আমার বৌদি পর্য্যন্ত আমাকে চিনিতে পারিতেছিল না। দাঁতগুলি নাকি আমার মুক্তার মত ঝকঝকে হইয়াছিল। আর ঐ ঝকঝকে দাঁতের এমনই আকর্ষণ যে গ্রামের সকলে দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিল। কয়েকজন আমাকে খোসামোদ করিল তাহাদিগকে কলিকাতা ডেণ্টাল হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য এবং আর কয়েক জন আমার নিকট হইতে ঠিকানা লিখিয়া লইল। আমার বৌদি পাণ খাওয়া ছাড়িল, কিন্তু আমার দাঁতের মত তাহার দাঁত ঝকঝকে করিতে পারিল না বলিয়া হা-হুতাশ ও আফসোস করিতে লাগিল। সেই অবধি বৌদি আর আমি দুই জনেই ছাড়িয়া দিয়াছি পাণের নেশা করা।

আর তামাকের সহিত যে বিচ্ছেদ হইয়াছে তাহার কারণ

অনেক। ঐ বাড়ীর শ্যামার বাবা যে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে রক্তবমি করিয়া মরিয়াছিল তাহার হুঁকা খাইয়া নাকি শ্যামার বাবার শালার ছেলেরও ক্ষয়রোগ হইয়াছিল। ফুস্‌ফুসে ঘা হইয়া যে সে-বৎসর করম আলী মুন্সী অক্কা পাইয়াছিল, তাহার কারণ, সে বেশী তামাক খাইত। নাইকোটীন বিষে নাকি ফুস্‌ফুস্ জর্জ্জরিত করিয়া দেয়। তামাকেই নাকি নাইকোটীন বিষ আছে। আবার গলার ভিতরে ফেরেঞ্জাইটীস্ রোগ ধূমপানেই নাকি হয়। তারপর আবার দেখ, নাড়ুদের বাড়ীতে কেহ যায় না। নাড়ুর বাবা দিন ভরিয়া খক্ খক্ কাশে আর তার বাড়ীর চারিধার কাশথুতুতে ভরিয়া রাখে। তবেই বুঝিতেছ,—প্রত্যক্ষভাবে তামাকে বন্ধুত্ব আঁটিয়া দেয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে তামাকে বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদের সূত্রপাতও করাইয়া তোলে। আরও শোন, সেদিন কেদাড়ি বলিল যে, তাহার ঠাকুরদা বেশী তামাক খাইত বলিয়া মরণের সময় কফ্ আটকিয়া মরিয়াছিলেন। মরণের পূর্ব্বে তার ঠাকুরদা একদিন আমাকে ডাকিয়া আমার সাম্‌নেই হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দৈনিক তিনি দুই পয়সার তামাক ও দুই পয়সার পাণ খাইতেন - তাহাতে মাসে তাঁহার ত্রিশ আনা অর্থাৎ প্রায় দুই টাকা খরচ হইত। বৎসরে কম্‌ছে কম বাইশটী টাকা। তিনি সত্তর বৎসর জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে গড়ে ষাট বৎসরও যদি তিনি এইভাবে পাণ-তামাকের সেবা করিয়া থাকেন তাহা হইলে, তিনি জীবনে বিনাকারণে শরীরের ক্ষতি করিবার জন্য

একহাজার তিনশত বিশটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ঐ টাকায় জমিদারি তালুকদারি ক্রয় করা যাউক আর না যাউক, একজন লোক যে অনায়াসে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িতে পারিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কম্‌ছে কম দশটী করিয়া সিগারেট খাইতাম—দুই আনা তাহার দাম, পাঁচ ছয় পয়সার পাণ ও চারি পয়সার নস্য ব্যবহার করিতাম। অবশ্য একাই যে এতগুলি পয়সার শ্রাদ্ধ করিতাম্ তাহা নহে। বন্ধুবান্ধবকে আদর-যত্ন না করিলে চলিবে কেন? এখন মনে কর, ষাট বৎসর ধরিয়া যদি এইভাবে পাণ, তামাক ও নস্যের নেশা চলিত তাহা হইলে, কেদাড়ির ঠাকুরদার তিনগুণ পয়সা আমাকে ব্যয় করিতে হইত; আর শেষে ফল হইত পাঁচগুণ খারাপ, অর্থাৎ কিনা—জীবনে চারি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কুড়াইতে হইত রোগ আর শোক। হোম্‌রা-চোম্‌রা ছোট-বড় সকলেই এমনি করিয়া দুই একটা জমিদারি কিনিবার মত টাকা আধা পয়সা এক পয়সা করিয়া পাণ তামাকের নেশার সহিত উড়াইয়া দিয়া থাকেন। যাঁহারা মদের সেবা করিয়া দুইমাসে জমিদারি বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে আমরা অসভ্য ভাষায় গালি দিয়া সুখ পাই, অথচ পাণ-তামাকের নেশাখোরকে ডাকিয়া পাণ-তামাক খাওয়াই। পক্ষান্তরে, কেহ যদি পাণ তামাক দিয়া অভ্যর্থনা না করিল তাহা হইলে, আমরা তাহাকে বলিব কারুণের মত বখিল বা কঞ্জুস্। এসব মানুষের বুদ্ধির ঘোরপ্যাঁচ বা খেয়াল। কত ঘর-বাড়ী ঐ

আধা পয়সার কলকের আগুণে পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে, কত পাটের গুদাম ধানের আড়ৎ এতটুকু বিড়ির ছাইতে উড়িয়া গিয়াছে,—কিন্তু মানুষের হুঁশ্ কোনকালে ফেরে নাই, তামাকের নেশায় মশ্গুল তাহারা থাকিবেই। আমি কিন্তু এইসব দেখিয়া শুনিয়া ছাড়িয়াছি তামাকের নেশা করা।

যখন পাণ ও তামাকের সহিত প্রথম মিতালী হয় তখনও নস্যের ভক্ত হই নাই। ইহার কিছুকাল পর হইতে আমি নস্যের সাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সাধনার ফলস্বরূপ মুক্তিও পাইয়াছি। কেমন করিয়া নস্য আমাকে ভেড়া বানাইয়া নানা কাজ হাসিল করিয়া লইয়াছিল এবং অবশেষে, কেমন করিয়া আমার মুক্তি হইয়াছে তাহাই বলিতেছি।—

আমি যখন তেরর কোঠায় পা দিয়াছি, সাধনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিব বলিয়া মনে করিতেছি, তখন আমার জনৈক বন্ধু—লোকে যাঁহাকে পাঁথুরে-বাঁদর রামদাস বলিত—তিনি নস্য সম্বন্ধে একদিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার সারাংশ নিম্নরূপ :—

"শাস্ত্রে নাকি আছে,

তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং স্বেচ্ছয়া দীয়তে যদি।

অশ্বমেধ ফলপ্রদং টানে টানে চতুর্গুণম্॥

অর্থাৎ কিনা,—মহামূল্যবান তামাকের গুঁড়া নস্যরূপে ব্যবহার করিবার জন্য যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও প্রদান করে, তাহা হইলে, এক-একটান নস্যের পরিবর্ত্তে সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের চারিগুণ পুণ্য পাইবে। এতো গেল ভারতের কথা,

ইউরোপের কথা ভাবিলে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রাচীনকালে Scott এবং Jhonsonএর আমলেও এই মহামূল্যবান চীজের যথেষ্ট কদর ছিল। বাঙলাদেশে স্ত্রী স্বামীকে খুব আদর করে ও ভালবাসে বলিয়া নাম ধরিয়া ডাকে না। প্রাচীনকালে ইউরোপে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই Scott এবং Jhonson নস্যকে সোজা নাম ধরিয়া ডাকিতে সাহসী হন নাই। সেইজন্যই এই চীজের কিস্মৎ গিয়াছে অসম্ভব-রকম বাড়িয়া। উদাহরণ স্বরূপ Scottএর লিখিত—"Will you give me a small quantity of that thing which when put into the nostrils makes a sense of titilation there" এবং Johnson এর লিখিত—"Will you allow my forefinger to be dipped into that Pulverized tobacco that titilates the olfactory nerves"—এই দুইটি বাক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।" এইভাবে, আমার রামদাস বন্ধু বক্তৃতা শেষ করিলেন। আমার তৎকালীন মনের উপরে বক্তৃতাটি বড় কাজ করিল,—অর্থাৎ কিনা, সোনায় সোহাগায় মিল হইল। কারণ, ইহার পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুবান্ধবের কৌটা হইতে লইয়া একটু আধটু নাকে ঢুকাইবার অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল। বন্ধু-মহলে কাহাকেও নস্য টানিতে দেখিলেই বলিতাম,—"Will you give me a small quantity of that thing which when put into the nostrils makes a sense of titilation there?" কয়েকদিন

হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়াই আমার কাজ চলিল। অবশেষে, বুঝিতে পারিলাম নস্যের বিরহ সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাই,—শয়নে, স্বপনে, জাগ্রতে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বসময়ে নস্যের শিশি আমার পকেটে বা ট্ঁ্যাকে না থাকিলে আমার জীবন বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিত।

প্রথম প্রথম নাকের ভিতরে যখন নস্য পুরিতাম তখন ভক্ত-সাধকের সমস্ত গুণ আমার ভিতরে প্রকাশিত হইত। চোখে ভক্ত-সাধকের মত প্রেমাশ্রু বহিত, হৃদয় কী এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে ভরিয়া উঠিত,—মনে হইত যেন, কোন্ এক অপূর্ব্ব স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতেছি। অবশেষে, নস্যের শিশিটীকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া ভক্তি-গদগদ-হৃদে বলিতাম,—দেবি! তোমার গুণ অপরিসীম।

আগে ভাল ছাত্র বলিয়া সুনাম ছিল, কিন্তু নস্যদেবীর ভক্ত হইবার পর হইতে সরস্বতীদেবী বিরক্ত হইলেন; Back bench আমার বসিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং নিরাপদ স্থান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কারণ, ওখানে কাহারও নজর পড়িবে না। বোধ করি, মাষ্টার মহাশয়েরা আমার এরূপ উল্টোদিকে উন্নতির কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, পাইবেনই বা কেমন করিয়া? ঘটে অত বুদ্ধি থাকিলে তো? কেবল বলিতেন,—আমি নাকি গোল্লায় যাইতেছিলাম—এইসব। মোটকথা, আমি যে একটা জিনিষের নেশায় মশ্গুল হইয়া গিয়াছিলাম এবং শিক্ষক মহাশয় বা অন্য কোন মুরব্বিকে যে তাহা জানাইবার উপায়

ছিল না—এই মহাতথ্য তাঁহারা বোঝেন নাই। একটা ছোট কথা আমার নিকট শুনিয়া রাখ,—মুরব্বিকে যাহা জানান যায় না—সেইটাই দোষের, আমি আগে বুঝিতাম না, এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমরা যাহা মুরব্বিকে ফাঁকি দিয়া গোপনে করিয়া থাকি, তাহাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। কথায় বলে—'মানুষ ভুগিয়া শেখে', কিন্তু আমরা এইসব ভুগিয়া ভুলিয়া যাই।

তারপর, একদিনের কথা মনে পড়ে। কোনও সহপাঠী নস্য টানিতেছিল। অমনি অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে জোরে বাহির হইয়া পড়িল—"Will you give me"—এইটুকু বলিয়াই যেন একটা হোঁচট খাইলাম (হোঁচট ঠিক নয়—একটা Simile মাত্র)। সহপাঠীরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি তো এদিকে ওদিকে দুইবার তাকাইয়া একদম 'থ' হইয়া গেলাম। যমদূতের মত পণ্ডিত মহাশয় একেবারে ঘাড়ের উপরে। পণ্ডিত মহাশয়ের বিশুদ্ধ বাক্যবাণ আমার উপর ছাড়া আমার সহপাঠীদের উপরেও বর্ষিত হইতেছিল। আমার নস্য-গ্রহণকারী বন্ধুটীর উপর যেন চোট্‌টা একটু বেশী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি তো দেখিয়া শুনিয়া একেবারে 'থ' আর সহপাঠীদিগের প্রতি চাহিয়া দেখি তাহারা যেন সব হাত-পা-ভাঙ্গা 'দ'। কান দুইটার গোড়ায় হাত দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম,—ভাগ্যি ওদুইটা এখনও আধা-হাত লম্বা হয় নাই। কিন্তু ব্যাপার এখানেই থামিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সহাধ্যায়ীরা আমাকে পঙ্গপালের মত ঘিরিয়া ফেলিল।

সেই গোঁয়ার গোবিন্দ বীরেনও জোর-গলায় প্রকাশ করিল যে, যত অনর্থের মূল আমি। আমিই তাহাদিগকে অতসব গালি খাওইয়াছি। আর অঙ্কে ৯৯ পাওয়া বীরেন যে সে-বৎসর মাত্র তিন পাইয়াছিল, তাহার কারণ, অঙ্কের পরীক্ষার দিন আমি নাকে নস্য পুরিয়া একটা হাঁচি দিয়াছিলাম—তাহাতে অনেকেরই এটেন্‌শন ডাইভার্টেড্ হইয়াছিল। কত কী বলিতে বলিতে বীরেন ঠাশ্ করিয়া আমার ডানগালে এক চড় কষিল। আমি তো ভ্যাবা-গঙ্গারাম, তবে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিল আমার সুধীর,—মাথায় খাটো হইলে কী হইবে—বুদ্ধিতে অনেকের উপরে টেক্কা মারিত। সে বলিল,—"মারধর করিয়া লাভ কী—উহাকে বয়কট কর।" সুধীর না থাকিলে সেদিন দফাটা ঠাণ্ডাই হইত বটে! সকলে মিলিয়া বয়কট করিল। ওরা বলাবলি করিল যে, আমাকে শক্ত ঘানিতে ফেলিয়াছে, কিন্তু সত্যি সত্যি আমি একটুও ভড়কাই নাই। কারণ, সুধীর, রণজিৎ অজিৎ—ইহারা তো আমার সঙ্গে গোপনে গোপনে সকলেই কথা কহিত। ভাবিলাম,—দুন্‌য়ার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব ত্যাগ করে করুক, নস্যের জন্যই যখন আমার এত বিপদ তখন নস্যকে আর ছাড়িব না। সেই অবধি বন্ধুরূপে নস্য আমাকে কত সাহায্য করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। গাড়িতে বসিয়া ঘুম আসিয়াছে—একটিপ্ নস্য নাকের ভিতরে পুরিয়াছি কি ব্যস্! কিন্তু নস্য আমার যতটা উপকার করিয়াছে, তাহার চাইতে ঢের বেশী চেষ্টা করিয়াছে তাহার উল্টোটার

ভিতরে ফেলিতে, কিন্তু এড্‌ভেঞ্চারের নেশায় ওসবের ভিতরেও হরদম্‌ বেপরওয়াভাবে. চলিয়াছি।

নস্য টানিতাম বলিয়া মা বাপের নিকট কত গালি খাইয়াছি, আর বন্ধুদিগের অবজ্ঞা, দশ-বৎসর-বয়স্কা ছোট বোনের মুখ-ভেংচানি, বাসে ট্রেনে অপরের চোখ-রাঙ্গানি যে কত সহিয়াছি তাহার হিসাব দিলে একখানা পূরা বই হইয়া যাইবে। দুঃখের কথা আর কী বলিব,—ধোপাগুলি পর্য্যন্ত আমার কাপড় কাচিতে চাহিত না।

পয়সার অভাবে যখন নস্য কিনিতে পারিতাম না তখন কতজনের পা ধরিয়াছি একটিপ নস্যের জন্য। একদিনের কথা মনে পড়ে। কোনক্রমেই বাবার তহবিল হইতে পয়সা চুরি করিতে পারিলাম না। সেইজন্য, একটিপ নস্যের নিমিত্ত সারা সহরটী দয়ালবাবুর পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, তবু দয়ালের দয়া হইল না। অবশেষে, কোন ভদ্রলোকের ভাঙ্গা নস্য-শিশি কুড়াইয়া লইয়া ঘ্রাণ লইতেছিলাম। (আহা! সে ঘ্রাণ যেন আজও পাইতেছি!) হঠাৎ, সেই ভাঙ্গা শিশির একখানা ভাঙ্গা কাচ টানের চোটে নাকের ভিতরে বিদ্ধ হইল। তারপর, সেই চ্যাপটা নাক ফুলিয়া কলাগাছের মত হইল। হাঁসপাতালে যাইয়া কত কষ্টভোগ করিলাম। ডাক্তার বাবুরা বলাবলি করিতেন যে,—ভোঁতা নাকের ভিতরে না যাইত কোন অস্ত্র, না ছিল তাহাতে কোন ছিদ্র। একটু ফুলিয়া উঠিয়া ছিদ্রটা ছোট হইতে পারে, তাহা আমি স্বীকার করিতে রাজী আছি,

কিন্তু আমার নাক যে ভোঁতা—তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না, কারণ, নাকটী আমার দৈনিক. তিন পয়সার নস্য গিলিত। আর ছিদ্র যে তখনও ছিল তাহার প্রমাণটী সেইদিন হইয়া গেল—যেদিন একটি যুবতী নার্স ভুল করিয়া আমার টেবিলের উপরে একটী ক্লোরোফরমের শিশি রাখিয়া গিয়াছিল। শিশিটী দেখিয়া আমি ভাবিলাম—নার্সটীব বুঝি নস্য টানিবার বাতিক আছে। তাহার বাতিক থাকুক, আর না থাকুক, এই দীর্ঘ পনর দিন উপবাসের পরে ভগবানের অনুগ্রহেই যে আমি ঐ দুর্ল্লভ নস্য-শিশিটী পাইয়াছি—এইটী যেন আমি দিব্য চোখে দেখিতে পাইলাম। তাই, অনতিবিলম্বে শিশির কর্কটী খুলিয়া প্রাণের আবেগে দিলাম টান, তার পরে তো আবেশে বিভোর। হাঁসপাতালের সমস্ত ডাক্তার নাকি হইয়াছিল জড়। আমি তো দিব্য দুই ঘণ্টা পরে আহ্‌সান পাইলাম—আমার আর কিছুই হয় নাই—তবে লেফাফা-দোরস্ত নার্সটীকে যে আমারই দোষে "বেকুফ্ কাঁহাকা" বলিয়া একটা গালি খাইতে হইল—সেইজন্ত আমার একটু দুঃখ হইয়াছিল। নস্যরূপে বাজে জিনিষ বহুবার ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু এমন অবস্থা আর কোনও দিন হয় নাই। অনেকবার নস্যের অভাবে দেওয়ালের চূণকাম ঘষিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিয়াছি*—কিন্তু এমন অবস্থা এই প্রথম। ঐ কাল

* নক্শাখানি ইং ১৯৩২ সালে ডেভিড্‌হেয়ার ট্রেনিং কলেজের গোত্তান সম্প্রদায়িকে পঠিত হইয়াছিল। প্রফেসর ৺বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ভাবের আতিশয্যে বলিয়াছিলেন—"মনে হয়, কাজী সাহেব আমার প্রতি

শিশিটীতে যে কী ছিল তাহা দেখিবার অবসর আমার ছিল না।

ইহার দশবারো দিন পরে হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া বাড়ী যাইব বলিয়া ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমাদের বাড়ীর দারোয়ান—বেচারামের শিশি খুলিয়া একটিপ নস্য ডানহাতে ধরিয়াছি। এমন সময়ে ফুল-মোশানে ট্রাম আসিয়া পড়িল। ডানহাতের মহামূল্যবান্ জিনিষটা ফেলিতে পারিলাম না। বামহাতে ট্রামের পার্শ্বের হ্যাণ্ডেল ধরিয়াছি কি অমনি ছিট্‌কাইয়া সাম্‌নে পড়িলাম,—যেন রয়েল সার্কাসের সমরসেট (Somerset) (যাঁহারা বাঁহাতে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া বাঁদিক হইতে কোনও সময়ে ট্রামে বা গাড়ীতে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথা ভাল করিয়াই বুঝিবেন)। চাহিয়া দেখি, মেম্‌সাহেবের হাতে চেন-পরান কুকুর একটি ঘেউ ঘেউ করিতেছে, কিন্তু তাহার ঠ্যাং একখানা ট্রামের নীচে। কোমরের বেদনায় আমার জীবন যায়, সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই—তদুপরি মেম্‌সাহেব লাল-চোখে গালি পাড়িল,—"ড্যাম, ব্লাডি, ফুল।" তাহাতেও রেহাই হইল না, লাল-পাগড়ী-পরা রাস্তার পাহারাদার আসিয়া গয়না পরাইয়া দিল হাতে আর কোমরে। সব দেখিয়া শুনিয়া আমার

কটাক্ষ হানিয়া এইসব লিখিয়াছেন। হাঁসপাতাল-সংক্রান্ত ঘটনাটী ছাড়া আর সবগুলিই আমার প্রতি প্রযোজ্য। তবে নস্যের অভাবে আমি যে অনেকবার দেওয়ালের চূণকাম ঘষিয়া নাকে পুরিয়াছি—সেইটা বাদ পড়িয়াছে। স্বর্গীয় গুরুদেবের সুযোগ্য পুত্র—আমার বন্ধুবর—প্রফেসর অশোক কুমার সরকার এ-কথার সত্যতার প্রধান সাক্ষী। স্বর্গীয় গুরুদেবের ইচ্ছা এইবার পূর্ণ করা হইল।—গ্রন্থকার।

আত্মারাম তো গুড়ুম। কোর্টে হাজির হইয়া হাকিম বাবুকে বলিলাম - "মহাশয়, আইন করিয়া এই নস্যের সহিত আমার বন্ধনটা একটু শিথিল করিয়া দিন।" তিনি উপদেশ দিলেন— "বারোখানা মাস শ্রীঘর বাস করিয়া আইস—দেখিবে প্রেমের নেশা আপনিই কাটিয়াছে।" ইহার পর বাবার বহু টাকা খরচ করিয়া আপীল করিয়া তবে সে-বৎসর ঐ খাঁচার ভিতর হইতে আমাকে বাহির করিয়া আনিতে হইয়াছিল। সেই অবধি নস্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছি। শেষ-পর্য্যন্ত নস্য আমাব উপকার কবিত, কি অপকার করিত বলিতে পারি না। কারণ, কদমতলার করিমের নাকের ভিতর দিয়া নাকি পাঁচ ছয়বারেও ক্ষয়রোগের জীবাণু ঢুকিতে পারে নাই। নস্য টানিবার ফলে নাকি তাহার নাকের ভিতরটা নরম হইয়া থাকে। যত প্রকার দুষ্টরোগের জীবাণুই ঢুকিতে চেষ্টা করুক না কেন, ওখানে যাইয়াই আটকিয়া যায়। তবে আমার মনে হয়,— নস্য লওয়া ত্যাগ করিবার পরে আমার নাকটী নাকের মত কাজ করিতেছে, অর্থাৎ সুঘ্রাণ, কুঘ্রাণ সবৃই পাইতেছি। এমনি করিয়া আস্তে আস্তে আমি পূরাদস্তুর সাধু-পুরুষ বনিয়া গিয়াছি। অতএব, বুঝিতে পারিতেছ যে কোন নেশা-ই জ্যুৎসই করিয়া ধরিতে পারিলাম না। পাণ, তামাক, নস্য সকলেই গোল পাকাইয়া তুলিল।

গোলকচন্দ্রের সাহিত্য-সেবায় গোল।

(প্রথম উদ্যম)

একবার বড় হুজুগ চাপিয়া বসিল—সাহিত্যিক হইব। ৺শরৎ বাবু বা রবীন্দ্রনাথ কোন্ ছার -লিখিতে আরম্ভ করিলে কলম দিয়া আগুন ছুটিবে। কিন্তু, সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামিয়াই প্রথমে বানান (including ফলা) ও শব্দের যথাযথ প্রয়োগ লইয়া চলিত-ভাষা ও আমার মনের সহিত দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। অনেক কসরৎ করিলাম, পাঁয়তারা ভাঁজিলাম; কিন্তু ঐ দুইটাকে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। পৃথিবী, জীবিকা, প্রতীচীন, বিকিরণ, বিভীষিকা, বিজিগীষা, সন্মার্জ্জনী, ঊর্দ্ধ, ভূলুণ্ঠিত, পলিক্লী, জিহীর্ষু, মুহূর্ত্ত, মুমুক্ষু, মুমূর্ষু, শিশয়িষু প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিতে যাইয়া দুইটা ই, ঈ; দুইটা উ, ঊ; দুইটা জ, য; দুইটা ণ, ন; ও তিনটা শ, ষ, স—ইহাদের ধাক্কা সামলাইতেই ছয়মাস কাটিয়া গেল। 'ভীষণতার একটা মূল্য আছে,'—একথা এখন আমি মানি। বাঙ্‌লা-ভাষার বানান-সমস্যায় পড়িয়া তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছি। 'অজাত-শ্মশ্রু' (যাহার গোঁফদাড়ি উঠে নাই) লিখিতে যদি কপালদোষে 'অজাত-শ্বশ্রূ' (যে শাশুড়ীর বাপের ঠিক নাই) লিখিয়া ফেলি তাহা হইলে, বাঙ্‌লা-ভাষার কর্ণধারেরা লেখকের কর্ণ ধরিতে বাকী রাখিবেন না। 'বিজিগীষা' যে অজাতশ্মশ্রু বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি

করিবে তাহাতে কোনপ্রকার সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি,—পরীক্ষার সময়ে বাঙ্‌লা-নবীশ ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তও নাকি একদিন ৺ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"Well Bhudeb, how do you spell the word 'পৃথিবী'? I think it is 'প' এ 'র' দীর্ঘ 'ঈ,' 'থ' এ দীর্ঘ 'ঈ,' 'ব' এ দীর্ঘ 'ঈ,' (প্রীথীবী)। ৺ভূদেব বাবু ছিলেন পাকা বাঙ্গালী (মানে—বাঙ্‌লাভাষা-বিশারদ)। তিনি ৺মাইকেল দত্তকে সঠিক বানানটী বলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। মনে হয়, পরীক্ষার দিন ৺ভূদেব বাবুর কাছে না-জিজ্ঞাসা করিয়া বা না-দেখা-দেখি করিয়া লিখিলে ৺মাইকেল দত্ত বাঙ্‌লা পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিতেন না। মোটকথা, বাঙ্‌লা-ভাষার এই বানান শিখিতেই বাঙ্গালী ছাত্রদের জীবনের প্রাণবায়ু প্রায় অর্দ্ধেক বাহির হইয়া যায়। আমিও ভুগিয়াছি ঢের, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত বানান-সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই। যেদিন অভিধান খুলিয়া দেখিলাম,—জমিদারি, জমিদারী, জমীদারি, ও জমীদারী—এই চারিটী জমিদারি-ই কায়েম, সেদিন ঐগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে যতটুকু কষ্ট হইয়াছিল তাহার চাইতে ঢের বেশী আনন্দ হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে,—গলিত-দন্ত, পলিত-কেশ, শ্লথ-অঙ্গ, শিথিল-প্রতিভা, অথর্ব্ব অথচ অভিজ্ঞ অভিধান-লেখকেরা বাঙ্‌লা-ভাষার উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকদিগের ঠেলা সামলাইবার জন্য কম কষ্ট স্বীকার করেন নাই। শাশুড়ি, শাশুড়ি, শাশুড়ী, ও শাশুড়ী,—এই চারিটী শাশুড়ী-ই খাঁটী।

এখন কোন্‌টীকে রাখি, কোন্‌টীকে ছাড়ি। 'মাসী-পিসীর' বেলায়ও ঐ-প্রকার বিপদ। ভারী, প্রতীঘাত, প্রতীকার, পান-তামাক, ভূমী, শূয়ার, পাস, ফিস্‌ফিস্, আফ্‌সোস্ প্রভৃতি শব্দ যখনই সম্মুখে পড়িয়াছে তখনই অভিধানের পাতা উল্‌টাইয়া দেখিয়াছি—মুরব্বিয়ানা উপদেশ রহিয়াছে—"ভারি, প্রতিঘাত, প্রতিকার, পাণ-তামাক, ভূমি, শূয়ার, পাশ, আফ্‌শোষ, প্রভৃতি শব্দ দেখ।" অগত্যা আর এক-দফা পাতা উল্‌টাইলাম। তখন মনে হইল যে, বিজিগীষা, বিভীষিকা, মুমুক্ষু, ও মুমূর্ষু, প্রভৃতি শব্দ বানান করিতে যাইয়া হোম্‌রা-চোম্‌রা লেখকদেরও ইংরাজীর 'ডায়রিয়া' (Diarrhœa) বানানের মত একটু মুশ্‌কিলে পড়িতে হয়। সেইজন্য, ওগুলির বানান বাঙ্‌লা-ভাষায় ঠিক-ই রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকবারেই অভিধান কনসাল্ট (Consult) করিয়া লিখিতে হয় বলিয়া উহাদের রূপ বদলাইয়া যায় নাই, উহারা এরিষ্টোক্রাসী (Aristocracy) বজায় রাখিতে পারিয়াছে। ঐ শব্দগুলির একটির বানান ভুল হইলে পাঠকেরা চেঁচাইয়া উঠিবেন,—"এইরে, বানান জানে না, আবার বই লেখে!" কিন্তু আট-পৌরে শব্দগুলি যে ফুটবলের মত কেবল পায়ের ঠেলা খাইয়া গড়াইয়া বেড়াইতেছে তাই দেখিয়া মনে হয়—বাঙ্‌লা-ভাষা যেন কত অনাথা, কত অসহায়া, কতবড় হতভাগিনী, অতিশয় দুঃখিনী। মুলতবি; মুলতুবী, মুলতুবি, মুলতবী, মুরব্বি, মুরব্বী, মুরুব্বি, মুরুব্বী, মিঠাই, মেঠাই, ব্যবহার, ব্যাভার, এ প্রকার

পরিবর্ত্তন বহু চোখে পড়িবে। এগুলিকে মা-বাপ-হারা ছেলে মেয়ের মত যে যেদিকে পারিতেছে লইয়া যাইতেছে। ‘আম্র’—‘আঁব’ হইয়াছে, ‘তামা’—‘তাঁবা’ হইয়া গিয়াছে, ‘নেমে পড়’—‘নেবে পড়’ হইয়া গিয়াছে। এইসব পরিবর্ত্তনের হিড়িক দেখিয়া জনৈক লেখক একটু ভয় পাইয়াছিলেন,—সব ‘ম’—‘ব’ হইয়া গেলে বাঙ্গালীদের এত আদরের ‘মামা’ যে একটি ভয়াবহ জীবের রূপ পরিগ্রহ করিবে! তখন বাঙ্গালীরা ‘মামা’ পাইবে কোথায়? অনুরূপ বানান-বিভ্রাট-বিশিষ্ট শব্দগুলি অতখানি ত্রাসের সঞ্চার না করিলেও বাঙ্‌লা অভিধানের কলেবর যে অল্পকাল মধ্যে আরও বড় করিয়া লইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই স্থিতিশীল ও স্থবির বাঙ্গালী-জাতির ‘এদিকে নাই, ওদিকে আছে,’ অর্থাৎ উন্নতির বেলায় Present Perfect (স্থিতিশীল) আর অবনতির বেলায় ভূতের মত পিছন-দিকে পা গজায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছি,—“ভূতের পা পিছন দিকে, বাঙ্গালী সমাজের সব কাজের পা-ও পিছন দিকে” ইত্যাদি, সবটা মনে নাই। একটি—একটী, ভাল—ভালো, কাল—কালো, দেখান, শিখান, হারান—দেখানো, শেখানো, হারানো তে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জিনিশ, জিনীশ, জিনিষ, জিনীষ, জিনিস, যিনিস, জোগাড়, যোগাড় ইত্যাকার হরেক রকম বানান দেখিয়াছি। এই প্রকার বানান-বিভ্রাট একটা দুইটা শব্দের ভাগ্যে ঘটে নাই। বাঙ্‌লা-ভাষার হাজার-লাখ শব্দ ‘হাজারো-লাখো’ প্রকারে লিখিত হইতেছে। ‘গরু’ কবীন্দ্রের দৌলতে ‘গোরু’ হইয়া গিয়াছে।

আদর্শ বাঙ্গালা অভিধানের ৬৩৭ পৃষ্ঠায় সুবল বাবু বাৎলাইতেছেন, —"গোরু—গরু (তাঁহা দেখ)"। (এটা যেন ত্রিপুরী যাইতে ত্রিপুরা যাইয়া বসিয়াছি; আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে হইবে)। 'গো' মানেইতো গরু, যেমন—গোমাতা, গোপাল ইত্যাদি। তাহা হইলে 'গো' এর পরে আবার 'রু' বসিয়া 'গোরু' কেন হইল তাহা আমার মত গোবেচারি প্রথমে বুঝিতে পারিল না। অবশেষে, একদিন প্রফেসর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট (লণ্ডন) মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা"র ১০ম পৃষ্ঠায় দেখিলাম যে, সংস্কৃত 'গো রূপ' হইতে প্রাকৃত 'গোরূব' তাহার অপভ্রংশ 'গোরূঅ'—উহা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাচীন বাঙ্‌লায় 'গোরূ,' পরে আধুনিক বাঙ্‌লায় 'গোরু' এবং সর্ব্বশেষে 'গরু' তে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তখন বুঝিলাম,—ভারতীয় কৃষ্টির পুনরুদ্ধারকল্পে কবীন্দ্র আবার 'গরু'কে খেদাইয়া সংস্কৃত 'গো-রূপ' এ লইয়া যাই-বার আশায় কেবল একধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। কেন, ভাল, ছোট, মত প্রভৃতির উচ্চারণ করিতে শেষের 'অ' গুলি 'ও' কারের ন্যায় উচ্চারিত হইয়াছে, 'গরুর' প্রথম অক্ষরটার 'অ'—'ও' কারের ন্যায় উচ্চারিত হইয়াছে। সেইজন্য যদি ঐ-সব 'অ' গুলি 'ও' তে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা হইলে—মন, বন, প্রথম, পবন, নরম, গরম, হজম, কাগজ, কোমল, পাগল এই—শব্দগুলি যথাক্রমে মোন, বোন, প্রোথোম, পবোন, নরোম, গরোম, হজোম, কাগোজ, কোমোল, পাগোল ইত্যাদিতে কেন পরিণত

হইবে না তাহা আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। 'সহ্য লিখিতে 'হ' এ 'য' ফলা দিতে হয়, আর 'স্থির' লিখিতে 'থ' এর অঙ্গহানি করিতে হয়। এইরূপ উদ্ভট প্রকৃতির পরিবর্ত্তনগুলি কর্ত্তাদের নজর এড়াইয়া গেল, আর ধরা পড়িল যত-সব ঐ গোবেচারি শব্দগুলি। আমার দাদা আমাকে মাঝে মাঝে ধমক দিতেন,—"লেখ্‌বার কেউনা, মোছ্‌বার যম।" আমি বলি,—এই গোবেচারি শব্দগুলি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইবারই বা কী কারণ আছে তাহাও বুঝিতেছি না। রাজভাষার তো নজির আছে—But, Put, Bury, Busy, Fury ইত্যাদিতে একটী 'u' পাঁচ রকম কাজ চালাইতেছে।

প্রথম যেদিন ৺শরৎ বাবুর 'দ্বিতীয় পর্ব্ব শ্রীকান্তে' 'উদগীরণ' শব্দের সহিত মোলাকাত হইল সেইদিন সুবল বাবুর 'আদর্শ বাঙ্গালা অভিধান' খুলিয়া কত ঘাঁটাঘাঁটি করিলাম, কিন্তু, 'উদগীরণ' পাইলাম না। হঠাৎ 'উদগীর্ণ' চোখে পড়িল। দেখি,—উহার অর্থ লেখা আছে—'যাহা উদ্গিরণ করা হইয়াছে।' তখন বুঝিলাম,—'উদগীর্ণ' লিখিতে 'গ'এ দীর্ঘ 'ঈ' কার থাকিলেও 'উদ্গিরণ' লিখিতে 'গ' এ 'ই' কার দিতে হইবে। 'বিকিরণ' শব্দ অনেক স্থানে 'বিকীর্ণ'এর ছুতা (সুতা বা সূতা নহে) ধরিয়া বেমালুম 'বিকীরণ' বনিয়া গিয়াছে। কর্ত্তারা তাঁহাদের বানান সংযত করিয়া লিখিবেন, না, অভিধানের শব্দ-সংখ্যা এই ভাবে বাড়িয়াই চলিবে তাহাই এখন বিবেচ্য। 'শিল্পী' ও 'শালা' একত্র করিয়া কর্ত্তারা 'শিল্পী-শালা' লিখিয়া দিলেন। কিন্তু

অভিধানে পাইলাম 'শিল্পি-শালা'। ব্যাকরণে পড়িয়াছি—'কালী' শব্দের সহিত 'দাস' শব্দ যুক্ত হইলে, 'বাসী' শব্দের পর 'গণ' শব্দ মিলিত হইলে 'ঈ' কার স্থানে 'ই' কার হইয়া যায়। এখন ব্যাকরণের সুর বদ্‌লাইয়া বলিতে হইবে—"যাহার যে-শব্দের যে-বানান ইচ্ছা লিখিয়া যাও – উহাই ব্যাকরণ-সিদ্ধ।" আমিও যদি এখন নূতন নূতন বানান বাঙ্‌লা-ভাষায় চালাইয়া দেই তাহা হইলে, কর্ত্তারা আমাকে মাফ্ (মাপ্?) করিবেন, না, তারিফ (তারীফ?) করিবেন তাহাও জানি না।

তারপর, আবার শব্দ-প্রয়োগ ব্যাপারেও অনুরূপ বিপদে পড়িলাম। উদাহরণ-স্বরূপ একটিমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইব। বাগবাজারের রসগোল্লা আর বড় বাজারের সন্দেশ 'খুব মিষ্ট'। কিন্তু বাঙ্গালীদের প্রেমের বাজারের 'মুচ্‌কি হাসি' ও 'ছোট্টকথা'গুলি 'ভারি মিষ্টি'। আমার ঠাকুর-মা মিষ্ট বলিতে পারিতেন না, তিনি বলিতেন—'মিষ্টু'; এখন এই 'মিষ্ট,' 'মিষ্টি' ও 'মিষ্টু' ইহার কোন্‌টা গ্রহণ করিব?

আর মিষ্টিটা 'ভারি' কি না, অর্থাৎ, মুচ্‌কি হাসিটী বা উহার মিষ্টতা ওজন করা চলে কি না, তাহা যাহারা প্রেমের বাজারে ব্যবসা করিয়াছে তাহারাই জানে ভাল। বাজারের ঐ ভার-বিশিষ্ট মিষ্টি ডায়বেটীস রোগের সৃষ্টি করে। আজকাল আমাদের দেশে 'মিষ্টি কথা'য়ও ডায়বেটীস রোগের সৃষ্টি হইতেছে। সেইজন্য, 'মুচকি হাসি'র ও 'ছোট্ট কথা'র মিষ্টতা 'ভারী' হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়া কেহ কাহারও কথা

শুনেন না। প্রত্যেকেই 'হাম বড়া' ভাব দেখাইতেছেন। বৃদ্ধ ও পাকা-পোখ্‌ত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মওলানা আক্‌রাম খাঁ সাহেবও এস্‌লাম, মুসলমান, সোলতান, সালাম, হাদিস, সুন্নী, সাহাবা, এনসান প্রভৃতি শব্দগুলির 'স' স্থানে অবাধে 'ছ' চালাইয়া যাইতেছেন। ঐ 'ছ'তে আরবী 'সিন' অক্ষরের উচ্চারণকে বিকৃত করিয়াছে, না, উপকৃত করিয়াছে তাহা জানি না। তবে, এইটুকু জানি যে হিন্দুরা যখন মুসলমানকে ঘৃণাভরে ডাকে তখনই তাহারা 'বেটা মুছলমান' বলিয়া সম্বোধন করে। 'মুছলমান' শুনিলে মুসলমানদের গায়ে একটু জ্বালা ধরে। আবার, এই ব্যাঘ্র-মূর্ত্তি 'আক্‌রাম খাঁ' সাহেবকে আনন্দবাজার পত্রিকায় "মওলানা আক্রাম খাঁ' লিখিয়া দিল। বোধ করি, উদ্দেশ্যটা এই যে, তাড়াতাড়িতে আমরা 'মওলানা আক্রমণ খাঁ' বলিয়া পড়িয়া যাইব।

বানান-বাহাদুরির আজবকীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে আবুল মনসুর সাহেবের 'আয়না'য়। উদাহরণঃ—যিন যিদ, চীয, যাযী, কাগয, যাকাৎ, যামানা, হুযুর, যাযির, তাবিয, মেযাজ, জামেয, জানাযা, হযরত, যহরত, কমযোর, বেতমিয, ফন্দীবায, রোযগার, যবরদস্ত, পরহেযগার, আওয়ায, হযমশক্তি, খোদার ফযল ইত্যাদি। ইয্‌যৎ ও ইয্‌যত, নমায ও নামায— এই উভয়কে দুইপ্রকারের চেহারায়ই দেখিয়াছি। এগুলি বোধ করি, পরশুরামের গড্ডলিকায় বর্ণিত তারিণী কবিরাজের "হয়, Zানতি পার না'—এই 'Zানতি' এর প্রতি তীব্র কটাক্ষ।

আরিণী কবিরাজ-'Zান্‌তি পার না' বলিয়া পরশুরামকে এমন বিপদে ফেলিয়াছিল যে, ইংরাজী বর্ণমালা হইতে তাঁহাকে অক্ষর ধার করিতে হইল। আবুল মনসুর সাহেব সেইজন্য পরশুরামকে একহাত দেখাইয়া দিলেন। অন্য সকল লেখকের ভুল ধরিয়া ইংরাজী 'ম্যাগাজিন' শব্দটাকে তিনি 'ম্যাগাযিন' করিয়া চালাইয়া দিলেন। বর্গের 'জ' ও অন্তঃস্থ 'য' এর উচ্চারণে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার কী চমৎকার পরিকল্পনা! সংস্কৃত পণ্ডিতও হার মানিয়া যাইবে! অন্তঃস্থ 'য' টা যেন দন্ত্য 'য'। আবুল মন্‌সুর সাহেবের 'গো-দেওতা-কা দেশ' স্বপ্নরাজ্যে। এ 'আনন্দবাজারের দেশে' এখনও হিন্দুরা 'মুচম্মানের' বই পাঠ করিবার জন্য বাঁচিয়া আছে। অতএব, দ্রুত-পাঠ-কালে 'আমেয' স্বভাবতঃই 'আমেষ' এবং 'মেযাজ'—'মেয়াজ' হইয়া যাইতেছে। যে-প্রকার অক্ষরে তাহার বই ছাপা হইয়াছে তাহাতে 'য' ও 'য' বাছিয়া বাহির করিবার জন্য ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের প্রয়োজন। কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেব 'আয়নার ফ্রেম' আঁটিয়াছেন। তাঁহার সহিত একযোগে আমরাও বলিব,—আবুল মনসুর সাহেব সত্যই ভাষার কান মলিয়াছেন। বানানের প্রতি এই ব্যঙ্গ সত্যই সাপ হইয়া কামড়ায়। আমাকে তো ঝাঁঝালো তেজে কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছে। কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেব যদি দয়া করিয়া কাযি নযরুল ইস্‌লাম—এইভাবে নিজের নাম সাক্ষর করিতেন তবে 'আয়নার ফ্রেম' ভাল করিয়া আঁটিত। জিজ্ঞাসা করি—যে-সব

মুসলমান লেখক এতকাল ঐ 'য' গুলির স্থানে 'জ' ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা কি মুসলমান সমাজ হইতে খারেজ হইয়াছেন ?

'আয়না'র সবগুলি 'বিবি' 'বেবী'র অন্ধ-অনুকরণে 'বিবী হইয়া গিয়াছে, 'ভরসা' ঘন-বরষার দৌলতে 'ভরষা' হইয়াছে। ময়মনসিংহি-বানানও যথেষ্ট ঢুকিয়াছে,—বুতাম, কিতাব, মুসিবত, কোড়া খদ্দর, চুনু-পুটি, বলিবার 'জু' নাই ইত্যাদি। 'উস্‌পিস্‌' ও 'তুযখী'র সারমর্ম্ম বুঝিবার ক্ষমতা লেখকের ছাড়া আর কাহারও নাই। লেখকতো তাহার 'লীডরে কওম'কে রাঁচীতে পাঠাইয়া দিলেন—আমাদের মনে হয় নওগাঁ কাছেই ছিল।

প্রবোধ কুমার সান্যাল মহাশয়ের একখানা বইয়ের নাম রহিয়াছে 'রঙিল সুতো'। 'সূত্র' এর অপভ্রংশ যে 'সূতা' তাহার সহিত 'সুতা'র (কন্যা) যথেষ্ট ব্যবধান। তবে কেমন 'রঙিল সুতো' বুঝিলাম না, কিন্তু উহা যে একখানা বইয়ের নাম—ভুল হইবার যো নাই।

একদিন শাহাদাৎ হোসেন সাহেবের ছয় আনা দামের 'জেবুন্নেসা' খুলিয়াছিলাম। ৩য় পৃষ্ঠায়—"জেবুন্নেসা সমস্ত কোরাণ-শরীফখানি মুখস্ত (মুখস্থ) কোরে (ক'রে) হাফেজ হোয়ে (হয়ে) উঠ্‌লেন।" ১২শ পৃষ্ঠায়—"বাঁদীর আবেদন-খানি তাঁর হাতে এসে পোড়্‌ল (পড়্‌ল)। সমস্তটা পোড়ে (প'ড়ে) বাঁদীর অবস্থা বুঝে তিনি তাকে ক্ষমা কোরলেন (করলেন)।" মনে হয়,—যেন পশ্চিম-ভারতের মুসলমানেরা নূতন নূতন বাঙ্‌লা বলিতে

শিখিতেছেন। কচি ছেলে মেয়েদের মগজে এইসব বিকৃত বানান ঢুকাইয়া কী উপকার হইবে জানি না।

সৌরেন বাবু 'নিলামী ইস্তাহারে' ৯নং লাটে লিখিয়াছেন—'মান্ধাতার আমোল' (আমল), ১২নং লাটে 'মোষের সিং' (মহিষের শিং), 'খপর' (খবর), ১৫নং লাটে 'ভালোবাসা' (ভাল বাসা নহে, ভালবাসা)। পাঁচুগোপাল মহাশয় তাঁহার 'বিদেশী পুরাণ' বইতে যে-সব অনাচার করিয়াছেন তাহারও একটু নমুনা দিতেছি।—৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—"দীর্ঘ দিন ঝড় বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে তার আর কোন শ্রী-সৌন্দর্য্যই নেই। দরজা জানালার কোনটী গেছে ভেঙ্গে, কোনটী কোনটী আবার নেই একেবারেই। বালিশ বিছানাগুলি পুরাণো হয়ে গেচে, পোকায় কেটেচে। ঘরের এককোণে একটী চরকা আছে; সেইটীতে সে বসে বসে সূতো কাটে।" এই তিন চারিটী লাইনের মধ্যে 'গেছে' ও 'গেচে' এই দুইটীই দেখিলাম। কোমলমতি শিশুরা 'ছ' উচ্চারণ করিতে কষ্ট পাইবে বলিয়া লেখক বোধ করি, যত-সব 'চ'য়ের যোগাড় করিয়াছেন। কিন্তু, 'শ্রী-সৌন্দর্য্য,' 'আছে' ও 'বিছানার' ভিতরে যে দীর্ঘপ্রাণ কঠিন অক্ষর রহিয়া গেল—উহাদের তাড়াইবার কোন উপায়তো করা হইল না। 'নেই' ও 'সূতো'—এই দুইটীকে 'নাই' ও 'সূতা' লিখিলে কী দোষ হইত জানি না।

আবার ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"বেগম সাহেবা আজ সকালেই তাঁর হারাণো অলঙ্কারগুলি ফিরে পেয়েছেন—

সুতরাং এসব তার নয়। কিন্তু জিনিষগুলি তার ভারি পছন্দ হয়েচে, সুলতানকে তিনি সেগুলি নিতে বলেচেন।" এই 'ভারি পছন্দ' আর 'পেয়েছেন' এর এত কাছে 'হয়েচে' ও 'বলেচেন' খুবই মিষ্টিমধুর লাগিতেছে। পেয়েচে, ভাবচে, কাঁদচে, ফেলেচে,—এই সব উদ্ভট 'চ'-বিশিষ্ট শব্দগুলির কাছেই—বুঝেছ, পছন্দ প্রভৃতি শব্দ তাঁহার বইয়ের ভাষায় প্রযুক্ত হইয়া অপরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে। কোমলমতি শিশুদিগের মগজে এইপ্রকার শিক্ষা ঢুকাইবার যে কত রকম ব্যবস্থা এদেশে আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কয়জন সাহিত্যিককে ধরিয়াছি বলিয়া যে অন্য সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবেন তাহা নহে। উঁহাদের ভাগ্য মন্দ; তাই তোড়ের মুখে পড়িয়াছেন। সেকালে ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'ঐহিক অমরতা' প্রবন্ধে 'ভাসমান' শব্দটী ব্যবহার করিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন—বৈয়াকরণদিগের সেই কশাঘাত কেবলমাত্র যে তাঁহাকে সায়েস্তা করিয়াছিল তাহা নহে; অন্যান্য লেখক-প্রবরেরাও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখন লাগাম তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, ট্যাক্স ও দিতে হয় না; সেইজন্য, বানান এবং শব্দ-প্রয়োগ ব্যাপারে যে কত-সব অনাচার হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু, এই সব বিভ্রাটের জন্য দায়ী কে? শিশুবোধ ব্যাকরণে পড়িয়াছি—'ভাষা ব্যাকরণের ধার ধারে না।' আগে মানুষ ভাষার সৃষ্টি করে, পরে ভাষা যাহাতে ভাসিয়া না যায়

তাহার জন্য ব্যাকরণ-রূপ খুঁটির সৃষ্টি।' কিন্তু, অভিধান ভাষার অভিধাবন করিবে, না, ভাষা অভিধানের কড়া-শাসন মানিয়া চলিবে তাহা আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে হোমরা-চোমরা লেখকদের লেখায় অসংখ্য বানান-বিভ্রাট (বানান ভুল নহে) দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়াছি। কেননা, এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, অত-সব সুসাহিত্যিক, অসাহিত্যিক ও কুসাহিত্যিক যখন অবাধে ঐগুলি চালাইয়া দিয়া বাঙ্‌লা-ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন বলিয়া দম্ভ করিতে পারেন এবং যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা ও শিক্ষা-তরণীর কর্ণধারেরা নির্ব্বিচারে ঐগুলি পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত করিয়া লইয়া রবীন্দ্র বাবু ও ৺শরৎ বাবুর স্পেশাল বানান-রূপে, রামা শ্যামার নূতন নূতন দান হিসাবে পরম তৃপ্তির সহিত গলাধঃকরণ করিয়া অবাধে হজম করিতে পারিতেছেন এবং সর্ব্বশেষে যখন অভিধান লেখকেরা কে কোথায় নূতন প্রকারে বানান লিখিলেন, কে কোথায় নূতন-অর্থে কোন্ শব্দ ব্যবহার করিলেন, তাহার সন্ধান করিয়া নিজেদের অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন তখন আমার বানান-বিভ্রাটে পড়িয়া হয়রান হইবার কী ভয় আছে তাহাতো জানি না। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তো অনেক আগেই বলিয়া গিয়াছেন—

"নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো,
নাকগুলা সব কাটো, কানগুলা সব ছাঁটো,
পা'গুলা সব উঁচু ক'রে মাথায় দিয়া হাঁটো।

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধরে মারো,
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো,—ভাল আরো।
হয়েছি অধীর মোরা যত বঙ্গবীর,
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির।"

কিন্তু, বাঙ্‌লা-ভাষার বানান-ক্ষেত্রে নামিয়া এই 'নতুন কিছুর' ধাক্কায় পড়িয়া বিদ্যার্থীরা হাঁপাইয়া উঠিতেছে। ভুঁড়িওয়ালা অভিধান লেখকেরা ভুঁড়ির টান সামলাইয়াও দ্রুতপদে সাহিত্য-সেবীদের সহিত চলিতে সক্ষম হইতেছেন। কেননা, তাঁহারা পাকিয়া ঝুনা হইয়াছেন। কিন্তু, ক্ষীণ-দেহ যুবকেরা তাহা পারিবে কেন? রবীন্দ্র-প্রতিভায় প্রদীপ্ত শিক্ষকের নিকট 'ভালো কালো গোরু' লিখিতে ভুল করিয়া এক 'বাছাধন রক্ষা পাইল না'; পরে আর একদিন পরীক্ষার সময়ে শিক্ষকের শিক্ষামত 'ভালো কালো গোরু' লিখিয়া সেই 'সোনার যাদু' পরীক্ষায় ফেল মারিয়া বসিল। কেননা, পরীক্ষক ঐ প্রকার উদ্ভট বানান সহ্য করিতে পারিলেন না।

ছাত্র 'উদ্গীরণ' লিখিল। বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা গেল। ছাত্র ৺শরৎ বাবুর শ্রীকান্ত খুলিয়া পরীক্ষকের সামনে ধরিয়া বলিল—'এটা কী?' পরীক্ষক বলিলেন,—'ছাপাখানার প্রুফ্ দেখার ভুল।' ছাপাখানার লোকেরা বলিলেন,—"আজকাল বাঙ্‌লা-ভাষার আর কিছু হউক, আর না হউক, প্রেসের হুড়াহুড়ি ও বানানের রাহাজানি হইতেছে। আমরা ঐ দুইটির কোনটির উপরেই হাত দিতে পারি না।

লেখকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিলে কি আর রক্ষা আছে? আমরা শব্দের মধ্যের 'আ'কার (া), শেষের 'আ'কার (া), শব্দের প্রথম 'এ'কার (ে), শব্দের মধ্যের 'এ'কার (ে), শব্দের মধ্যের 'ণ'কার (ণ), শব্দের শেষের 'ণ'কার (ণ), স্ম ও ম্ম, এইসব লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। চন্দ্রবিন্দুগুলিতো কিছুতেই 'পুঁতিয়ার' উপরে পুঁতিয়া রাখিতে বা 'দাঁড়াইবার' উপরে দাঁড় করাইয়া আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমাদের সময় কোথায় সে বানান-বিভ্রাট দেখিব? এমনও দেখা গিয়াছে চন্দ্রবিন্দুগুলি ছাপার কাজ চলিতে চলিতে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া ভাগিয়া পড়িয়াছে।"* আমি একজন বিদ্যার্থী হিসাবে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি—'এরূপ বিপদ হইতে পরীক্ষার্থীকে কে রক্ষা করিবে? তাহার কী উপায় হইবে? দোষ করিবে দশজনে আর ভুগিয়া মরিবে বুঝি পরীক্ষার্থী একেলা?' ইংরাজীতে আমেরিকার খিচুড়ী-বানান দুই-একটা ঢুকিয়াছে বটে, যেমন—Honor, thru, Skool, Program; কিন্তু উহাদের সংখ্যা নগণ্য। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বানান দুই-একটা 'এদিক্

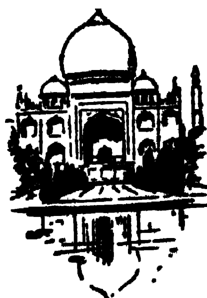
---

*এই প্রকার চন্দ্রবিন্দু-বিভ্রাট ইতিমধ্যে এই পুস্তকেও ঘটিয়াছে। ৮ম পৃষ্ঠার ৬ষ্ট লাইনের 'পুঁতিয়া'র উপর হইতে চন্দ্রবিন্দু পলাইয়া (পালাইয়া নহে?) গিয়াছিল। পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম ১২শ পৃষ্ঠায় ১২শ লাইনে 'হাড়গিলার' উপরে পেঙ্গীর মত ভর করিয়া চিঁহিঁ হিঁ করিয়া হাসিতেছে। পাঠকদের সমবেত চেষ্টায় উহাকে ধরিয়া আনিয়া 'পুঁতিয়া'র উপরে পুঁতিয়া রাখিতে হইবে। ১৮শ পৃষ্ঠার ৫ম লাইনের [illegible]'র উপর হইতে ভাঙিয়া আসিয়া পড়িয়াছে।—গ্রন্থকার।

ওদিক' হইলে তাহাকে ছন্দের মিলের খাতিরে বরদাশ্‌ত করিতে পারি। কথা-সাহিত্যের কথোপকথনেও না-হয় বানান-'বির্ভাট' দুই-চারিটি সহ্য করিতে পারি। কিন্তু, রুই-কাত্‌লা ও চুনো-পুঁটি এই সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যিকদের বাঙ্‌লা-ভাষার বানানের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া ইহাই মনে হয় এবং একজন ভুক্তভোগী হিসাবে তাহা বলিয়াও ফেলিতে পারি যে, এই সমস্ত সাহিত্যিক আমাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ঘায়েল করিয়া ফেলিয়াছেন (Have taken too much advantage of our weakness)। অথচ কর্ণধারেরা এ বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় দৃক্‌পাত করিতে পারিতেছেন না। কেননা, তাঁহাদের 'চোখা চোখ'গুলি সাহিত্যিকেরা 'কোমল চোকে' পরিবর্ত্তিত করিয়া ছাড়িয়াছেন। এ বিষয়ে এতদিন ধরিয়া যে কুকীর্ত্তির অভিনয় হইয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাঙ্গালীদের বহুকাল ভুগিতে হইবে।

আমি যে এতগুলি লোকের উদ্দেশ্যে দূরে থাকিয়া ঢুঁ মারিলাম তাহার পরিণতি কোথায় জানি না। বোধ করি, ভালই হইবে। শ্রীকান্ত তাহার মাতাকে হাতের কাছে পাইলে মাথা চিবাইয়া খাইত। এমন কি, লাফাইয়া উঠিয়া স্বর্গীয়া মাতাকে ঢুঁ মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইতেও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু নাগাল পাইল না বলিয়া তাহা পারিল না। শ্রীকান্তের মাতা কীর্ত্তিমান পুত্রের এই প্রকার উত্তেজনা ও অস্বস্তি দেখিয়া কুপিত না হইয়া স্বর্গে

বসিয়া হাঁসিতেছিলেন।* আবার, লম্বকর্ণ রায় বংশলোচন বাহাদুরকে ঘাড় বাঁকাইয়া ঢুঁ মারিয়াছিল। পরে, রায় বাহাদুরের গিন্নী—মানিনী লম্বকর্ণের কাজে সন্তুষ্ট হইয়া উহার শিং দুইটি কেমিক্যাল সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।† এই দুইটি বড় বড় নজির থাকিতে আমার ঢুঁ মারার পরিবর্ত্তে যে আদর-সম্ভাষণ বকশিস্ মিলিবে তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাহা হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি শব্দের বানানের কাজে হাত দিয়া সম্প্রতি সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। ভাবিতেছি,—ইহার পরিণতি কোথায়?



* শ্রীকান্ত—দ্বিতীয় পর্ব্ব। শ্রীকান্তের মাতার চিঠি—শ্রীমতী গঙ্গাজলিয়া—শ্রীকান্তের নিকট পৌঁছিলে কীর্ত্তিমান পুত্রের উত্তেজনা।

—গ্রন্থকার।

† পরশুরাম-বিরচিত গড্ডলিকার লম্বকর্ণ বা পুরুষ্টু পাঁঠা।—গ্রন্থকার।

গোলকচন্দ্রের সাহিত্য-সেবায় গোল।

(দ্বিতীয় উদ্যম)

বানান-সমস্যায় পড়িয়া আঘাত পাইলাম, আহত হইলাম ; কিন্তু হা'ল ছাড়িলাম না। শিশুকালের শিক্ষা ভুলি নাই,—

"পারিব না ওকথাটী বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা দেখ আরবার" ইত্যাদি।

যৌবনে শিখিয়াছিলাম,—

"ওহে পান্থ, ক্লান্ত কেন হেরে দীর্ঘপথ,
উদ্যম বিহনে কোথা পূরে মনোরথ।"

মাকড়সার নিকট হইতে রবার্ট ব্রুস্ যে শিক্ষা পাইয়াছিল তাহাও আমাদের হৃদয়-পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া আছে। সেইজন্য, দ্বিতীয় উদ্যমে শক্ত করিয়া হা'ল ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলাম।

শুনিয়াছিলাম,—বানান-বিভ্রাটের একটা হেস্ত-নেস্ত করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তোড়-জোড় আরম্ভ করিয়াছেন। সুদিনের প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিলাম। একদিন সুপ্রভাতে সংবাদ পৌঁছিল,—"বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।" শুনিয়া বড়ই খুশি হইলাম। ভাবিলাম—মরা-গাঙে সত্য সত্যই শেষকালে বান ডাকিল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কলিকাতার পুস্তকালয়ে চিঠি লিখিলাম। যথা-সময়ে জবাব আসিল—"আউট অব্ প্রিণ্ট।" বুঝিলাম,—উত্তপ্ত মরুভূমিতে জলের ছিটে-ফোঁটা

মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া যায়, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে গরম গরম লুচি-ভাজা কড়াইয়ের ভিতর হইতেই মানুষের পেটে ঢোকে। অতএব, 'বাংলা বানানের নিয়ম' যে এদেশের লোকেরা লুফিয়া লইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কী? এবারেও ব্যথাহত হইলাম, কিন্তু উদ্যম কমিল না। দ্বিগুণ উৎসাহে খোঁজ করিতে লাগিলাম—দ্বিতীয়-সংস্করণ কবে বাহির হইবে। কলিকাতা সহরে বন্ধুদিগকে সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করিলাম। কিছুকাল পরে এক বন্ধুকে স্মরণ করাইয়া দিলে সে জবাবে লিখিল—"তাইতো ভাই, ভুল হইয়া গিয়াছে। মনে ছিল না, এখন খোঁজ লইয়া দেখিলাম- দ্বিতীয়-সংস্করণও নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে। এইবার প্রতিজ্ঞা করিলাম—তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইলেই একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।"

যথা-সময়ে তৃতীয় সংস্করণ "বাংলা বানানের নিয়ম" হস্তগত হইল। ১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত,—দাম দুই আনা। ভূমিকার পাতা কয়টী উল্টাইয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। পুস্তিকাটীর সর্ব্বস্বত্বঃ যখন সংরক্ষিত নহে তখন উহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করায় আমার অধিকার আছে।

১ম পৃষ্ঠা—"সুপ্রচলিত শব্দের বানান-সংস্কার যদি করিতে হয় তবে, বানানের জটিলতা না বাড়াইয়া সরলতা সম্পাদনের চেষ্টাই কর্তব্য।" পড়িয়া মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

২য় পৃষ্ঠা—"পূর্বে 'সন্ক্রান্তি, সন্খ্যা' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু এখন কেবল 'সংক্রান্তি, সংখ্যা' চলিতেছে। এই

রীতিতে 'ভয়ঙ্কর, সঙ্গম' প্রভৃতি স্থানে 'ভয়ংকর, সংগম' লিখিলে বানান সহজ হইবে। কালক্রমে সরলতর বানানই চলিবে।" অতএব, "কিছুকাল দুই প্রকার বানান চলিলে ক্ষতি হইবে না।" যাহা একটু আশার আলো জ্বলিয়াছিল, তাহাও নিবিয়া গেল।

৪র্থ পৃষ্ঠা—"যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।"

"সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত, স্বয়ংভূ' অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ'।"

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা—"বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন প্রভৃতি এবং বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা।" এই কয়টী নিয়ম একত্র করিলে ইহাই মনে হয় যে,—ং, ঙ, ঙ্গ, ঞ্জ, ও ম—এই কয়টী যত প্রকারে এখন ব্যবহৃত হইতেছে তাহার সবগুলিই থাকিয়া যাইবে। 'বাঙ্গালা' লিখিয়া ৺বঙ্কিম বাবু ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়—ইঁহারা মরিয়াও বাঁচিয়া গিয়াছেন, আর 'বাংলা' লিখিয়া কবীন্দ্র ও তাঁহার অনুগামীরা কিছুই ভুল করেন নাই। কোথায় আশার 'সঞ্চার' হইবে, তাহা না, তবে 'ভাংগিয়া'

পড়িলাম্। ইহার পর লেখকদের সংযত হইয়া চলিবার কোন কারণ নাই।

২য় পৃষ্ঠা—"পূর্বে কেবল 'খুসী, সয়তান, সহর, পালিস, ক্লাস' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু আজকাল অনেকে মূল শব্দ-সম্বন্ধে অবহিত হইয়া 'খুশী, শয়তান, শহর, পালিশ, ক্লাশ' লিখিতেছেন। এই রীতিতে 'নক্শা, শরবৎ, শরম, শেমিজ, সাশি' প্রভৃতি চলিতে পারিবে।" মূল শব্দের সহিত সম্বন্ধ রাখা খুবই ভাল কথা। হিট্লারি মেজাজে বলিলে নিশ্চয়ই লেখকেরা মানিত। অভিধান হইতেও অনুরূপ ভুল-বানান উঠিয়া যাইত। অথবা 'খুসী' শব্দের পার্শ্বে ব্রাকেটের মধ্যে অভিধানে লেখা থাকিত—'ইহা ভুল—'খুশী' দেখ।' কিন্তু,—

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা "বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে S স্থানে স, Sh স্থানে শ হইবে—'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেন্সিল, মস্লা, মাসুল, সবুজ, সিমেণ্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পেনশন, শয়তান, শৌখিন, শার্ট' ইত্যাদি। বিদেশী শব্দের S-ধ্বনির জন্য বাংলার ছ-অক্ষর বর্জনীয়।" বিকল্পেরও ব্যবস্থা আছে—"কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—ইস্তাহার (ইশ্তিহার), গোমস্তা (গোমশ্তাহ্)", ইত্যাদি এবং "প্রচলিত বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানান-ই বজায় থাকিবে।" তাহা হইলে কোন্ বানানটা ভুল হইবে তাহা বুঝিলাম না। অতএব, আরবী,

ফারসী ও উর্দ্দু ভাষার পণ্ডিতেরা এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার মওলবীরা সদম্ভে চলিতে পারেন।

৭ম পৃষ্ঠা—"সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্তরূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।" "-লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।"

হ-ধাতু—হ'ত, হ'ল, হ'লাম, হব (হবো)।

শু-ধাতু—শু'ল, শুত, শোব (শোবো)।

খা-ধাতু—খেত, খেয়েছিল, খাব (খাবো)।

কর্-ধাতু—কর, ক'রত, করেছিল, করবে, করব (করবো)।

কাট্-ধাতু—কাট, কাটত, কাটব (কাটবো)।

দি-ধাতু—দিল, দিত, দেব (দেবো)।

লিখ্-ধাতু—লেখ, লিখত, লিখছিল, লিখব (লিখবো)।

উঠ্-ধাতু—উঠ, উঠেছিল, উঠল, উঠব (উঠ্‌বো)।

করা-ধাতু—করান, করাত, করাব (করাবো)।

অতএব, ঐ শব্দগুলির প্রথম অক্ষরে ও শেষের অক্ষরে যাঁহারা অযথা ও'কারের পক্ষপাতি তাঁহারা ঘায়েল হইলেন। শাহাদাৎ হোসেন সাহেব ও পাঁচুগোপাল বাবু আটকা পড়িলেন।

মা ভৈষীঃ। উত্তম পুরুষে ব্রাকেটে বিকল্প রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, অতবড় পাকা-সুরসিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তো তাঁহাদের পক্ষে আছেন—'নারকোল, আলুনোন চাউল, পুরোনো' —এগুলি তাঁহার 'শেষ খেয়া'ও আছে। রায় খগেন্দ্রনাথ

মিত্র বাহাদুরওতো তাঁহার 'কনে'বউ'তে ও ছেলেদের অন্যান্য ছোট বইতে*—............

৫ম পৃষ্ঠা—ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদির ব্যবহার ব্যাপারেও—যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে—এই হুকুম। স্ত্রী-লিঙ্গ-বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে এই ধারণা লইয়া, বোধ হয়, আবুল মনসুর সাহেব 'বিবী' লিখিয়াছিলেন। কিন্তু, "ঝি, দিদি, মাসি, পিসি, বিবি লেখা চলিবে"—ইহাই হুকুম। অতএব, আবুল মনসুর সাহেবের অজুহাত নাই।

১০ম পৃষ্ঠা—(একবার সকলে হরি হরি, আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলেন) "Z স্থানে জ় বা জ্ব বিধেয়।" বর্ণমালার অক্ষর আর একটাতো বাড়িয়াই গেল। ইহাই কি সরলতা সম্পাদনের চেষ্টা ? তবে, পরশুরাম Z আমদানি করিয়া কী ভুল করিয়াছেন জানি না।

ইংরাজীর 'S' তো Pleasure, monsoon, Philosophy ইত্যাদি শব্দে তিন-চারি প্রকারে উচ্চারিত হইতেছে। আমাদের প্রচলিত 'জ' কি পঙ্গু ?—দুইটা কাজও পারিবে না ? গরম দেশের ডাল-ভাত-খাওয়া অক্ষর, অত তাকৎ কোথায় ? ওঃ, মনে পড়িয়াছে। আরও একটি অক্ষর বাড়িয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণে যখন একটি বাড়িল, তখন স্বরবর্ণে একটি না বাড়াইলে পক্ষ-

*ওরে গোলকচন্দ্র—থাম, থাম—রায় বাহাদুর আমার গুরুদেব। Philosophyর প্রফেসর ছিলেন। তিনি বানান-সংস্কার-সমিতির সভ্য।
—গ্রন্থকার।

পাণ্ডিত্যের দুর্নাম হইবে। স্বরবর্ণে চলিত ১৪টী স্থানে পনরটী হইবে। উহার নাম হইবে—বক্র অ্যা।

৯ম পৃষ্ঠার ১৪ দফা—(হিন্দু ভাইয়েরা চমকাইবেন না। মওলানা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্এর চৌদ্দ দফা নহে।) "মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা বা মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা—অ্যাসিড, হ্যাট। এইরূপ '্যা' কে একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন স্থান করা যাইতে পারে। নাগরী লিপিতে যেমন অ অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও (ऑ) হয়, সেইরূপ বাঙ্‌লায় অ্যা হইতে পারে।"

আবার, সেই ৯ম পৃষ্ঠায়ই আমরা আশ্বাস পাই—"নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে।" এতদিন ধরিয়া আমাদের নিজেদের ভাষার—এমন, এত, এক, কেন—ইত্যাদি শব্দে 'এ' বক্র 'আ এর কাজ করিতে পারিয়াছে। আর এখন বৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উহাকে ঐ-প্রকার কাজ হইতে বর-খাস্ত করা উচিত কিনা জানি না। 'এসিড্' লিখিলে কী দোষ হয় তাহা এতদিন জানিতাম না। "অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই' — এই আশ্বাসের পরে—"অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে"—এই কথা-কয়টি শুনিয়া পূর্ব্ব-বাঙ্‌লার আতিথেয়তার কথা মনে পড়ে। অতিথির পেট গলা-পর্য্যন্ত ভরিলেও বাড়ীর কর্ত্তা হাত ধরিয়া বলিবেন—"আর অল্প কয়টা নেন্, এই কয়টা দেব আর বেশী

বৈ না” ইত্যাদি। অতিথি বদ-হজমিতে পেট ফাঁপিয়া মরিলে তাহার ক্ষতি কী?

৯ম পৃষ্ঠা—“কতকগুলি সাধু শব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্য প্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—‘পিছন, পিতল, ভিতর, উপর।” অতএব, যাঁহারা পেছন, পেতল, ভেতর, ওপর লিখিয়াছেন তাঁহারা অপকর্ম্ম করিয়াছেন। “যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—‘কুয়ো, সুতো, মিছে, পুরনো।”

অতএব, ‘রঙিল সুতোর’ স্রষ্টা প্রবোধ বাবু বাঁচিলেন। কিন্তু, লেখ্য-ভাষাটা কি কেবল ‘কল্‌কেতা’র ‘মৌখিকরূপে’ চলিবে, না, ঢাকাইয়ারা ও চাটি-গেঁয়েরাও এ-সুযোগ পাইবেন। শান্তি-পুরের ‘ভদ্দর’ লোকেরাতো ভাষার মধুরতার জন্য বিখ্যাত—তাঁহাদের ‘মৌখিক রূপ’ কোন্ অজুহাতে গ্রহণ করা হইবে না তাহা জানি না।

এই সব বিষয় লইয়া আমি যেমন গোলে পড়িয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারাও তেমনি বিপদে পড়িয়াছেন। এইবার ভূমিকা হইতে নজির দিতেছি:—

৵৹ পৃষ্ঠা—প্রথম সংস্করণের ভূমিকা— “যদি সাধারণে সংকলিত নিয়মাবলী গ্রহণ করেন তবেই অনেক বাংলা শব্দের বিভিন্ন রূপ অপসৃত হইবে এবং তাহার ফলে বাংলা ভাষা-শিক্ষার পথ সুগম হইবে।”

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা—"এই পুস্তিকার প্রথম প্রচারের পর বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট হইতে যে অভিমত পাওয়া গিয়াছে তাহা বিচার করিয়া বানান-সংস্কার-সমিতি কয়েকটি নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন।"

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা—"দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের পর আরও কয়েকটি অভিমত পাওয়া গিয়াছে, ... রবীন্দ্রনাথও কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানাইয়াছেন ....নিয়মাবলীর সংশোধন করা হইল। ... .. . প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর পুরাতন বানান লিখিলেও চলিবে।"

বড় লোকের ঘরের কথা পূর্ণভাবে জানা যায় না। কিন্তু ভাবে বুঝা যায় যে—দুঃখ, ক্ষোভ, অভিমান ও নিরাশার অভিব্যক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

'অতিরিক্ত ও'কার যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়'—কিন্তু কালো, ভালো, মতো—বিকল্পে চলিতে পারিবে। "রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব হইবে না, যথা—অর্চনা, মূর্ছা, সর্ব, কর্তা, কার্য, ভট্টাচার্য।" তবুও, "সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ থাকিবে।' ইহাতে বিভ্রাট বাড়িল, না কমিল তাহা চিন্তার বিষয়।

সংসারের মায়া আর সন্দেহের ছায়া—এ দুইটী থাকিতে কিছুরই ত্যাগ সম্ভব নহে। হিটলারি-মেজাজ না দেখাইলে সংস্কার হয় না। মনে হয়,—দুই নৌকায় পা দেওয়া ঠিক নহে।

যাহা হউক, 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকাখানি পড়িয়া

কী শিখিলাম? শিখিলাম,—বানান যাহার যে-প্রকার ইচ্ছা তিনি সেই প্রকার করিতে পারেন। সুবিধার জন্য দুইটি অক্ষর বাড়িয়াও গেল। তিনটিও বলা যায়,—একটি বক্র আ, একটি পুটুলীওয়ালা জং, আর একটি তলে-ঠেঙ্গা জ। ইংরাজী-আদর্শ ছাড়িয়া চীনা-ভাষার আদর্শ ধরিলাম। উহারাই যে প্রাচীনতম সভ্যজাতি। তবে প্রগতির যুগে ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও ব্যানার্জ্জি—ইঁহাদের টিকি ও পৈতা দেখিয়া অন্যেরা হাসে। অতএব, ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্য—ইঁহাদের 'য' এর পৈতা ( )) খুলিতে হইবে। 'রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনীয়' এই হুমকি ছাড়িলেই কাজ ফরশা হইয়া গেল। আর কয়েকদিন পরে আর একটা হুমকি ছাড়িয়া টিকিটা (´) খুলিয়া দিলেই—'সব শিয়ালের লেজ কাটা।' এই প্রগতির যুগে ব্যানার্জ্জি হয়তো বানর-জিতে পরিণত হইবে। ৺ললিত বাবু বলিয়াছেন,—"ভট্টাচার্য্যের পুত্রদ্বয় পৈতৃক সম্পত্তি 'চুলচেরা' ভাগ করিতে গিয়া পৈতৃক উপাধিটা পর্য্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করিয়া দখল করেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র ভট্ট ও কনিষ্ঠ পুত্র আচার্য্য উপাধি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।.... ভট্রশাখা হইতে আচার্য্যশাখাই বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।" (ফোয়ারা ১২৮ ও ১২৯ পৃষ্ঠা)। সেইজন্য বুঝি, ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্রের পৈতা খুলিল। কপালে আরও দুঃখ আছে—'ভট্চায্' হইয়া যাইবে। মুসলমানদিগের 'মওলবী'-গণ জাকাতের দান ও মুরগী প্রভৃতি মৌ-রের সন্ধান পাইলে সেখানে যাইয়া মৌ-মাছির মত গুন্ গুন্ করেন। ইঁহারা 'মৌলভী'

পর্য্যস্ত হইয়া আছেন। বিশ্ববিত্যালয় একদিন উচ্চারণ-গত ও প্রকৃতি-গত সাদৃশ্যের অজুহাতে 'মৌ-লোভী' করিয়া দিলেই বানান সংস্কার ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মীমাংসা হইয়া যাইবে। তবে এটা ঠিক যে, ৺ললিত বাবু জীবিত থাকিলে 'বাংলা বানানের নিয়ম'কে তাঁহার 'ভাষা-তত্ত্বের' ছাঁচে ফেলিয়া, 'ব্যাকরণ বিভীষিকার' কশাঘাতে সুপথে পরিচালিত করিতেন। একটু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইলেই কাজ চলিত।*

বাঙ্‌লা-ভাষা এখন যথেষ্ট বড় হইয়াছে। উহার নাকে এখন 'দুধের ঘিরাণ মেলে' না; সংস্কৃত-মায়ের কচি খুকীটি নহে। গাজী মুস্তাফা কামালের মত একদিন ভাষার বানানের উপর কামান দাগিলেই ঠিক হইয়া যায়। ক্ষিপ্র ও অকম্পিত-হস্তে ইহা না-করিলে কিছুই হইবে না। 'ভাব'এর জিনিয়সেরা (Genius) যে ভাষার বানান ঠিক করিতে মজবুত তাহা বিশ্বাস করিব কেন? তাহা হইলে মিষ্ট ও মদ একই দোকানে পাওয়া

*প্রফেসর ৺ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ফোয়ারা'র ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 'ভাষাতত্ত্ব' প্রবন্ধে ছাঁটিয়া কাটিয়া তিনি মাত্র পাঁচটী স্বরবর্ণ—অ আ ই উ এ—এবং চৌদ্দটী ব্যঞ্জনবর্ণ ক গ চ জ ড দ ন প ব ম র ল স হ—রাখিয়াছেন। "বাঙ্গালীর গৃহকোণে পন্থীর প্রভাব ও গৃহের কানাচে পেঙ্কীর প্রাদুর্ভাব থাকিতে অনুনাসিকের অভাব হইবে না। অতএব, অনুস্বারকে তালাক দিতে হইবে'—এইরূপ অনেক বক্তব্য লিখিত আছে। পাঠকগণ সেই প্রবন্ধ পড়িতে পারেন। 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' শব্দ-প্রয়োগ-সম্বন্ধীয় সমালোচনা পুস্তিকা—তাঁহারই লেখা।

—গ্রন্থকার।

যাইত। মিল্টন্ (Milton) জন্মান্ধ হইয়া কখনও কবি হইতে পারিতেন না, নিরক্ষর পাগলা কানাইও* বাঙ্‌লা-ভাষায় ছড়ার নূপুর বাজাইতে পারিতেন না। রূপ-রস-গন্ধ যাঁহারা স্বষ্টি করেন, তাঁহারাই যে বানান-সমস্যার সমাধান করিবেন সে আশা করা অনুচিত। কিন্তু, কাহার কথা কে শুনে ? 'অরণ্যে রোদন' তথা 'মুক্তা ছড়ান'। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক 'বাংলা বানানের নিয়মে' আট্‌কা-আট্‌কি ও ফশ্‌কা-ফশ্‌কি—এই উভয় প্রকার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া সাহিত্যিকদিগের বগল বাজাইবার সুযোগ হইয়াছে।



* সরোজ-কুমার মুখোপাধ্যায়-বিরচিত "শরৎ কুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্ত্তমান যুগ" নামক পুস্তকের ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। —গ্রন্থকার।

গোলকচন্দ্রের সাহিত্য-সেবায় গোল।

(তৃতীয় উদ্যম)

সাহিত্য-সেবার নেশা সোডা-ওয়াটারের বোতলের মত। জুড়াইতে দিলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যায়। অতএব, বানান-বিভ্রাটে পড়িয়া ঘোল-সাগরে হাবুডুবু খাইলেও হুজুগ থামিল না। বানানের যখন কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই তখন আর ভয় কী? যে বাঙ্‌লা-ভাষার এক 'বড়' শব্দটি দিয়া—large, big, great, spacious, famous, notorious, long, older ইত্যাদি দশটি ইংরাজী শব্দের কাজ করাইয়া লওয়া চলে, সেই বাঙ্‌লা-ভাষার হরেক রকম বানান-সমস্যায় পড়িয়া যে ভয় পাইয়াছিলাম তাহা no-principle-রীতির দৌলতে এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। হুজুগের মাথায় লিখিয়া ফেলিলাম ঢের। 'কোঁচা ও কাছা', 'সাহিত্যিকের বিপদ', 'রসের শূন্য-পাত্র ও তিতোর ভাণ্ডার', 'বৈঠকে বেফাঁস', 'ক্ষীর পায়াসের ঠেলাঠেলি', 'পৈতা আর টিকির ঝগড়া', ইত্যাদি কত কী! 'কোঁচা ও কাছা' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম নমুনা-স্বরূপ তাহার সারাংশ দিতেছি।—*

'কোঁচা' কথাটায় চন্দ্রবিন্দু থাকাতে বলিতে একটু আরামও পাওয়া যায় আবার শুনিতেও মিষ্ট-মধুর। কেননা,

* 'বিচিত্রা' পত্রিকায় একবার বাঙ্গালীদের তথা ভারতীয়দের জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। পায়জামা ও পাঞ্জাবী সব চেয়ে বেশী ভোট পাইয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে।—গ্রন্থকার।

বাঙ্গালী-ঘরের গিন্নীর নাকে-কান্নার আভাস পাওয়া যায়। ঠিক এমনি করিয়া যদি 'কাছা'কে 'কাঁচা' বলিতে পারিতাম তাহা হইলে 'কোঁচা' ও 'কাছা'র মিলনটাও ঘনিষ্ঠতর হইত। কিন্তু 'কাছা'কে 'কাঁচা' বলিয়াছি কি বাঙ্গাল বনিয়া যাইব। ভাষার ভিতরে যাদু-বিদ্যার পরিচয় চলে না।

পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে ধুতির ছয়-হাত গুটাইয়া কোঁচার সৃষ্টি। কোঁচাটি না থাকিলে আমাদের আব্রু রক্ষা করা একটু দায় হইত। রেল ষ্টীমারের সিঁড়ি পরিষ্কার করিতেও মেথরের দরকার হইত। আবার, সেই কোঁচার অগ্রভাগে রুমালের কাজ হয়,—রুমাল কেনার দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি। কোচাটি আছে বলিয়া সময়ে অসময়ে বীরের মত মালকোঁচা মারিয়া লড়ি। কোঁচার অগ্রভাগ পায়ের নীচে পড়িলে স্থবির বাঙ্গালীর মাঝে মাঝে ব্যায়ামের কাজটাও হইয়া যায়। কোঁচার দৌলতে পরশুরাম-বিবৃত নন্দলালের মত জিহ্বা বাহির করিয়া দুই-এক-ঘণ্টা থাকাটাও আশ্চর্য্য নহে।

আর কাছা? ছেলেরা বলে,—'ওটা লঙ্কা-বিজয়ী হনুমানের লেজের স্মৃতি-গুচ্ছ'। কাছা না থাকিলে মালকোঁচা গুঁজিবার স্থান খুঁজিয়া পাইতাম না। আর কাছাটির সাহায্যে উরুদেশের পশ্চাদ্ভাগের কতকাংশ উলঙ্গ রাখিতে পারিয়া আদিম অসভ্যদিগের কতকটা সভ্যতা রক্ষা করিতে পারিয়াছি। আদিম অসভ্য-জাতিই পুরাতন বনিয়াদি জাতি (Aristocrats)।

কেহ কেহ বলেন,—'পূর্ব্বে আমরা দশ-হাত ধুতি পরিয়া

কোঁচায় পাড়ের বাহার দেখাইতাম। তাহার উপর আবার কাঁধের উপর ছয়-হাত ওড়না উড়াইতাম। আর আজকাল তাহার বদলে ধুতির সহিত পিরহান ব্যবহার করিয়া অৰ্দ্ধেক আদব-কায়দা-মত পোষাক পরিতে শিখিয়াছি' ইত্যাদি। এ প্রবন্ধ যথাসময়ে মাসিকে বাহির হইল।

ইহার পরে আবার 'পৈতা আর টিকির ঝগড়া' কাগজে বাহির হইল। অমনি 'শনিবারের চিঠি' আসিয়া শাসাইল, 'রবিবারের লাঠি' মাথায় পড়িল, আর 'বুধবারের কীল' পড়িল ঘাড়ে। *

চতুৰ্দ্দিক হইতে যেন রক্ত-চক্ষু ছুটিয়া আসিতে লাগিল। জবাবে কেবল-মাত্র লিখিয়াছিলাম যে, ধুতিটা ভাল নহে, বাঙ্গালী-দের জাতীয়-পোষাক পায়জামা ও পাঞ্জাবী হওয়া উচিত। আর জমিদার কালীপ্রসন্ন মহাশয় যে ব্রাহ্মণদের টিকির দাম দিয়া কাটিয়া ফেলিতেন—ইহাতো ইতিহাসের কথা, অস্বীকার করিবার যো নাই। ইহার পরেই বেনামা চিঠি পাইলাম,—"ফের কথা বলিলে তোমার টুঁটি চাপিয়া মারিব।" বুঝিলাম,—এইসব বিষয়ের আলোচনা করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে নাম জাঁকাইতে পারিব না। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হইল। হাঁ, আমার লেখা কাগজে বাহির হইতে না হইতে যখন সকলেই সমালোচনা লিখিয়া আমাকে পৰ্য্যুদস্ত করিয়া ছাড়ে তখন আমিও বা

* 'শনিবারের চিঠি' ও 'রবিবারের লাঠি'র কথা যাহা বলিতেছে তাহা বোধ করি, সত্য। কিন্তু 'বুধবারের কীল' বোধ হয় স্বপ্নে ঘটিয়া থাকিবে।
—গ্রন্থকার।

তাঁহাদিগকে রেহাই দিব কেন? কিন্তু দেখিলাম, সমালোচনার কাজে খাটুনি অনেক, পুঁজি অনেক বাড়াইতে হয়। অনেক বই পড়িতে হয়, তবে সমালোচনা লেখা চলে। উপায়ান্তর না দেখিয়া এই ভয়াবহ কাজে লাগিয়া গেলাম। বিস্তর খাটিলাম; পরে নেশায় ধরিল।

'নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, নাহিক বিশ্রাম,
অবশেষে উপজিল মাথার ব্যারাম।'

এই প্রকার অবস্থা আমারও হইবার উপক্রম হইল।



গোলকচন্দ্রের সাহিত্য-সেবায় গোঁল।

(চতুর্থ উদ্যম।

অতঃপর, সত্য সত্যই একদিন সমালোচনা লিখিবার মত ভয়াবহ কাজে হাত দিলাম। প্রথমেই সুরসিক সাহিত্যিক-গণকে ধরিলাম। লিখিলাম,—৺অমৃতলাল বসু, ৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, ৺টেঁকচাঁদ ঠাকুর—ইঁহারা যে রসের সমুদ্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সাঁতার কাটা চলে, কিন্তু সেই অথই রসে ঠাঁই নাই বলিয়া অবগাহন করিয়া স্নান করা চলে না। সেই সমুদ্রে আমরা ভাসিয়া বেড়াই, হাবুডুবু খাই। উঁহার রসের ঢেউগুলি আমাদিগকে ঠেলিয়া আনিয়া কূলে আছড়াইয়া ফেলে। কিন্তু, সেকালের ৺বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় এবং একালের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক মহাশয়েরা আমাদিগকে চোরা-বালির টানের মত আস্তে আস্তে অজ্ঞাত অবস্থায় রসের সমুদ্রের মধ্যে লইয়া যাইয়া আমাদিগকে একেবারে ডুবাইয়া মারেন। আমরা রসের মধ্যে তখন স্নাত হই, সিদ্ধ হই। আমাদের গা ও মন ঘামিয়া রস বাহির হইয়া সেই রস-সমুদ্র আরও স্ফীত করিয়া তোলে। তারপর, আমরা সেই সমুদ্রে ডুবি, মজি, ভাসি, আবার ডুবি, ফুটিক রস গিলি, পেট কাঁপিয়া মরি এবং রসে সিদ্ধ হইয়া ট্যান হইয়া বাঁচিয়া থাকি। 'আলালের ঘরের দুলাল' আমাদিগকে রসে মজাইতে পারিল না, একেবারে ভাসাইয়া দিল। ৺মাইকেল দত্তের 'বুড়া শালিকের

ঘাড়ে রোঁ' আমাদিগকে ভূতের ভয় দিয়া কাছে ঘেঁসিতে দিল না। হাল্‌কা-লেখা না হইলে পড়িবার পরে বুঝিবার জন্য ভাবিতে হইত। অতএব, চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া রস বাহির হইত। সেইজন্য, মনে হয় রসের লেখায়ও কাঠিন্য প্রয়োজন।

আমার এই সমালোচনা বোধ করি, সমঝদারেরা বুঝিয়াছিলেন। অতএব, এ সম্বন্ধে আর কোনও আপত্তি উঠিল না।

দ্বিতীয়বারে কোন্ বিষয় লইয়া সমালোচনা লিখিব তাহা ভাবিতে হইল না। কে একজন 'বাঙ্‌লা-ভাষার একশত-খানি ভাল বই'য়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়া কাগজে বাহির করিলেন। অমনি চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল,—'হরির-লুট লাগিল।' আমিও ছাড়িলাম না। সুযোগ বুঝিয়া লাফাইয়া পড়িলাম, একটা কিছু লিখিলেই তো ছাপার অক্ষরে নাম বাহির হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে জাহির হইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিলাম :—

গত ফাল্গুন-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় 'বাঙ্‌লা-সাহিত্যে একশতখানি ভাল বই'য়ের তালিকা প্রকাশিত করিয়া 'সাহিত্য-জগতে' নাকি 'এক অভিনব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন' এবং উহা নাকি তাঁহার 'অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হইয়াছে'—ইহাই আমাদের রমেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের অভিমত। কিন্তু, সেই দুঃসাহসিক কাজে তিনি নিজে যোগদান করিয়া অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঝালে ও অম্বলে প্রিয়রঞ্জন বাবুকে কিছু মিষ্টিমুখ (?) করাইয়া নিজে আর একখানি পাল্টা তালিকা প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছেন (বিচিত্রা,

আষাঢ়)। উভয় বাবুর বাছাই-করা একশতখানি বাঙ্‌লা পুস্তকের নাম (ভাল করিয়া হিসাব করিলে প্রায় দুইশতখানি হইবে) আমরা দেখিয়াছি। (আমরা'র ভিতরে যিনি না আসিতে চাহেন তিনি সসম্মানে সরিয়া পড়িতে পারেন।)

রমেশ বাবু দোহাই দিয়াছেন—থুড়ি, হলফ করিয়াছেন যে, তাঁহার একটি পুস্তকাগার আছে—সেইটাই তাঁহার পুস্তক নির্ব্বাচনের কোয়ালিফিকেশন্ (Qualification)। আমিও একটা ত্রাহি মধুসূদনের ইংরাজী বোল ঝাড়িয়া আপনাদিগকে ভড়কাইয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি। অনুরোধ, 'স্বদেশী' যাঁহারা তাঁহারা যেন ইংরাজী দেখিয়া নন্‌কো-অপারেশন্ করিয়া না বসেন।

"No book has a right to exist which has not for its purpose the betterment of mankind by affording either useful information or healthful recreation". ইহার বাঙ্‌লা তর্জ্জমা করিয়া আমার মুরদ বাড়াইতে চাহি না। পুস্তক নির্ব্বাচনের 'ভাল'র মাপকাঠি যে কী—তাহা এই ইংরাজী বাক্যটীর মধ্যে আছে। রমেশ বাবুর মত আমিও বলি 'Prolificity is a sign of genius' এবং 'পুস্তক নির্ব্বাচনে অক্লান্ত-কর্ম্মী সাহিত্য-সেবীদিগের প্রাণ-পাত পরিশ্রমের দানকেই উপরে স্থান দিতে হইবে।' তাহা হইলে, ঐ লিষ্ট-মধ্যে অতগুলি উপন্যাস স্থান পাইল কেন? শেরে-হিন্দ ৺অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের 'সিরাজুদ্দৌলা', মওলানা আকরাম খাঁ

সাহেবের 'মোস্তফা-চরিত', এয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেবের 'শান্তিধারা'—এগুলি বাদ পড়িল কেন? অক্ষয় বাবুর চোটে অন্ধকূপ-হত্যা উড়িয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর কলঙ্ক মোচন করিয়া তিনি ঐতিহাসিকের উপর মাতব্বরি করিয়াছেন। এখন প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের শ্রেষ্ঠ-পুরুষ ৺বঙ্কিম বাবুর অপকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিবার মসলা পাইতেছেন। "সিরাজুদ্দৌলা' একশত কেন, বিশ-খানি ভাল বাঙ্‌লা বইয়ের মধ্যে স্থান পাইবে। প্রফেসর জে, এল, ব্যানার্জ্জির মতে 'মোস্তফা-চরিত' বাঙ্‌লা-ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। আচার্য্য রায় উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বহুমূল্যবান দলিল দস্তাবিজ ও নথিপত্র ঘাঁটিয়া ঘুঁটিয়া, বহু আরবী, ফারসী, উর্দ্দু ও ইংরাজী পুঁথির সার-সংগ্রহে ও অজস্র অর্থব্যয়ে 'সিরাজুদ্দৌলা' ও 'মোস্তফা-চরিত' প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইখানি বই বাদ দিবার কী অজুহাত আছে জানি না। মনে হয়, উপন্যাস-রাজির স্থান করিবার জন্য এই অপকীর্ত্তি করা হইয়াছে।

এক-একজনের নিকট এক-একখানা বই ভাল লাগিবে ইহা স্বাভাবিক। অতএব, এরূপ নির্ব্বাচনে যিনি প্রথম হাত দিয়াছিলেন, (মন নয়) এখন দেখিতেছি তিনি একটি অপকর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন। বাঙ্গালী-সমাজ অনেকদিন পর্য্যন্ত ইহার জের টানিবে। 'হারু খ্যাপা' আবার দেখা-দেখি 'একশতখানি মন্দ বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছে—(ভারতবর্ষ, আষাঢ়)। ইহাকেই বলে,—Danger of setting the ball

rolling on. (ফুটবল খেলোয়াড়েরা ভয় পাইবেন না)।*

ইহার পর যাহা হইল তাহা ভাবিতে গেলেও আমার বীর-হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া যায়। চারিদিকে শাণিত-দন্ত বিস্ফারিত হইল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উত্তোলিত হইল। কেহ বলিল,—'ও হিন্দুর সন্তান নহে, হিন্দুনাম ছদ্মনাম', কেহ বলিল,—'হিন্দুর সন্তান, কিন্তু মুসলমানের ভাড়াটিয়া', কেহ বলিল,—'মাথা খারাপ', কেহ বলিল,—'নিছক পাগল', কেহ বলিল, 'উপন্যাসের মর্ম্ম বোঝে না', কেহ বলিল,—'নেমক-হারাম', কেহ বলিল, 'রাতা-রাতি গজাইল কোথা হইতে?' আবার কেহ বলিল,—'কলির অবতার, হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত', কেহ বলিল,—'ওকে একটু মুসলমানের গুণ গাহিতে দাও না, 'আনন্দবাজার' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকাদ্বয়ও তো মুসলমান এম-এ পাশ-করা এক পণ্ডিতকে পাইয়াছে।' এইসব দেখিয়া শুনিয়া ভাবিলাম,—ওসব জীবন্ত ব্যাপারে হাত না দেওয়াই ভাল। সেইজন্য, সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে সাময়িক বিদায় লইয়া অক্ষর-তত্ত্বে মনঃসংযোগ করিলাম। কারণ দুইটি—(১) অক্ষরই ভাষার পরমাণু—atom, molecule বা element—যাহাই বলা হউক না কেন, আর (২) এই তপ্ত-দেশে বাক্-শক্তিহীন প্রাণহীন প্রাণী লইয়া নাড়া-চাড়া করিলে বিপদ-গ্রস্ত হইবার ভয় নাই।

---

*সত্যই একবার বাঙলা-দেশের আকাশ বাতাস গরম হইয়া উঠিয়াছিল। ১৩৪১ সালের ৮ম বর্ষ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় আমার 'বাঙলা সাহিত্যে একশতখানি ভাল বই' শীর্ষক লেখাটি গোলকচন্দ্র পরিবর্তিত ও সঙ্কুচিত করিয়া নিজের করিয়া লইয়াছে;—ও একটা চোর।—গ্রন্থকার।

গোলকচন্দ্রের সাহিত্য-সেবায় গোল।

(পঞ্চম উদ্যম)

প্রথমেই 'স'কারের গুণ-কীর্ত্তন করিলাম, "স'কারের সৎসাহস' লিখিলাম। 'স' বলিতেছে ঃ—

"দেখ, তোমরা কাহারও সম্মান বুঝিতে সমর্থ নহ। আমার সম্মানের প্রশংসা করিবার অবসর তোমাদের জুটিল না, ওদিকে 'ক'কারের অহঙ্কার, 'ম'কারের মাহাত্ম্য, 'প'কারের পাগলামি, 'র'কারের রাহাজানী এবং সর্ব্বশেষে 'ন'কারের নেকামি ইত্যাদির সমর্থন করিয়াছ। আমার সৎসাহসের কথা কিছু শুনিলে কি তোমাদের সম্মানের হানি হইত?

"বসুন্ধরার সৃষ্টির মধ্যে কে? আমি। সূতিকা-গৃহে তোমার প্রসূতি তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই সূতিকা-গৃহের মধ্যে প্রথমেই আমি। স্তন্য পান করিয়াছ সে আমারই দান। নার্সের স্নেহ দিয়াছি আমি। আমি তোমার রক্ত-মাংসে সংমিশ্রিত হইয়া আছি, এত অল্পদিনে ভুলিলে চলিবে কেন? তোমার মস্তিষ্কের ভিতর বসিয়া আছি। নাসিকার মধ্যে থাকিয়া ফুস্‌ফুসের কার্য্য করিতেছি। শ্বাস প্রশ্বাস আমারই দ্বারা চলিতেছে। তোমার হস্তে থাকিয়া পেন্‌সিল বা মসী-সহকারে লিখিতে সাহায্য করিতেছি। খাইতে যাও আমাকে সেখানে পাইবে। আসনে, বাসনে, গ্রাসের মধ্যে, মৎস্যে, মাংসে, ভাতের গ্রাসে, সন্দেশে, রসগোল্লায় আমি

সংমিশ্রিত হইয়া আছি। ফস্-ফরাস্ এসিড্ যে স্নায়ু-সমষ্টির পরিপোষণ সাধন করিয়া স্বাস্থ্যে অপরিমিত বলসঞ্চার করে তাহার একমাত্র কারণ উহার ভিতরে আমি আছি। পাকস্থলীতে আছি বলিয়াই তোমার খাদ্য-দ্রব্য হজম হইতেছে। তারপরে দেখ, আমি সর্ব্ব-প্রকার রসের ভিতর কেমন রসিকতা করিতেছি, যেমন—সুগন্ধি সর্জ্জ-রস, সাহিত্য-রস, খেজুর-রস, কাব্য-রস, ইক্ষু-রস, ইত্যাদি। কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি ষড়-রসকে আমি-ই সরস করিয়া তুলিয়াছি; আর তুমি যে শৃঙ্গার, বীভৎস, বীর, করুণ প্রভৃতি নব-রসের সমঝদার রসজ্ঞ সাজিয়াছ তাহার মূলেও আমি আছি। রসনার রস-বোধ আমারই দান। আরও দেখ,—আমি-ই রসালের রসের সারাংশে আমসত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছি।

"আমারই জন্য তোমার সহচর, সহচরী, মাসিমা, পিসিমা, সন্তান-সন্ততি, বয়স্য, সঙ্গী, সঙ্গিনী, সুহৃদ তোমাকে এত ভালবাসেন। সচ্চরিত্রবান স্বামীর প্রতি সিন্দূর-পরিহিতা, সতী, সাধ্বী স্ত্রীর সাদর-সম্ভাষণ আমারই কল্যাণে স্বাদু এবং সুমিষ্ট। তুমি সৌন্দর্য্যবান, সৌভাগ্যবান, সুকোমল, সুন্দর, সুধীর, সুশীল, সৎ, সভ্য, সাধু—এ-তো আমারই জন্য। স্কুলের রাস্তায় আমি তোমার সাথী, সেখানে আমি তোমাকে সালাম করিতে সঙ্কোচ-বোধ বা কসুর করি না। স্বয়ম্ভূ-নন্দিনী বা মানস-কন্যা সরস্বতী—আমার সখী। পুস্তক—তা সংস্কৃতই বল, আর ফারসীই বল—আমি ইহাদের ভিতরে আছি। ইতিহাস বা হিস্ট্রী,

রসায়ন-শাস্ত্র; ইকনমিক্‌স্‌, পলিটিক্‌স্‌, ইথিক্‌স্‌, ফিজিক্‌স্‌, অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য, উপন্যাস ইত্যাদির সহিত আমার নিকট-সম্বন্ধ। অবশেষে দেখ, তোমার প্রিন্সিপাল ও প্রফেসর-দিগের সহিত কেমন ভাব করিয়া লইয়াছি। কলেজে নাই বটে, স্কুলে এবং ইউনিভার্সিটীতে তো আছি। সাঁয়ান্সের উন্নতি ও সংস্কার, কঠিন সমস্যার মীমাংসা ইত্যাদি আমার কল্যাণেই সম্পন্ন হইয়াছে। ফেল আর পাসে এত তফাৎ কেন জান? একটায় আমি আছি—অন্যটায় নাই। আমি না থাকিলে তোমার ভরসা থাকিত কি? আমি সোসাইটীতে, কন্‌ফারেন্সে, কংগ্রেসে, সম্প্রদায়ে, স্বদেশে, সাহিত্যে, সমাজে, সঙ্ঘে, সভায়, সমিতিতে থাকিয়া কত সমস্যার সমাধান করিতেছি। আমি স্বদেশ-হিতৈষী, স্বরাজ-পন্থী, সাহিত্য-সেবী, সমাজ-পতি, সভাপতি ইত্যাদির মস্তিষ্কে থাকিয়া সর্ব্বস্থানে সর্ব্বসময়ে সকলকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছি।

"তুমি সম্রাট হইয়া প্রাসাদের ভিতরে সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য-শাসন কর অথবা সশরীরে সমর-ক্ষেত্রে ভীষণ সংগ্রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টায় সৈন্য-সমাবেশ-পূর্ব্বক সশস্ত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন কর, অথবা সন্ধি-স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া সাময়িক-ভাবে সকল উপসর্গের সমাধান কর—এ সর্ব্ববিষয়েই আমার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে কি? ফসল-উৎপাদনকারী সামান্য গৃহস্থের ন্যায় সহোদরের সহিত মাসিমার সম্পত্তি লইয়া বিসম্বাদে সময়াতিপাত করিয়া

সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দাও, অথবা ব্যবসায় করিয়া পয়সা ও আস্‌বাব-পত্র বাড়াইবার চেষ্টা কর—আমাকে ছাড়া কিছুই পারিবে না। তুমি কাহারও কোন জিনিষ চুরি করিবার পর সাহেবের সম্মুখে আসামী হইয়া দাঁড়াইলে আমি তোমার পক্ষ সমর্থন-পূর্ব্বক সাক্ষী স্বরূপে সরাসর মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদান করিব, তাহাতে তোমার ফাঁসী, নির্ব্বাসন, কারাবাস বা খালাস—যাহাই হউক না কেন তাহাতেই আমি রাজী।

"দেশ-শাসন, সমাজ-শাসন, পল্লীসংস্কার—সকলই আমার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। আমি না থাকিলে দাসদাসী থাকিত কি? বিলাসিতা চলিত কেমনে? আমি সিংহের ভিতরে আছি, তাই সিংহ পশুদিগের রাজা। আমার সৃষ্টির মহিমায় সূর্য্য বা ভাস্কর সৌরজগতের শ্রেষ্ঠ গ্রহ এবং সুধাকর এত সুন্দর এবং সুমধুর। বাসব যে কেন সুরেশ্বর তাহাতো বোঝ-ই। আমি না থাকিলে সন্ন্যাসীর তপস্যা সিদ্ধ হইত কি? সাদা ও সবুজপুষ্পের এত কদর তাহার কারণ—আমি-ই উহাদিগকে সৌরভ-দান করিয়াছি। স্রোতস্বিনী, সরোবর, সিন্ধু বা সাগর, উপসাগর, মহাসাগর আমারই সৃষ্টি, উহাদিগকে তরঙ্গ-সঙ্কুল আমি-ই করিয়াছি। আবার সন্তরণ-অনভিজ্ঞ হতভাগার জন্য ইহাঁদের সৈকত-ভূমি আমারই কীর্ত্তি। তোমাদের বয়স এবং সময় নিরূপণ করিবার জন্য—দিবস, সপ্তাহ, মাস এবং বৎসর ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়াছি।

"ভাসমান' শব্দের ভিতরে আমি ছিলাম বলিয়া কালীপ্রসন্ন

ঘোষ মহাশয় অন্ত গোলমালে পড়িয়াছিলেন। সেকেন্দর, নেলসন প্রভৃতির মত বীর ফেরদৌসী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সুরেন ব্যানার্জ্জি ও কেশব সেনের মত বাগ্মী, বিদ্যাসাগর, মোহাম্মদ মোহসীনের মত দান-বীর আমারই কল্যাণে প্রশংসিত। তোমাদের নামের সহিত লেজুড় দিতে আমি ওস্তাদ, যেমন,—সরকার, সাঁন্যাল, বিশ্বাস, সরদার, শাস্ত্রী, সেখ, সৈয়দ, সেন, সোম, বসু, দাস ইত্যাদি।

"সুসংবাদেও আমি, কুসংবাদেও আমি। অসম্পন্ন-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে কস্মিনকালে আলস্যবোধ করি না। স্বাভাবিকের সহিত অস্বাভাবিক, সামঞ্জস্যের সহিত অসামঞ্জস্য, সুপ্রসন্নতার সহিত অপ্রসন্নতা না থাকিলে মানুষের বিস্ময়ের সৃষ্টি হইত কি? ওসবের ভিতরেও আমি সংশ্লিষ্ট। সাধারণ জিনিষ অসাধারণ হউক, প্রশস্ত স্থান অপ্রশস্ত হউক, অসার সংসার সার হইয়া যাউক, সম্ভব অসম্ভব হউক, সত্য অসত্য হউক, সুর অসুর হইয়া যাউক, আর সৎ ছেলে তুমি অসৎ হইয়া যাও তাহাতে আমার কিছুমাত্র আসিয়া যায় না,—আমার প্রতিপত্তি ঠিকই থাকিবে—তাহা তোমরা স্বীকারই কর আর অস্বীকারই কর।

"সুন্দর কিসলয়-সজ্জিত নিসর্গে আমি, আবার তস্য ধ্বংসেও আমি। অবনতির সূত্রপাতেও আমি, তার চরম সীমায়ও আমি। সুন্দর ভাষায় সুমিষ্ট-ভর্ৎসনা-তিরস্কারেও আমি, আবার সচপেটাঘাত আদর-সম্ভাষণ-পুরস্কারেও আমি। শাস্তিতেও আমি, বকশিসেও আমি। বিস্ময়েও আমি, সংশয়েও আমি। সাহসে এবং দুঃসাহসে বা ত্রাসে, হ্রাসে এবং প্রসারে, সমানে

এবং অসমানে, সুবিধায় এবং অসুবিধায়, সসীমে এবং অসীমে, সর্ব্বোপরি বেহেস্তে কৈলাসে বা রসাতলে আমার প্রভুত্বটা একবার দেখিও। অসহায় অবস্থায় কলসী এবং রসী-সহযোগে সহায় আমি। সাধ্য, অসাধ্য, অভ্যাস, অনভ্যাস, সন্দেহ, নিঃসন্দেহ, সাঁমর্থ্য, অসামর্থ্য, সদৃশ, বিসদৃশ ইত্যাদি সগোষ্ঠী আমার উৎসঙ্গে স্থান লইয়াছে। উৎসাহ, উল্লাস, উচ্ছ্বাস, লালসা ইত্যাদি আমারই শিষ্য।

"উপসংহারে সংক্ষেপে আমার সমাচার জ্ঞাপন করিতেছি, শোন।—নামটী আমার 'স'। আমি সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি। স্বেচ্ছাচার যে ভালবাসি তাহাতো প্রমাণ-সই, তবে একটু উদাস উদাস ভাবের, তাই তোমরা অতটা খেয়াল কর না। আমি সমস্ত সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহ করি এবং সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করি। হিংসার আগুনে পুড়িয়া ভস্মে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছি, তাই আপাততঃ চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে আমার বাস।

"বাজে বকুনি থাক্। তোমাদের মস্তকে এবং স্কন্ধে তো চড়িয়াছি-ই। আরও দেখ, প্রণামের সময়ে "ক'কারের অহঙ্কার" চূর্ণ করিয়া, তস্য স্কন্ধে চড়িয়া বক্রগ্রীবায় হাসিতে হাসিতে সিংহনাদে ঘোষণা করিতেছি—'নমস্কার'।"

প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ৺ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন,—"বাবা, এত অল্প-বয়সে বুড়াদের ঘাড়ে চড়িয়া 'সিংহনাদ' করা

ভাল নহে। আমার 'ক'কার যদি হুঙ্কার দিয়া হাঁকিয়া আসে, তাহা হইলে তোমার 'স' সভয়ে সরিয়া পড়িবে।" বুঝিলাম,—উনিও আবার 'ক'কারের অহঙ্কার' লিখিয়া বসিয়াছেন,—এ বনেও বাঘ-সাপ-ব্যাঙ আছে। সাহিত্যিকেরা সবই লিখিয়া ফেলিয়াছে! তবে যাই কোথায়?*

["সেলাম"

কাজী সাহেবের 'সৎসাহসে' খুসী ও সাহসী হ'য়ে তার নমস্কারের স্থানে আমার সহস্র সেলাম। খোদা তাঁকে মেজাজ সরীফে রাখুন।

আমি নামে তাঁর কাছে ধরা না পড়'লেও "সান্যালে" ধরা প'ড়েছি। সুতরাং সরমের মাথা খেয়ে স্ব-প্রকাশ করায় দোষ (মূর্দ্ধন্য হ'লেও দোষ নেই) হবে না। আমি পেন্সনপ্রাপ্ত

*'স'কারের উদ্দেশ্য ছিল,—'ক'কারের অহঙ্কার চূর্ণ করে। নকৃশা-খানি ইংরাজী ১৯২৯ সালের Vol. XVI. No. 1 Presidency College Magazineএ প্রকাশিত হইয়াছিল। "ক'কারের অহঙ্কারের' স্রষ্টা স্বর্গীয় ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ দীন-লেখককে তাঁহার দৌলতখানায় হাজিরা দিবার জন্য একটি ছাত্র-মারফত আদেশ করিয়াছিলেন। সেদিন সন্ত্রস্ত লেখকের ভাগ্যে উপহাস ও ভৎর্সনা-তিরস্কারের স্থানে আদর-সম্ভাষণ-পুরস্কার ও উৎসাহ জুটিয়াছিল। গোলকচন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র—উহার সব কাজেই যে কেবল গোল। হইবে না? ও ঘোর মিথ্যাবাদী। "ক'কারের অহঙ্কার' পড়িবার আগে "স'কারের সৎসাহস' কিছুতেই লেখা হয় নাই।—গ্রন্থকার।

৬

সিবিল-সার্জ্জন এবং অধুনা সাহিত্য-সেবী। মধুসূদনের সকল কাব্যেরই সটীক সংস্করণ ও সমালোচন এই অধম কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কালিদাসের কুমার-সম্ভবের বাংলা (তাও সটীক), সীতা ও সরমা (জোড়া স !) বাল্মীকি-রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন এবং কয়খানি সরল স্বাস্থ্য-গ্রন্থ রচনা ক'রে, স্থবির হ'লেও, এখন সুখে জীবন সমাপনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এই বৃদ্ধস্য একটি সার-বচন স্মরণে রাখবেন, কাজী সাহেব,—এ সংসারে শ, ষ, স তবে হ। অনেক সহিয়া তবে হইতে হয়। ভরসা করি, আপনি সরীফ-মেজাজে সংসার-যাত্রা-থিয়েটারাদি সৎকার্য্য ক'রে এবং তাতে সফল হ'য়ে, সকলের সঙ্গে দোস্তি ক'রে সুখে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে থাকুন। বিস্তারেনালম্।

কৃষ্ণনগর, সতেরই অক্টোবর, ১৯২৯।
(মাসটা সেপ্টেম্বর হ'লে বড়ই সঙ্গত হ'ত, কিন্তু সময়ের উপর হাত নাই,—নিরুপায়)॥*

শুভানুধ্যায়ী (শেষটা তালব্য হ'য়ে গেল, যাক্ উচ্চারণে ঠিক আছে)
শ্রীদীন নাথ সান্যাল
(বয়স—সত্তর পার)

---

* 'সংস্কারের সৎসাহস' কলেজ-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হইলে বিখ্যাত টীকাকার রায় বাহাদুর দীন নাথ সান্যাল মহাশয় এই লেখাটি পাঠাইয়া ইহা Presidency College Magazine, Vol. XVI No. 2-তে প্রকাশিত হইয়াছিল।—প্রকাশক।

গোলকচন্দ্রের পাটীগণিতে গোল।

সাহিত্যের হাটে নাম কিনিতে পারিলাম না বলিয়া কিছুদিনের জন্য একটু দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। তাহার পর, যে-বৎসর কলিকাতা নগরীতে আন্তর্জ্জাতিক বিজ্ঞান সভার অধিবেশন হয়, সেই বৎসর আর একবার প্রবন্ধ হস্তে লইয়া বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, বহুকাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘর-বিশেষে প্রবেশলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এবারেও সিনেটের ঐ-ঘরে সেই চিরাচরিত প্রথা-মত দাখেল হইতে পারিলাম না। চাকুরীর উমেদার যেমন সাহেবের সহিত Interview বা মোলাকাতের সময়ে কী বলিতে হইবে তাহা বারংবার অভ্যাস করিয়া লয়, আমিও তেমনি বিজ্ঞান-সভার বক্তৃতায় কী উদ্গিরণ করিতে হইবে তাহা ভালরূপে ইয়াদ করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু, সময়মত উহা ঐ সভায় পরিবেশন করিতে পারিলাম না। সেইজন্য, উহা আমার জীবনে একটা মস্ত গোল রাখিয়া গিয়াছে। এ আখ্যায়িকার সুসমাপ্তির জন্য উহার উল্লেখ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি। সমস্ত বিজ্ঞানের হিসাবাদি গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে করা হইয়া থাকে। কিন্তু, আশ্চর্য্য এই যে, একটা স্থূল ভুল বৈজ্ঞানিকদিগের দূরবীক্ষণে ধরা পড়ে নাই।

গণিত-শাস্ত্র শিখাইতে গিয়া কর্ত্তারা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০—এই দশটি চিহ্ন ঠিক এইভাবে সাজাইয়া কোমলমতি বালক

বালিকাদিগের পাতে (অবশ্য তালপাতা) পরিবেশন করিতেছেন। কিন্তু, একটু খেয়াল করিলেই দেখা যায় যে,—

(১) কোমলমতি শিশুরা ‘O’ শূন্য বা ডিম্বাকৃতি চিহ্নটী লিখিতে খুব ভালবাসে। স্লেট ও পেন্সিল পাইলেই তাহারা অযথা ডিম্ব কাটিয়া যাইবে। (বাতাসা কাটা মনে পড়ে।) সোজা একটা দাগ কাটা তাহাদের পক্ষে যতটা সহজ তাহা হইতে ‘O’ চিহ্নটী দেওয়া তাহাদের পক্ষে বেশী সহজ। বস্তুতঃ, ১ (এক) লিখিতেও ০ (শূন্য) এবং আর একটি দাগ ৲ মিলাইতে হয়, যেমন—৲, ০=১। অতএব, স্বভাবতঃ ‘O’ (শূন্য) ‘১’ (এক) এর পূর্ব্বে শিখান উচিত।

(২) O এবং ১ হইতে ৯—এই দশটী চিহ্ন সাজাইয়া পাটীগণিতের সংখ্যাগুলি লিখিত হয়। প্রত্যেক ৯টী সংখ্যা অন্তর অন্তর যখন কোঠা বদল হইতেছে তখন ‘১’ এর পূর্ব্বে ‘O’ আসিতেছে। যেমন ৯ এর পর ১ ও ০=১০, তারপর ১ ও ১=১১, ১ ও ২=১২ ইত্যাদি। ১৯ এর পর ২ এর কোঠায় পৌঁছিয়া প্রথমেই ২ ও ০=২০, তারপর ২ ও ১=২১, ২ ও ২=২২। তিনের কোঠায়, চারের কোঠায়—গণিতের সর্ব্ব-কোঠায় এই ব্যবস্থা। তাহা হইলে কোন্ যুক্তিবলে প্রথম চিহ্ন কয়টা শিখাইবার সময়ে ১ এর পূর্ব্বে O না শিখাইয়া ৯ এর পরে শিখাইব? ‘O’ টী ‘৯’ এর ওদিক হইতে ধরিয়া আনিয়া ‘১’ এর এদিকে বসাইতে হইবে। O ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯— এইভাবে লিখিতে হইবে। প্রমাণিত হইল যে সারা পৃথিবীর

গণিতের "বিস্‌মিল্লায় গলদ।" তাহা হইলে, Let Bengal lead the world. বাঙ্গালীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িবে—সংস্কারটা করিয়া ফেলা যাউক।

তারপর আবার,—বাঙ্‌লা-গণিতের 'মধ্যরাস্তায় পথভুল।' উনিশ (উনবিশের ক্ষুদে ভাই) উনত্রিশ, উনচল্লিশ, যথাক্রমে বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশ হইতে কম। কত কম? এক কম। কেন তাহা বুঝিব? আমি ভাষার দাস। বাঙ্‌লা-ভাষার শব্দ অন্যায়, অসঙ্গত ও কলুষিতভাবে ব্যবহৃত হইতে দিব কেন? বাঙ্‌লা-পণ্ডিতেরা ম্যাথেমেটিশিয়ানদের মাথা মাটি করিয়া দিবে না কেন? (পাণের Panic এর মত Simile)। উনচল্লিশ বলিলে যদি ১০, ২২ বা ৩৫ বুঝি তাহা হইলে বাঙ্‌লা-ভাষার most obedient servantকে কাহারও বাধা দিবার ক্ষমতা আছে কি? তাহা ছাড়া, বিংশ, ত্রিশ বা চল্লিশ শিখিবার পূর্ব্বেই বা উনবিংশ, উনত্রিশ বা উনচল্লিশ শিখিব কেন? 'বাপ না জন্মিতে সন্তান জন্মিল?' - 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।'

আবার দেখা যায়, প্রতি নয়-ঘর অন্তর অন্তর পার্ব্বত্য-অঞ্চলে গরুর গাড়ীর মত হ্যাচ্‌কা-টান। কোমলমতি শিশুরা সামলাইতে পারিবে কেন? কথাটা না হয় বুঝাইয়া বলি,—কেননা, কাহারও কাহারও Skullএ আবার Brain create করিতে হয়। আটাইশের পর ঝরিত উনত্রিশ এবং আটষট্টির পরে উনসত্তর শিখিতে ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট কষ্ট হইতেছে। মাত্র দুইটি

নজির দিলাম। সব উন-গুলিই ঐ ধরণের। ফলতঃ, দেখা গিয়াছে যে, শতকিয়া ভাল করিয়া লিখিতে ও পড়িতে শিখিবার পরেও শিশুদিগকে ধরা লিখিতে বলিলে (পরীক্ষা করিলে) অন্য সংখ্যাগুলি অনায়াসে লিখিতে পারে। কিন্তু, 'উন'-বাচক সংখ্যাগুলি লিখিতে বহুদিন যাবত ভুল করে। উন-আশি বলিলে হঠাৎ ৮৯ লিখিয়া বসিবে, উন-ষাট বলিলে ৬৯ লিখিবে। এনার্জ্জি ও সময়ের যথেষ্ট অপব্যয় হইতেছে। এমত অবস্থায় কিং কর্ত্তব্য ?

বিমূঢ় হইলে চলিবে না। ইংরাজীতে নজির রহিয়াছে—Twenty-eight এর পরে Twenty-nine, Thirty-eight এর পরে Thirty-nine, বাঙ্‌লায়ও ন'বিশ, ন'ত্রিশ, ন'চল্লিশ, ন'পঞ্চাশ ইত্যাদি চালাইয়া দিলে কয়েকদিন পরে গা-সওয়া হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ, ইংরাজী সংখ্যাগুলি পড়িতে যাইয়া Eleven ও Twelve ছাড়া আর কোথাও একটু হোঁচট খাই না। Thirteen তো Three ও ten এর সন্ধি! One হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ দুইটা স্থান ব্যতিরেকে Hundred পর্য্যন্ত মোলায়েম (?) রাস্তা। ইংরাজেরা নাকি Progressive race। ছাই, ঐ দুইটা বদ্‌লাইয়া লইতে পারিল না। বাঙ্গালীরা Present perfect race—কিন্তু, বাঙ্‌লা পাটীগণিতের সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতি ও পঠন-রীতি Perfect হইতে পারিল না।

আর কয়েকটারও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এগার, বার, তের, পনর, সতের, আঠার—ইহাদের মধ্যের জ্ঞাতি-ভাই চৌদ্দ,

ষোল ও উনিশ যে কেন চৌর, ছয়র ও নয়র হইল না তাহা যাঁহারা পাটীগণিতের সংখ্যা প্রথম শিখাইয়াছিলেন তাঁহারা জানেন। তাঁহারা এখন নাগালের বাহিরে।

এই সবগুলি পাল্টাইয়া—একদশ, বাদশ, তেদশ, চৌদশ, পাঁচদশ, ছ'দশ, সাতদশ, আটদশ এবং ন'দশ বলিয়া পড়িলে আপাততঃ একটু তিক্ত লাগিলেও মজিলে মিষ্ট হইবে। ওগুলি হইবে সংস্কৃতের একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ প্রভৃতির বাঙ্‌লা-সংস্করণ—অতএব, সমীচীন হইবে।

বারকে দু'দশ ও তেরকে তিনদশ কেন করা উচিত নহে তাহার খতিয়ান এই :—

একবিশের (একুশের উন্নত-সংস্করণ) পরে বাইশ (বাবিশ হইবে) ও তেইশ (তেবিশ) আছে। একত্রিশের পরে বত্রিশ না পড়িয়া বাত্রিশ পড়িতে হইবে, তারপরে তো তেত্রিশ রহিয়াছেই। 'বেয়াল্লিশ' 'বাচল্লিশ' বনিয়া যাইবে। 'তেতাল্লিশ' না পড়িয়া 'তেচল্লিশ' পড়িতে বোধ হয় কষ্ট কম হইবে। 'বাহান্ন' ও 'তেপ্পান্ন'—'বাপঞ্চাশ' ও 'তেপঞ্চাশ' হইবে। এইভাবে সমস্ত সংখ্যার ডাহিনের দুই-গুলিকে 'বা' ও তিন-গুলিকে 'তে' করিতে হইবে। তেতলা কোঠাবাড়ী বলিলে তিন-তলা দালান বুঝায়। বাঙ্‌লার পণ্ডিত-সমাজ আপত্তি তুলিতে পারিবেন না। 'বা' সম্বন্ধে আপাততঃ ঐ প্রকার কোনও উদাহরণ দিতে পারিলাম না। তবে, সমস্ত দুই-ডাহিনে-ওয়ালা সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভোটের সংখ্যা 'বা' এর পক্ষে (for) বেশী। এই Democracyর

যুগে ইহার চেয়ে বড় উদাহরণ কিছু দিবার প্রয়োজন নাই। [বার, বাইশ, বত্রিশ, বেয়াল্লিশ, বাহান্ন, বাষট্টি, বাহাত্তর, বিরাশি, বিরানব্বই—ইহাদের মধ্যে 'বা' ৫ ভোট পাইল, 'বি' ২ ভোট, 'ব' ও 'বে' এক ভোট করিয়া পাইল। অতএব, 'বা' সসম্মানে elected হইল এবং অন্যান্য সকলের deposit money বাজেয়াফ্ত হইল। (এখানেও 'বা')]

সময় সংক্ষেপ। সেইজন্য, অন্যান্য সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে অনুরূপ বলিবার থাকিলেও আর গলা না কচ্‌লাইয়া সোজা আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরিবেশন করিলাম। বাঙ্‌লা-পাটীগণিতের সংখ্যাগুলি নিম্নলিখিত-রূপ পড়িলে ও লিখিলে ভাল হয়ঃ—

শূন্য, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, একদশ, বাদশ, তেদশ, চৌদশ, পাঁচদশ, ছ'দশ, সাতদশ, আটদশ, ন'দশ, বিশ, একবিশ, বাবিশ, তেবিশ, চৌবিশ, পাঁচবিশ, ছ'বিশ, সাতবিশ, আটবিশ, ন'বিশ, ত্রিশ, একত্রিশ, বাত্রিশ, তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পাঁচত্রিশ, ছ'ত্রিশ, সাতত্রিশ, আটত্রিশ, ন'ত্রিশ, চল্লিশ, একচল্লিশ, বাচল্লিশ, তেচল্লিশ, চৌচল্লিশ, পাঁচচল্লিশ, ছ'চল্লিশ, সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ, ন'চল্লিশ, পঞ্চাশ, একপঞ্চাশ, বাপঞ্চাশ, তেপঞ্চাশ, চৌপঞ্চাশ, পাঁচপঞ্চাশ—*

---

*গ্রন্থকারের টীকা বা গৌরচন্দ্রিকাঃ—

পাঁচপঞ্চাশ পর্য্যন্ত লিখিয়া থামিলাম। গোলকচন্দ্র কিন্তু থামিয়াছিল না। সে একশত পর্য্যন্ত আওড়াইয়াছিল। আমি কেন থামিলাম তাহার একটা হাদিস্ বলিতেছি। শুনিয়াছি,—মানুষের জীবনে নিরা-

নব্বইয়ের ধাক্কা থাকে। আমার জীবনে একটা পাঁচপঞ্চাশের ধাক্কা আছে। সেইখানে যাইয়াই সব থামিয়া যায়, জীবনপ্রদীপও সেইখানে যাইয়া হয়ত নিবিয়া যাইবে।

আমি পূর্ব্ব-বাঙলার বাঙ্গাল। একবার কলেজে এক বন্ধুকে বলিতে হইয়াছিল—'একটা বাজিয়া পাঁচপঞ্চাশ মিনিট হইয়াছে।' সেই বন্ধু 'পাঁচপঞ্চাশ' শুনিয়া হাসিয়া আকুল। তারপর যখন একচল্লিশ, চৌচল্লিশ ও পাঁচচল্লিশের ধাক্কা দিলাম তখন বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন যে, আমাদের 'বাঙ্গাল রাজ্যে' অঙ্কের পংডিত (?) নাই। আমি যে অঙ্কে তাঁহার চেয়ে বেশী নম্বর পাইতাম—সেটা তিনি মনে করিতেন chance (ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়)। শেষে একদিন শুনা গেল—অঙ্কশাস্ত্রের নামজাদা প্রফেসরটিও আর এক বাঙ্গাল। উচ্চারণে কিছুই আটকায় নাই।

টীকার টিপ্পনী বা উপটীকা :—একজন নূতন যাত্রা দলের অভিনেতা ব্রাকেটের মধ্যে পদাঘাত পর্য্যন্ত মুখস্থ করিয়া অভিনয় করিয়াছিল। অনুরোধ, আমার টীকা যেন গোলকচন্দ্রের আত্মকাহিনীতে জড়াইয়া না যায়। অধিক কী, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গোলকচন্দ্র বাঙ্গাল নহে—ঘটীর দেশের লোক,—আমার পরম শত্রু। শত্রুতার প্রমাণ সে-বৎসর মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলার দিন হইয়া গিয়াছে।

—গ্রন্থকার।



গোলকচন্দ্রের রাজনীতিতে গোল।

কণ্টকাকীর্ণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমার পক্ষে হল-চালনা করা অসম্ভব হইল। দুস্তর গণিত-সাগরেও নৌকা ভাসাইয়া 'ছা'লে পানি' পাইলাম না। অগত্যা, নাম কিনিবার অন্য উপায় উদ্ভাবন করিবার চিন্তায় দিন কাটাইতে লাগিলাম। এই প্রকার শুভ-সময়ে একদিন আমাদের স্কুলে গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে ডিবেট (Debate) হইয়াছিল। ডিবেটের বিষয় ছিল—"গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন না হইলে ভারতীয় শাসনতন্ত্র হয়ত অন্যরূপে প্রবর্ত্তিত হইত।" আমি উক্ত আলোচনায় যোগদান করিতে কসুর করি নাই। আমার আলোচনার সারমর্ম্ম এইরূপ ছিল যে, গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের লাভ-লোকসান কিছুই হয় নাই। বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা অবিকল বর্ণনা করিতেছি :—

ভারতের ভাগ্য-নিরূপণের জন্য বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক বসিয়াছিল। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মুসাবিদা করিবার জন্য ঝালে, ঝোলে, অম্বলে আপ্যায়ন ও আলোচনা যাহা হইয়াছিল তাহা সবই আমরা জানি। গোলটেবিল বৈঠকের সমস্ত উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, ঐ অধিবেশনের ফলে যে ভারতের কোন উপকার হইবে না, ইহা তো পূর্ব্ব হইতে সাব্যস্ত হইয়াই ছিল। তাহা না হইলে, পূর্ব্ব হইতেই উহার নাম গোলটেবিল দেওয়া হইয়াছিল কেন? হিন্দু-মুসলমান লড়াইতে এবং জিন্নাহ্-মালব্য

বুঝা-পড়ায় শাসন-সংস্কারের খস্‌ড়া হইতে সব মুছিয়া একাকার হইয়া যাইবে বলিয়া পরবর্ত্তীকালে আবার শাসন-সংস্কারের খস্‌ড়ার নাম্‌ দেওয়া হইয়াছিল—শ্বেতপত্র (white paper)। নামের সহিত যখন প্রত্যেক কাজের এমন সাদৃশ্য থাকে তখন গোল-টেবিলে যে কেবল গোল-ই হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যত 'গোল' আছে তাহার কোনটার মধ্যেই কোন উদ্দেশ্য নাই। তবে বিলাতে যে গোলটেবিলে বৈঠক হইল তাহাতেই বা কেন একটা উদ্দেশ্য থাকিবে? গণ্ডগোল, হট্টগোল প্রভৃতি শব্দ যে জেনাসের (genus) ঐ গোলটেবিল শব্দে গোল থাকাতে সেই একই জেনাসের ভিতর পড়িয়া বেমালুম গোল হইয়া গিয়াছে।

হাটে গোল হয় বলিয়া 'হট্টগোল' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে—গণ্ডে অর্থাৎ কথায় গোল হয় বলিয়া 'গণ্ডগোল'এর সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব, গোলটেবিলে গোল ছাড়া আর একটা কিছু হইলে বেমানান হইত। ভারতের হোম্‌রা-চোম্‌রাদিগের উপরে যখন বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকের অধিনায়কেরা হিন্দু-মুসলমান, শিখ্‌-মারাঠা প্রভৃতি জাতির কলহ বা গোলযোগ মীমাংসা করিবার ভার ন্যস্ত করিলেন তখন তাঁহারাও কেবল 'গোল'ই করিলেন। এ দুনিয়া হইতেছে 'গোল'এর। 'বৃষ্টির জল পড়িতেছে' আর 'সুধীর পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে' এই দুই 'পড়িতেছে'এর অ'কার এ'কারে পর্য্যন্ত কোন পার্থক্য নাই; সেইজন্য মানুষের উচ্চারণ করিতে এক

'গোলে' পড়িতে হয়। মনে পড়ে, ঠাকুরদা এক গল্প বলিয়াছিলেন।—এক গ্রাম্য ভদ্রলোক একটি সহুরে মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। একদিন শ্বশুর বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীকে না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় গিয়াছে?' শাশুড়ী ছোট কথায় উত্তর দিলেন "একটি বন্ধুর সহিত সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে গেছে"। ভদ্রলোকটী চক্ষু চড়কগাছে তুলিয়া রাগে অভিমানে গন গন করিতে করিতে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। গ্রামের 'বেরিয়ে যাওয়া' আর সহরের 'বেরিয়ে যাওয়া'য় যে আসমান-জমিন তফাৎ তাহা না বুঝিতে পারিয়াই ভদ্রলোকটী পড়িয়াছিলেন এই দারুণ 'গোলে'।

ক্ষুদ্রবুদ্ধির মানুষেরা হয়ত আমার ভুল ধরিয়া বসিবে। হয়ত বলিবে যে, ঐ 'গণ্ডগোল, হট্টগোল'এর যে গোল তাহার অর্থ গোলমাল, আর ঐ গোলটেবিলের 'গোল'এর অর্থ গোলাকার। হয়ত বলিবে যে, 'গোল' কোন শব্দের আগে বসিলে গোলাকার বুঝায়, আর 'গোল' কোন শব্দের পরে ব্যবহৃত হইলে গোলমাল বুঝায়। সত্যি সত্যি 'গোল' কোন শব্দের আগে বা পরে বসিলে ঐ শব্দের কোন লাভ-লোকসান নাই। গোলমাল, গোলযোগ প্রভৃতি শব্দের আগের 'গোল' এবং হট্টগোল, গণ্ডগোল প্রভৃতি শব্দের পরের 'গোল' একই 'গোল'। ফলতঃ, ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু কেমন যে তাহার আকার করিলেন আমরা তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। সেইজন্য, মনে রহিল আমাদের বিভ্রাট। তাই, পৃথিবীর আকারেই রহিয়া

গেল একটা মস্ত 'গোল'। সেই হইতে হইল 'গোল'এর সৃষ্টি। ফুটবল খেলায় বিপক্ষদল নেটের ভিতর দিয়া বলটাকে ঢুকাইয়া দিলে কী যে একটা হয় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—তাই, তাহারও নাম হইয়াছে গোল। বিলাতের এই বৈঠকে কী যে ঠিক হইল তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সেইজন্য, গোলটেবিল বৈঠকের নাম সার্থক হইয়াছে। অতএব, ভারতীয় শাসনতন্ত্র যাহা গঠিত হইয়াছে তাহার উপরে গোলটেবিল বৈঠকের কোন ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, অর্থাৎ "গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন না হইলে ভারতীয় শাসনতন্ত্র হয়ত অন্যরূপে প্রবর্ত্তিত হইত"—ইহা সত্য নহে।

বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র ছাত্রবন্ধুরা যেন আমাকে মাথায় করিয়া নাচিতে শুরু করিয়া দিল। চারিদিকে নাম ছড়াইয়া পড়িল। গোলটেবিল সম্বন্ধে এমন প্রাঞ্জল আলোচনা নাকি আর কেহ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য, আমাকে সকলে অদ্বিতীয় বাগ্মী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ঠাওরাইয়া বসিল।

কবি, সাহিত্যিক ও রজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের একটা করিয়া আল্‌হেদা নাম জুটিয়া যায়। মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী—'মহাত্মায়' পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, ৺চিত্তরঞ্জন দাস—'দেশবন্ধু', ৺যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—'দেশপ্রিয়', সুভাষ চন্দ্র বসু— 'রাষ্ট্রপতি' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, কাহারও কাহারও দ্বারা আর একজন বড় স্বরাজী 'রাষ্ট্রভাণ্ডর' বলিয়া অভিহিত

হইয়া থাকেন। বিদেশের নজিরও রহিয়াছে। মেষ-শাবকের মত নিরীহ প্রকৃতির লেখক বলিয়া একজন হইলেন ল্যাম্ব (Lamb), স্ফুর্ত্তিবাজ বলিয়া একজন কবি হইলেন গে (gay), সমাধি-সঙ্গীত (Elegy—written in a country church-yard) ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করিয়া একজন্ কবি অকালে চুল পাকাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি হইলেন গ্রে (gray), মূল্যবান কবিতা লিখিয়া একজন হইলেন ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ (Words-worth), প্রেমের আগুনে পুড়িয়া একজন হইলেন বার্ন্‌স্ (Burns), একলম্ফে লিলিপুট-রাজ্য (Lilliput) হইতে ব্রবডিংনাগে (Brobdingnag) পৌঁছিয়া একজন লেখক হইলেন সুইফ্‌ট্ (Swift), জোর-গলায় সরকারি কাজের তীব্র সমালোচনা করিয়া আর একজন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত হইলেন (Burke)। অতএব, 'গোল' এর থিওরী (Theory) আওড়াইবার পরে যে আমার নাম গোলকচন্দ্রে পরিবর্ত্তিত হইল তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আমিও আর আপত্তি করিলাম না। কেননা, 'হরিকিষণ' নামের প্রতি যে একটা বিতৃষ্ণা ছিল তাহা পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখিয়াছি। বাপের-দেওয়া নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার দুর্নাম নিজের ঘাড়ে পড়িল না বলিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম। এখন বুঝিতেছি যে, নামটি আমার চমৎকার হইয়াছে। জীবন ভরিয়া যাহার সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বকালে কেবল গোল হইল—তাহার নাম আর কিছু হইলে 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' গোছের হইত। তবে একটা

কথা জানাইয়া রাখা ভাল বিবেচনা করিতেছি। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নাম শুনিলেই মনে হয় যে, সে যে-ই হউক না কেন—আফিং খাইয়া বিভোর হইয়া ঝিমাইতেছে; কেননা, ৺বঙ্কিম বাবু ঐ নামটীর সহিত আফিম্ বাঁটিয়া একেবারে পিল (Pill) করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আবার রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুরের নামের হেতু দর্শাইতে ৺বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন—"যশোদা-দেবীর যৌবনকালে কোন কালো কালো কোঁকড়া-চুল নধর শরীর মুচিরাম দাস-নামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটী যশোদার কানে মিষ্ট লাগিত"—সেইজন্য, ব্রাহ্মণ কুল-বধু যশোদা তাঁহার ছেলের নাম রাখিলেন—মুচিরাম; আর বলিলেন—"এমন গুণের ছেলে বাঁচিলে হয়।" মুচিরাম রাজা এবং রায় বাহাদুর উপাধি পাইলে কী হয়। নামটী শুনিলেই অশ্লীল কথা মনে পড়ে। আমার নামের প্রতি ঐ-প্রকার কোনও অশ্রদ্ধার ভাব যাহাতে কাহারও মনে না জাগে সেইজন্য, একটু সাফাই দিতেছি।—মুসলমান-সমাজে অনেক ভূয়া সৈয়দ আছে, টাকার জোরে, চান্সের মুখে পড়িয়া ইহারা সৈয়দ হয়। বংশের ধারা বদ্‌লাইতে পারে না, অথচ মিছা-অভিমানে ফাটিয়া পড়ে। কুকীর্ত্তি, জুয়াচুরি করিতে তাহাদের একটুও ভয় হয় না। অতএব, বেশীদিন সাম্‌লাইয়া থাকা তাহাদের পক্ষে সম্ভবও হয় না। একদিন-না-একদিন তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ফরাসী কবি—জোলার (Zola) লেখা নাকি এইজন্য অশ্লীলতায়

ভরিয়া আছে। সে নাকি তাহার জাতের ধারা বদলাইতে পারে নাই। আমার নাম যে বংশের ধারা অনুযায়ী অথবা ঐপ্রকার চান্সের মুখে পড়িয়া পরিবর্ত্তিত হয় নাই তাহাতো বুঝা গিয়াছে। নামের তালিকায় 'বোক-চন্দ্র' যে-শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে ঐ শ্রেণীতে আমি স্থান গ্রহণ করি নাই। এই 'গোলক ধাঁধার দুনিয়ায়' এবং 'মায়ায় বাঁধা এ সংসারে' আমি একচন্দ্র। টেঁকচাঁদ ঠাকুর চন্দ্র পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই, চাঁদেই রহিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য, আমি এই ভূগোলকের একমাত্র চন্দ্র। তাই কবি গাহিতেছেন,—

"একচন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে।
লক্ষ লক্ষ তারা দেখ কী করিতে পারে ?"

যাহা হউক, নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে করিতে অনেকদূর সরিয়া গিয়াছি। আবার রাজনীতির কথা তুলিতেছি।—

বন্ধুরা উৎসাহ দিল। গোলকচন্দ্র নাম দেশময় মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আমিও উদ্দীপিত হইয়া উঠিলাম। কেননা,—

"পড়িল ধন্য দেশের জন্য গোলক খাটিয়া খুন
খাটে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ"*

এই-প্রকার কবিতা হয়ত আমার নামেও রচিত হইতে পারে। অতএব, 'সাবধানের মার নাই'—এই নীতি গ্রহণ করিলাম। কোথায় কোন্ সুযোগে কী বলিব তাহার সন্ধান করিতে

* দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলাল' হইতে চুরি করিয়াছে।—গ্রন্থকার।

লাগিলাম। সেই শুভ-সময়ে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ শুরু হইল। এখানে দাঙ্গা ওখানে হাঙ্গামা, সমস্ত বাঙ্লাদেশ সরগরম হইয়া উঠিল। বহু লোক রাজনীতিক্ষেত্রে অকালেই নাম জাঁকাইয়া বসিল। একদিন মনে মনে স্থির করিলাম,—তাইতো, অতি সহজেইতো দেশজোড়া নাম কিনিয়া লওয়া যায়! সুযোগ বুঝিয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। এক সভায় কিছু বলিব বলিয়া সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মুখে যেন তুবড়ি-বাজির খৈ ফুটিল। বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম—হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, শিখ-মারাঠা প্রভৃতির গোলযোগ মিটাইবার জন্য এ-দেশের মোড়লপ্রবরেরা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে নানা ছন্দে, নানা উপায়ে, ঝালে, ঝোলে, অম্বলে সমাজের বুকে বসিয়া তাঁহাদের মতবাদ হোমিওপ্যাথিক-ডোজে বাঁটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু, ব্যারাম ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাধের হিন্দু-মুসলমান-প্যাক্ট উড়িয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যে হরিজন আন্দোলন শুরু করিলেন তাহা পণ্ড করিবার জন্য, বোমারু সনাতনীরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ভগবানের খোলা-আকাশের নীচে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মেথর, মুচি একসঙ্গে বসিয়া যাইবে খাইতে, আর যে নাপিতের হাতে ব্রাহ্মণ জলগ্রহণ করিলে জাত যায় না—সেই নাপিত করিবে পরিবেশন, মেথর যদি পরিবেশন করিতে গেল তাহা হইলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মণ বমি করিতে শুরু করিবেন—আর কায়স্থ সব

জোট বাঁধিয়া সরিয়া পড়িবেন—মহাত্মা গান্ধীর হরিজনের এমনতর ফাঁকিতে মেথর ভুলিল না। তাই, হরিজনের মারফতে মিলন-প্রচেষ্টা বিলকুল ব্যর্থ হইয়া গেল।

আমরা কিন্তু এলোপ্যাথিকডোজে মিলনের চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু সমাজ সে তিক্ত ঔষধ গিলিতে পারিবে তো? হিন্দু-মুসলমান-প্যাক্ট, শূদ্র-ব্রাহ্মণের বন্ধুত্ব, মুসলমান-কায়স্থের মিতালী—সব লয়-প্রাপ্ত হয় ছোট একটু স্বার্থের ধাক্কায়। কিন্তু, যদি কুটুম্বিতা পাতাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মিলনের বাঁধন আঁটিয়া যাইবে। কুটুম্বিতা পাতাইয়া একের স্বার্থের সহিত অন্যের স্বার্থ জড়িত করিয়া দিতে হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরে, বিভিন্ন জাতির ভিতরে যদি কন্যা আদান প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা হইলে, হয়ত বাঙ্গালী জাতীয়তা বা ভারতীয় জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারিত। হয়ত বিলাতে বসিয়া আমাদের মুরুব্বিদের মতবাদ লইয়া অত ঠেলাঠেলি করিতে হইত না। কিন্তু এখানেও মুশ্‌কিল কম নহে। মুসলমানেরা বলিবেন,—"আমাদের ধর্ম্ম যথেষ্ট উদার বটে, কেতাবী যাহারা তাহাদিগের সহিত খাওয়া-দাওয়া, মিল্‌মেসেল ও শরাশরিয়ত মত কন্যা লেনা-দেনা চলে। কিন্তু, হিন্দুর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে ধর্ম্মের বর-খেলাফি কাজ করা হইবে।" হিন্দুরা বলিবেন—"প্রাণের দায়ে পড়িয়া আমাদের কন্যাগণকে জলে ভাসাইয়া দিব, তবুও মুসলমানের হাতে দিব না। কারণ,—তাহা হইলে

মুসলমান উন্নতিতে বাড়িয়া যাইবে।” ব্রাহ্মণেরা বলিবেন,—“যাহারা শূদ্রের হাতে কন্যাদান করিবে তাহারা রৌরবেও স্থান পাইবে না। তাহাদের জন্য পৃথক নরক তৈয়ার করিতে হইবে। অযথা ভগবানের খাটুনি বাড়িবে।” মওলবী সাহেব বলিবেন,—“সে কালের আকবর বাদশাহ,—সেলিম বা জাহাঙ্গীর বাদশাহ এবং সিরাজুদ্দৌলা আজিও কবরের ভিতরে আজরাইলের মুগুরের গুতার চোটে চেঁচাইতেছেন।” ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিবেন,—“মানসিংহ ও মোহনলালের কোটী বংশ এখনও নরকে জ্বলিতেছে আরও জ্বলিবে।” ঠাকুর মহাশয় ও মওলবী সাহেব উভয়ে সমস্বরে বলিবেন,—“এ যুগেও যে দুই একটি অঘটন ঘটিতে দেখিতেছ—উহাদের উভয়েরই শাস্তি হইবে খৃষ্টান মতে ক্রুসিফিক্সন্ (ক্রসবিদ্ধ)। অতএব, সব হুঁশিয়ার ও সামাল হইয়া কাজ করিও।” মোটকথা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে মিলনের চেষ্টা সব দিক দিয়াই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বস্তুতঃ, 'মিলন' শব্দটীর ভাবার্থ ধ্বংস। ঘাবড়াইলে চলিবে না, কথাটি খুলিয়া বলিতেছি।—পৃথিবীতে কোন কিছুর বিনাশ নাই,—আছে কেবল পরিবর্ত্তন,—বিজ্ঞানের এ তত্ত্বকথা মানিতেই হইবে। হিন্দুরা পরজন্মে বিশ্বাস করেন। অন্যান্য ধর্ম্মনীতির শিক্ষা,—এ কালের পরেও কাল আছে,—সেকালে সুখেই হউক, আর দুঃখেই হউক, আত্মাকে অনন্তকাল বসবাস করিতে হইবে। অতএব, কোন কিছুই সমূলে বিনষ্ট হইতেছে না,—কেবল পরিবর্ত্তিত হইতেছে. এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র

ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। প্রকৃতি একটা ধারাবাহিক পদ্ধতিতে এই সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। সম্মিলিত বা একীভূত জিনিষগুলিকে ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন ও ব্যাপ্ত করাই প্রকৃতির ধর্ম্ম। ব্যাপ্ত বা বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে কোন কিছুকে একীভূত বা সম্মিলিত করিবার চেষ্টাকে প্রকৃতি সর্ব্বসময়ে বাধা প্রদান করিয়া আসিতেছে। এই প্রকার কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া না চলিলে পৃথিবীতে কোন কিছুরই ব্যাপ্তি, বৃদ্ধি বা নূতনভাবে সৃষ্টির কার্য্য সম্ভবপর হইত না। সংস্কার, আবিষ্কার ও আবির্ভাবের মূলেও প্রকৃতির এই কর্ম্মপদ্ধতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে হয়ত জলের ভিতর হাইড্রোজেন (Hydrogen) ও অক্‌সিজেনের (Oxygen) অস্তিত্ব ছিল,—কিন্তু, মানুষ উহাদিগকে তখন চিনিত না। বহু পরে মানুষের প্রয়োজনমত উহারা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মানুষের নানা প্রকার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। মৃত্তিকা-ভাণ্ডারস্থ কয়লার খনি হইতে মানুষ প্রয়োজনমত কয়লা, কেরোসিন এবং আল্‌কাত্‌রা পৃথক করিয়া লইল। জল ও কয়লার খনি—এই দুইটীর স্থানে মানুষ আরও পাঁচটীর সৃষ্টি করিয়া লইল। একুনে এখন সাতটী মানুষের নিকট পরিচিত। ক্রস্‌ব্রিডিং পদ্ধতি (Cross breeding) অবলম্বন করিয়া প্রাণী ও জড়জগতে নূতন প্রকার প্রাণী এবং জড়পদার্থের সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে। প্রাণীতত্ত্ব ও কৃষিতত্ত্ব আলোচনা

করিলেই তাহা জানা যায়। বিভক্ত, ব্যাপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করিবার কাজে প্রকৃতি মানুষকে সাহায্য করে। কিন্তু, পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্যাপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে চেতন বা অচেতন কোন্ কিছুকে একীভূত করিবার চেষ্টা সর্ব্বসময়ে সর্ব্বস্থানে ব্যর্থ হইয়াছে। পরন্তু, স্থান ও কাল-পাত্র বিশেষে এই প্রকার চেষ্টার ভিতর দিয়াই নূতন কিছুর সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে। বৃক্ষ হইতে আসবাবাদি, মৃত্তিকা হইতে ইট্-সুরকি ও ইমারত প্রস্তুত হইল। এই বিচ্ছিন্নতার কাজে প্রকৃতি বাধা দিল না,—কিন্তু ঐগুলিকে পুনর্ব্বার বৃক্ষে বা মৃত্তিকায় পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন জিনিষগুলির নাম ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলা মানুষের সাধ্যাতীত। জড় ও প্রাণীজগতে এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

প্রকৃতির এই কর্ম্মপদ্ধতির প্রভাব ভাবরাজ্যে, ধর্ম্মমতে, ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে খুব প্রবল। তাহা না হইলে, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বিশ্বে এক চমৎকার প্রেমরাজ্যের সৃষ্টি করিতে পারিত,—যেখানে কলহ বিসম্বাদের স্থান হইত না,—যেখানে সৌহৃদ্য, বাৎসল্য, প্রেম এবং প্রণয় সর্ব্বসময়ে বিরাজ করিত। কিন্তু যাহা হইবার নহে তাহা হইবে না। খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম্মমত বিশ্ব-সৃষ্টির বহুপরে প্রচারিত হইয়াছে। ফ্যাসি-ইজ্‌ম্, কম্যুনালিজম, ডায়ার্কি ও পপুলার-গভর্ণমেণ্ট মানুষের উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত। মানুষ স্বভাবতঃই সর্ব্ববিষয়ে মিলন-প্রত্যাশী,—কোন্দল, বিদ্বেষ প্রভৃতি এড়াইয়া

চলিতে চায়। সারা পৃথিবীতে ছোট ও বড় এমন একটি লোকও নাই—যিনি এই বিভিন্নমুখী মত ও পথকে একদিকে চালিত করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং চেষ্টা না করিয়াছেন। তাহা হইলে, সমাজের তথা পৃথিবীর মানুষের সর্ব্ববিষয়ে এই বিভিন্নমুখী গতি কেন?

হিন্দু ও মুসলমানদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মমতে কতকটা পরিমাণ প্রভেদ রহিয়াছে। ভারতের এই দুই বিরাট সম্প্রদায়কে মিলিত করিবার বাসনা লইয়াই হয়ত রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু, প্রকৃতি এই প্রকার মিলনের চেষ্টার ভিতর দিয়া নূতন একটি ধর্ম্মমত সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইয়া বসিল। একুনে দুইটি ধর্ম্মমতের স্থানে এখন তিনটি হইল।

রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে যে আমরা বিভিন্নমুখী চিন্তার স্রোত দেখিতে পাই—তাহার মূলেও প্রকৃতির এই কর্ম্মপদ্ধতি।

মনার্কির (Monarchy) প্রভাব জনসাধারণ সহ্য করিতে পারিল না, ডায়ার্কিতেও (Diarchy) তাহারা সন্তুষ্ট হইল না, ডেমক্রাসি বা পপুলার গভর্ণমেণ্ট (Democracy, Popular Govt.) না হইলে যেন দেশে শান্তি আসিবে না। ইহার পরেও,—উচ্চ ও নীচু সকলের পার্থক্য ঘুচাইবার জন্য মানুষ সোস্যালিজমের (Socialism) আশ্রয় লইল। এইভাবেই সৃষ্টির কাজ বাড়িয়া চলিয়াছে—উহাই স্বাভাবিক। দুইটী জিনিষ ধ্বংস করিয়া একটি

করিতে পারিলে মিলনের কাজ সহজ হইত। কিন্তু, তাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মিলিত, একীভূত করা মানেই ধ্বংস করা। অতএব, উহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। সেইজন্য, যখনই দেখিব সমাজে আগুন জ্বলিয়াছে ও ঝড় বহিয়াছে, যখনই শুনিব—রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে দুই মহাপুরুষের মতবাদ লইয়া বিসম্বাদের সূত্রপাত হইয়াছে, তখনই বুঝিব—নূতন কোন কিছুর সৃষ্টি হইবার সুযোগ জুটিয়াছে, উন্নতির সোপান নির্ম্মিত হইতেছে। এমতাবস্থায় হতশ্বাস না হইয়া আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিব। মিলন ও শান্তি চাই না,—উহারা আলস্য ও নির্জীবতা টানিয়া আনে,—উহারা মরণের অগ্রদূত। শান্তির ক্রোড়ে আসিয়া মানুষ কর্ম্মতৎপরতা হারাইয়া ফেলে।* 'মিলন' ধ্বংসেরই নামান্তর। প্রকৃতির সহিত তাল রাখিয়া বলিব,—চাই বিচ্ছিন্নতা, (Diversity), চাই দুর্য্যোগ, চাই বিসম্বাদ, চাই বিচ্ছেদ, চাই ব্যাপ্তি। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে ঘনঘটা দুর্য্যোগের মধ্যে যে নির্ভীক পথিক পথ চিনিয়া লইতে পারে,—সে-ই প্রকৃত সাহসী, সে-ই কার্য্যক্ষম বীরপুরুষ।†

* "Idleness eats the heart out of men as of nations and consumes them as rust does iron"—Smiles' Character.

† "The greatest geniuses have, without exception, been the greatest workers, even to the extent of drudgery" "The Caliph Abdul Rahman, in surveying his successful reign of fifty years found that he had enjoyed only fourteen-days of pure and genuine hapiness" Smiles' Character.

এইটুকু বলা শেষ হইতে না হইতে চারিদিক হইতে 'শাট আপ, ইউ ফুল' (Shut up, you fool), 'সিট ডাউন, সিট ডাউন' (Sit down, Sit down) প্রভৃতি চীৎকার উঠিতে লাগিল। বুঝিলাম,—এদেশের কপাল পুড়িয়াছে। তাহা না হইলে, বাঙ্গালীর সভায় ইংরাজী শব্দের এত কেন ছড়াছড়ি! আমার মেজাজ যে তখন সপ্তমে চড়িয়াছিল তাহাতো বক্তৃতার শেষ কয়েকটি লাইন হইতে বুঝিতে পারা যায়। আর কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা, বসিয়া পড়িয়া রাগে অভিমানে হাঁপাইতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিলাম,—এই বচন-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীদের বক্তৃতামঞ্চে যদি প্রবঞ্চনাময় 'কাল্যাল্লাহের' (সন্ধি—কালী + আল্লাহ) বাণী আওড়াইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কদর হইত, বাহ্‌বা পড়িত।* মিথ্যা, প্রবঞ্চনা—এগুলি যখন আমার ধাতে সহ্য হয় না তখন রাজনীতি-ক্ষেত্রেও আমার স্থান নাই। একটী-মাত্র সুখের বিষয় এই যে, এই ক্ষেত্রে নাগিয়া আমার নামটী আপনা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং মাথায় গান্ধী-টুপি উঠিল।

* অসহযোগ আন্দোলনের হুজুগে 'বন্দেমাতরম' ও 'আল্লাহো আকবর' একই মুখে ধ্বনিত হইত।—গ্রন্থকার।

গোলকচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষায় গোল।

কী কী কারণে সাতবারেও প্রবেশিকার দ্বার অতিক্রম করিতে পারিলাম না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আস্তে পড়া (Silent reading) ভাল—এই কথা যে-সব পণ্ডিত বলেন তাঁহাদের দোহাই দিয়া বাবাকে কিছুদিন ফাঁকি দিতে পারিলেও শেষ-পর্য্যন্ত আর কুলাইয়া উঠিতে পারিলাম না। একদিন চুপে চুপে উপন্যাস পড়িবার সময়ে বাবা ধরিয়া ফেলিলেন। "এইসব হইতেছে বুঝি ?"—বলিয়া তিনি কান ধরিলেন। টের পাইলাম যেন মাটি হইতে আমার পা দুইখানি হাত-খানেক শূন্যে উঠিয়াছে। তারপর, তিনি অনেক কাগজপত্র ওলট-পালট করিয়া আর্ল অফ্ চেষ্টার-ফিল্ডের (Earl of Chesterfield) লিখিত একখানা চিঠির অংশ-বিশেষ বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। উহা তাঁহার পুত্রের নিকট লিখিত চিঠির অংশবিশেষ।

London, June 21, O. S. 1748

Dear Boy,

"............you will desire Mr. Harte, that you may read aloud to him every-day and that

he will interrupt and correct you.............to articulate very distinctly. You will even read aloud to yourself and tune your utterance to your own ear"

—Earl of Chesterfield—

বাবা বলিলেন,—"জানিস্ তো, যাহারা মায়ের পেটের থেকে বধির হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারা বোবাও হয়। তাহাদের ঠোঁট, জিহ্বা, ও আলজিহ্বা ইত্যাদি সবই থাকে। কিন্তু, কী বলিতেছে—এবং যাহা বলিতেছে তাহা অন্য মানুষের উচ্চারিত শব্দের মত হইতেছে কি না তাহা যাচাই করিয়া বুঝিতে পারে না; নিজেদের অর্থহীন শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া লইতেও পারে না। জিহ্বা, ঠোঁট ইত্যাদি নাড়াইতে চাড়াইতে পারিলেও উহারা বোবা হইয়া থাকে। জোরে পাঠ (Loud reading) না করিলে শব্দের উচ্চারণ (Pronunciation) এবং কথা বলিবার ভঙ্গী (Style of speech) ঠিক হইতেছে কি না তাহা ধরা পড়ে না। জোরে না পড়িলে জিহ্বার আড়ষ্ট-ভাবও কাটে না।"

এই সব উপদেশ দিয়া তিনি বিদায় লইলেন। সাময়িক-ভাবে বাঁচা গেল। কিন্তু জোরে পাঠ করিবার অভ্যাস আমাকে করিতেই হইল।

করিলে কী হইবে? এভাবে না—ওভাবে, ওভাবে না—

সেভাবে—এমনি করিয়া কত প্রকারেই তো চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পাইলাম না। ধীরে ধীরে বিদ্যা-শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রতি আমার একটা অশ্রদ্ধার ভাব আসিল। কেন তাহা বলিতেছি। দশবারো বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে ঘোরা-ফেরা করিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহা কম নহে। বিদ্যাশিক্ষার নামে সারা পৃথিবীর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে প্রবঞ্চনার অভিনয় করিতেছে তাহার কয়েকটী নমুনা দিতেছি।—

(১) বায়লজিকে (Biology) অস্বীকার করা চলে না। হেরিডিটি (Heredity) মানুষের পুঁজি বা মূলধন। উহা লইয়া তাহাকে জীবনের ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিতে হইবে। আবার ইহাও বিজ্ঞান-সম্মত সত্য যে, হেরিডিটি সকলের সমান নহে। যদি ইহাই সত্য হয় তাহা হইলে, দুই পরিবারের দশবৎসর বয়স্ক দুইটী সন্তানকে বৎসরের একদিন একই শ্রেণীতে, একই বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া শিক্ষা-জগত যে অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইল, জগতে তাহার তুলনা নাই। দশ হাজার টাকা মূলধন লইয়া পথের কাঙ্গালের সহিত একই ব্যবসায়ে নামিতে হইল! এখানে হেরিডিটির মর্য্যাদা রক্ষিত হইল কৈ? সাইকোলজি (Psychology) ও ফিজিওলজির (Physiology) পিরামিড্ সেলের (Pyramid cell) কদর রহিল কোথায়?

(২) তারপর হরেক সুখ-দুঃখের সুদীর্ঘ পাঁচটী বৎসর

কাটিয়া গেল। সেই দুই বন্ধু একই শ্রেণীতে একই ঘানি টানিতেছে। পুরস্কারের নামে একজনকে হয়ত শিক্ষকেরা শ্রেণীর প্রথম স্থানের অধিকারী করিয়াছেন, আর একজন না হয় তিরস্কারের নামে পাইয়াছে শ্রেণীর সর্ব্ব-নিম্ন স্থান। কিন্তু উভয় বন্ধুর পিতামাতা, এমন কি, সমাজ ও জাতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এই দারুণ অন্যায়-নীতি ও অনাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতেছে। একটী তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পিছনে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে একটী বিশাল-বপু গর্দ্দভচন্দ্রকে। গর্দ্দভ-চন্দ্র পারিয়া উঠিতেছে না বলিয়া মেধাবী ছাত্রটীকে পিছনে টানিয়া রাখা হইতেছে। গর্দ্দভচন্দ্রকে হ্যাচ্‌কা-টানে টানিতে টানিতে তাহার প্রাণান্ত করা হইতেছে—নিশ্বাস লইবার অবসরও সে পাইতেছে না। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটীকেও কাল্‌চারের (Culture) সুবিধা প্রদান করা হইল না। পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিচার করিবার পরেও কর্ত্তারা তাহাকে সে অধিকার দিতে পারিলেন না। দেখা গিয়াছে যে, এক শ্রেণীর দুইটী ছাত্রের মেধা-শক্তিতে আস্‌মান-জমিন প্রভেদ রহিয়াছে। কিন্তু, তাহারা উভয়ে একই ঘানি টানিতেছে। নিষ্ঠুর অবিচার ছাড়া ইহাকে আর কী বলে?

(৩) যাহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাওতো দুইজনে দুইপ্রকারে গ্রহণ করিতেছে। জ্বরাক্রান্ত রোগীর পক্ষে ভাত বিষ, ভাল লোকের পক্ষে উহা খাদ্য। উপন্যাস পড়িয়া একজন গোল্লায় যায়, আর একজন চরিত্রহীনের ভয়াবহ

পরিণতি দেখিয়া নিজে সাবধান হইয়া চরিত্রদোষ শোধরাইয়া লয়। 'একলব্যের গুরুদক্ষিণা' পড়িয়া একজন হয়ত একলব্যের গুরুভক্তি দেখিয়া, তাহার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের কথা চিন্তা করিয়া মুগ্ধ হইবে, দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুনের প্রতি বিতৃষ্ণায় তাহার মনটা ভরিয়া উঠিবে। আর একজন হয়ত উহা হইতে শিখিয়া লইবে কী উপায়ে, কোন্ ছলে দ্রোণাচার্য্য স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে দ্রোণাচার্য্যের ঐ স্বার্থপরতার উদাহরণ খাড়া করিয়া নিজের অপকর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া লইবে। ভারতবর্ষে তো বহু পর্য্যটক আসিয়াছেন। কিন্তু, একজনের ভ্রমণবৃত্তান্ত কি অন্য আর একজনের ভ্রমণবৃত্তান্তের সহিত মিলিয়াছে? মিস্ মেয়োর (Miss Mayo) নিকট ভারতবর্ষ কি একপ্রকার নূতনভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে নাই? পূর্ব্বপুরুষাগত মনঃপ্রবৃত্তির তাড়নায় একটা জিনিষকে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ বিভিন্ন রূপে দেখে। সেইজন্য, প্রবাদ আছে—"আপ ভালা তো জগত ভালা", "কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না" ইত্যাদি। মা-বাপ হইতে পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত যে মানসিক প্রবৃত্তি মানুষে পৈতৃক দান হিসাবে পায় তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া সহজ নয়। কোর্ট-প্রাঙ্গনে অযথা ভিড় করিয়াছে, বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া ভেরেণ্ডা ভাজে এমন একজন উকিলের মুখে শুনিয়াছি যে, নিজের স্বার্থের জন্য মিথ্যা কথা বলা চলে এবং অন্যের অপকার করিয়াও যদি নিজের সুখ ও শান্তি হয় তাহা হইলে

অন্যের ক্ষতি করিবার জন্য পাপ হয় না। "জঘন্য পাপাচরণের মধ্যে মিথ্যাই সব চেয়ে ঘৃণিত, মিথ্যা বলা দারুণ নৈতিক কাপুরুষতা।"* "শয়তানেরাও মিথ্যা বলে না, কেননা তাহা হইলে তাহাদের আবাসস্থল নরকও ধ্বংস হইয়া যাইত।"† "সত্যটা অপ্রিয় হইলেও চরিত্রবান মানুষ উহা বলিবেই।"‡ "মিথ্যা বলিতেও পারিব না, মিথ্যা সহ্য করিতেও পারিব না"¶— ইত্যাদি সত্যের মন্ত্র যে এতকাল ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিল তাহা পেনাল-কোডের (Penal Code) দুইখানি পাতা উল্টাইতেই কর্পূরের মত উড়িয়া গেল।

কোথা হইতে সে একদিন শিখিয়া লইয়াছে—"Self-interest is the best interest" (নিজের স্বার্থই বড়, 'আপনি বাঁচিলে বাপের নাম')। আর ঐটা তাহার গোবর-ভরা মগজে (ভাল সার) শিকড় বসাইয়াছে। "স্বার্থপরতা ব্যতীত অন্য সব অপরাধ আমি ক্ষমা করিতে পারি। আপন ও পরের স্বার্থ

* "Of all mean vices lying is the meanest, it is sheer moral cowardice"—Smiles' Character.

† "Do the Devils lie? No, for then even Hell could not subsist"—Sir, T. Browne.

‡ "Men of sterling character have the courage to speak the truth even when it is unpopular"—Smiles' Character.

¶ "I neither will, nor can give my consent to a lie"—Dr. Marshall Halt.

যখন জড়াইয়া যায় তখনই ক্ষুদ্র বিষয়ও মহৎ আকারে দেখা দেয়"*—পার্থসের এই বাণী এবং মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে হেনরী ভেন বলিয়াছিলেন,—"লক্ষবার মরণেও আমার আত্মাকে কলুষিত করিতে পারিবে না, আত্মার নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতাকে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জিনিষ বলিয়া মনে করি" ; † ক্যারোলিন ম্যাটিল্ডা যে সব সময়ে প্রার্থনা করিতেন,— "ভগবান, আমাকে পবিত্র রাখিয়া তুমি অন্যকে বড় কর"‡— এইগুলি সমস্তই সেই উকিল ফৌজদারি কোর্টের দ্বারে পৌঁছিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে।

'বাল্যশিক্ষা'র 'সদা সত্য-কথা কহিবে, মিথ্যা বলা বড় দোষ'; 'নীতি-শিক্ষা'র রামদুলাল সরকার ও জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সত্যনিষ্ঠা ; বাঘ আসিয়াছে, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া যে মেষ-পালক চেঁচাইত তাহার পরিণতি—ইত্যাদি নীতি-পাঠগুলি এতদিনে উকলটী ভাতের সহিত গোলাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। পরের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত স্যার ফিলিপ সিড্নী যে নিজের মুখের জল

* "I can forgive every-thing but selfishness. Even the narrowest circumstances admit of greatness with reference to mine and thine"—Perthes.

† "Ten thousand deaths rather than defile my conscience, the chastity and purity of which I value beyond all this world"—Henry Vane.

‡ "Oh, keep me innocent, make others great" —Caroline Matilda.

অন্যকে প্রদান করিলেন ("Thy necessity is greater than mine"—Sir Philip Sydney), দধীচির অস্থিদান, ধাত্রীপান্নার পুত্রদান, নফরচন্দ্রের আত্মদান—ইত্যাদি যাহা শিখিয়াছিল তাহা ওকালতির মত কাজে নামিয়া প্রথম দিনেই ভুলিয়া গেল। কিন্তু, এই উকিল ও দারোগা বাবুরা যে পেঁনাল কোডের গণ্ডির ভিতর পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি-শিক্ষাগুলি ভাতে দিয়া খাইয়া ফেলেন—জীবনে উহার একটিও কাজে লাগাইতে পারেন না,—শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে এইপ্রকার ব্যবধান কেন ?

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলই দাও
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

"কর্ম্মের জন্য দেহপাত ও ধর্ম্মের জন্য জীবনদান,
সত্যের জন্য দৃঢ়ব্রত, পরের জন্য নিজের প্রাণ।"

এইসব নীতিশিক্ষা উকিলের ওকালতি মগজে প্রলাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহা হইলে প্রমাণিত হইল যে, উৎকট মানসিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানুষের মন হইতে কুভাব তাড়াইয়া সুশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা পূর্ণভাবে কর্ত্তারা করিতে পারেন নাই।

শেকস্‌পিয়রের 'টেম্পেষ্ট' (Tempest) নাটকে দেখি যে, এরিয়েল (Ariel) ও কালিবান (Caliban) এই দুইজনকে প্রস্‌পেরো (Prospero) বন্দিশালা হইতে মুক্ত

করিলেন। উভয়কে একই প্রকার আবহাওয়ার ভিতর দিয়া শিক্ষা-দীক্ষা দিলেন। কিন্তু, এরিয়েল দেবতার সন্তান, তাই তাহার দেবতুল্য চরিত্র গঠিত হইল। আর শয়তানতুল্য দানবের পুত্র কালিবান তাহার জাতের ধারা বদ্‌লাইতে পারিল না। প্রভু প্রসপেরো তাহাকে বন্দিশালা হইতে মুক্ত করিলেন, শিক্ষা-দীক্ষা দিলেন, সভ্যতা শিখাইলেন। ইহার প্রতিদানে হীনজাত, নেমকহারাম কালিবান প্রভুকন্যা মিরাণ্ডার (Miranda) অপমান করিবার চেষ্টা করিল। প্রভু প্রসপেরো ক্রোধান্বিত হইয়া যখন বলিলেন,—"এই জন্যই বুঝি তোমার এত উপকার করিয়াছি, সভ্যতা শিখাইয়াছি ?" কালিবান জাত-ধর্ম্মানুযায়ী চট্‌পট্‌ জবাব দিল,—"তুমি আমাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়াছ তাহাতে আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, আমি তোমার ভাষায় তোমাকে গালি দিতে শিখিয়াছি।"

সার্কাস্‌ পার্টিতে কত বাঘ ও সিংহের খেলাতো দেখিয়াছি। কিন্তু, এত করিয়া পোষ মানাইবার পরেও এই সব হিংস্র জানোয়ার কি কম লোক হত্যা করিয়াছে ? সেদিনও তো আলিপুর চিড়িয়া-খানার একটা জলহস্তী একটু সুবিধা পাইয়াই দুই তিন মিনিটের ভিতর একটী যুবতী মেয়েকে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিল !

স্বাভাবিক প্রতিভাও শিক্ষা-দীক্ষার উপর মোটেই নির্ভর করে না। হাজার হাজার প্রতিভাশালী দেবতুল্য চরিত্রবান

মানুষের জীবনী আমরা পাঠ করিয়াছি। উঁহাদিগের অনেকের ভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ জোটে নাই। এমন কি ইহাও দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষকের পেটের বুদ্ধি ও মগজের বিদ্যা সবটুকু উজাড় করিয়া দিবার পরেও ছাত্রের তৃপ্তি হয় নাই,—সে আরও অনেক বেশী শিখিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য, আমাদের দেশে 'গুরুমারা বিদ্যা' বলিয়া একটা কথা আছে। আমাদের কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লইয়াছিলেন। তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া লইয়া প্রথম কবিতা লিখিতে শুরু করেন। কিন্তু, কবি বিহারীলালের 'হিমালয়' এবং কবীন্দ্রের 'হিমালয়' নামক কবিতাদ্বয় পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, একজন মানুষ আর একজনের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা পাইতে পারে, কিন্তু মনোপ্রবৃত্তি প্রত্যেকেরই স্ব স্ব স্বভাবজাত (inborn)। তাহা হইলে যাঁহারা বলেন যে, হেরিডিটিই সব; শিক্ষা, দীক্ষা, পারিবারিক আবেষ্টন (environments)—ইহারা কিছুই নহে তাঁহাদিগের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। স্বভাবজাত কবি (Born poet), স্বভাবজাত রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত (Born statesman), স্বভাবজাত দার্শনিক (Born philosopher)—এ শব্দগুলি আমাদের কল্পিত আবিষ্কার নহে। 'যেমনা কি তেমনা' (Like begets like) এ প্রবাদকে অস্বীকার করিবার সাহস কাহারও নাই। তাহা হইলে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি

শিক্ষা বিতরণের নামে যতটা গর্ব্ব করিতেছে ততটা করা উহাদের পক্ষে শোভা পায় না।

(৪) Education (E—ducate=to take out) শব্দটার মানে ছাত্রের অন্তর্নিহিত মনোপ্রবৃত্তি ফুটাইয়া তুলা। কিন্তু, এ যাবতকাল যাহা হইয়াছে তাহা Inducation (In—ducate =to pour in)। জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া শিক্ষক জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু, ছাত্রের মস্তিষ্কাধারে উহার কতটুকু স্থান পাইতেছে, কী ভাবে স্থান পাইতেছে, আর কতটুকুই বা গড়াইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে,—বা কতটুকু বিকৃত হইয়া ঢুকিতেছে, তাহা এ-তাবৎকাল কোনও শিক্ষক পরিমাপ করিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না। বিশল্যকরণী যোগাইতে যে আস্ত গন্ধমাদন বহিতেছেন তাহাও শিক্ষক বুঝিলেন না। ইহা হইতে শিক্ষকের অপরিসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় মেলে না। শিক্ষক ও ছাত্রের শক্তির (energy) যে কতখানি অপব্যয় হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে?

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরীক্ষার দশহাজার ছাত্রের কাগজ বিশজন পরীক্ষকের নিকট পাঠান হইয়াছে। একটী পরীক্ষার্থীর একখানা কাগজ বিশজন পরীক্ষকের নিকট হইতে পরীক্ষা করাইয়া ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একজন পরীক্ষক যেখানে কেবলমাত্র পাশের নম্বর দিতে কুণ্ঠিত, সেখানে আটজন হয়ত তিনের কোঠায়, পাঁচজন হয়ত

চারের কোঠায়, তিনজন হয়ত পাঁচের কোঠায় এবং একজন হয়ত আটের কোঠায় নম্বর দিয়া বসিয়াছেন। এ অবস্থায় এই দশ হাজার ছাত্রের ভাগ্যফল কিরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

(৬) এমন কি, ঘরোয়া-বিবাদ করিয়া পরীক্ষক যখন মনের ঝাল ঝাড়িলেন পরীক্ষার কাগজের উপর—তুই একস্থানে তুই একটা রসগোল্লা দিয়াও—হয়ত তখন যে ছাত্র পঁচিশ পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইল না, সুপ্রসন্নচিত্তে কাগজ দেখিয়া সেই পরীক্ষক সেই কাগজে হয়ত পঞ্চাশ নম্বর দিয়া বসিলেন। একই কাগজ বিভিন্ন সময়ে একই পরীক্ষকের নিকট হইতে পরীক্ষা করাইয়া ইহা নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পরীক্ষকের মানসিক অবস্থার উপরে ছাত্রের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করে।

তাহা হইলে, যে ছাত্র শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, কোন্ যুক্তিবলে আমরা তাহাকে নিঃসন্দেহে সেই শ্রেণীর সর্ববশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেকস্থলে শ্রেণীর 'ফার্ষ্ট বয়' কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া হগা বনিয়া যায়, আর 'লাষ্টবয়' কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া বসে। মেধা-পরীক্ষার নামে এই যে অভিনয়—ইহাকে ন্যায় ও অপক্ষপাতিত্বের নামে প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কী বলা যাইতে পারে? এই অভিনয়কে কেন্দ্র করিয়া কর্তারা প্রতি বৎসর

শিক্ষার্থীদিগকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটাইয়া লইতেছেন। পরীক্ষায় ফেল হইবার ভয়ে রাত্রি জাগিয়া যে কত ছাত্র স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহার হিসাব লওয়াও কর্ত্তারা একবার প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন না। যে পরীক্ষার মূল্য এক কাণা কড়িও নহে, যাহা কেবল প্রবঞ্চনারই নামান্তর নিষ্ঠুর ও বেদনা-জনক সেই পরীক্ষার জন্য এত কেন ?

এই প্রকার বহু অন্যায় ও কূটনীতি বিদ্যাশিক্ষায় রহিয়া গিয়াছে। অতএব, সেই বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইয়া আমিও মহা ফাঁপরে বা গোলে পড়িয়াছি।

গোলকচন্দ্রের পেটে গোল।

পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে বেশী পাণ খাইতাম বলিয়া একবার কিছুদিনের জন্য বদ্‌হজমিতে বা পেটের গোলমালে ভুগিয়াছিলাম। কিন্তু, সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। ঐ প্রকারের গোল ছাড়াও যে পেট

মানুষকে আরও গোলের ভিতর ফেলিয়া তক্‌লিফ্‌ দিতেছে তাহাও আমাদের জানিয়া রাখা উচিত।

মানুষ ধরায় আসে পেটের জন্য। সেই পেটের সেবা সব চেয়ে ভাল করিয়া যে করিতে পারে সে-ই হইতেছে বড় লোক। টাকা যাহাদের আছে তাহাদিগকে তো বড লোক বলিতেই হইবে। কেননা, টাকাব জোরে পেটের সেবা ভাল করিয়া করা যায়। টাকা যাহাদের নাই তাহারা পেটের সেবা পূরাদমে করিতে পারে না, সেইজন্য তাহারা ছোট লোক। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় দুঃখে বলিয়াছেন, "যারা প্রতিদিন দস্যুর মত গরীবের সামগ্রী লুট করে খাচ্ছে তারাই হচ্ছে আমাদের সমাজের ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। আর যারা পরিশ্রমের দ্বারা পাষাণ-অহল্যার মত অনুর্ব্বর জমিকে ফলে শস্যে ভরিয়ে তুল্‌ছে, যারা পাথর ভেঙে পথ গড়ছে, পৃথিবীর সব কিছু সম্পদ সৃষ্টি করছে—তারা আমাদের সমাজে ছোট লোক। তাদের পক্ষে পান্তাভাত আর নুনই যথেষ্ট......"

'সাম্যবাদের গোড়ার কথা'।

লেখাপড়া শিখিয়া পেটের ভাত যোগাড় করিবার মত চাকুরী পাওয়া দায় বলিয়াই তো বিদ্যার গৌরব গিয়াছে গোল্লায়। ডাল-ভাত সমস্যার সমাধান (Dal-Vat Solution ?) করিবার জন্য আজ কতপ্রকারে যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যে ভগবান আমাদের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন

তিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য করিয়া এই পেটকে সৃষ্টি করিয়াছেন। 'যতই করিবে দান তত নেবে টেনে'। কোথায় যে যায় তাহাওতো বুঝি না। ডাক্তারেরা বলেন,—"কার্য্য করিতে, পৃথিবীতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টায় যে শক্তির ক্ষয় হয় আহারে তাহা পূরণ হয়।" যদি তাই হইত তাহা হইলে নির্জ্জীব জড় পদার্থের আহারের প্রয়োজন হইত না, অকর্ম্মা বাঙ্গালীরাও অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে পারিত। কিন্তু, খাবার বেলায় দেখি অন্য জাতির চেয়ে বাঙ্গালীরা ডবল। মানুষের কীর্ত্তির নিদর্শন পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্য্যে, কিন্তু ভগবানের কীর্ত্তির নিদর্শন এই পেট-আশ্চর্য্যে।

৺বঙ্কিম বাবু 'দেবী চৌধুরাণী'তে লাঠির অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন—উহার আঘাতে নাকি কত যোদ্ধার হাত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িয়াছে, কত লোকের হাত ভাঙ্গিয়াছে, পা ভাঙ্গিয়াছে ও মাথার খুলি উড়িয়া গিয়াছে। শেষকালে লাঠি স্বর্গে যাইয়া দেবতাগণকে ফল পাড়িয়া খাওয়াইতেছে। কিন্তু, পেট যে আমাদিগকে তাহা হইতে ঢের বেশী বিপদের ভিতর দিয়া লইয়া চলিয়াছে—রৌদ্রে পোড়াইতেছে, জলে ডুবাইতেছে, সাগরে ভাসাইতেছে, সূচীভেদ্য অন্ধকারে কয়লার খনিতে নামাইতেছে, আকাশে উড়াইতেছে,—ছেঁচিতেছে, পিটাইতেছে মারিতেছে—ইহার কি কোনও ব্যবস্থা করা যায় না?

ভগবানের কাছে একবার ডেপুটেশন (Deputation) পাঠাইয়া পেটগুলি ফেরৎ দিবার চেষ্টা করা যাউক।

যদি পেট আমাদের সঙ্গে না থাকিত তাহা হইলে কী হইত? লেখা-পড়া, চাকুরী, ব্যবসা—সব ত্যাগ করিয়া সকলে বাড়ীতে ছুটিত। বাড়ী বলিয়া তো কোন কিছু থাকিত না। বাড়ী, ঘর, স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল, পোষ্টাফিস, রেল, ষ্টীমার, শহর, বাজার, গির্জ্জা, মন্দির, মস্‌জিদ—সব ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া সকলে পথের ভিখারী না সাজিয়া গঙ্গারাম বৈরাগী সাজিয়া মহানন্দে ঘুমাইত আর ডিগ্‌বাজী খাইত। ঘুমাইতে পারিত কি না তাহা বুঝা যায় না। কেননা, 'পেটে ভাত না থাকিলে ঘুম আসে না'। কৃষক কৃষিকাজ করিত না, তাঁতি তাঁতের কাছে ঘেঁসিত না, মেথরকে পায়খানা পরিষ্কার করিতে হইত না, জমিদারের পুত্র হোটেলে চপ্, কাট্‌লেট, ডেভিল ও মুরগীর রোষ্টের পিছনে জলের মত টাকা উড়াইতে পারিত না। সমাজে ছোট ও বড় বলিয়া কোন ভেদ থাকিত না। বিশ্বে এক অপূর্ব্ব প্রেম-রাজ্যের সৃষ্টি হইত। কেহ কাহাকেও নিজের স্ত্রী বা সন্তান বলিয়া দাবী করিত না, নিজস্ব সম্পত্তি (Private Property) বলিয়া কিছুই থাকিত না। প্লেটোর রিপাব্‌লিক (Republic—Plato) বাস্তবে পরিণত হইত।

পেট না থাকিলে মানুষের ভাবিবার প্রয়োজন হইত না। নূতন নূতন ব্যবসা বানিজ্যের নিমিত্ত, শিল্পকলা চর্চ্চা

করিবার নিমিত্ত মানুষ ছুটাছুটি করিত না। বিজ্ঞান, কলা, আবিষ্কার ও সংস্কারের মূলে রহিয়াছে মানুষের পেট। পেটের জন্য মানুষের এতদিকে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইতেছে। পেটের জন্যই মানুষের মনে এত সুচিন্তা ও দুশ্চিন্তা। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, জড়জগতে গাছপালা, লতাপাতার মন নাই। সেইজন্য, তাহারা শান্তিতে আছে। ইতর প্রাণীজগতে মনের পূর্ণ বিকাশলাভ ঘটে নাই। সেইজন্য, তাহাদেরও দুশ্চিন্তার তাপ পোহাইতে হয় না। মানুষের উন্নত মন আছে বলিয়া মানুষকে এতদিকে সেই মনের চালনা করিতে হয়। সেইজন্যই, মানুষ দুশ্চিন্তায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু, আমি জিজ্ঞাসা করি—সেই মনের চিন্তার উপকরণ যোগাইতেছে কে? উত্তর— পেট। তাহা হইলে পেট উপেক্ষিত হইল কেন? "কাব্যের উপেক্ষিতা" লিখিতে কবীন্দ্র ঊর্ম্মিলার দুঃখে নিজে কাঁদিয়াছেন, পত্রলেখার দুর্দ্দশায় অপরকে কাঁদাইয়াছেন এবং মজাইয়াছেন, প্রিয়ংবদা ও অনুসূয়ার জন্য অপরের সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়াছেন। সেই কবীন্দ্রের দ্বারা পেট কী প্রকারে উপেক্ষিত হইল তাহা জানি না। আসলে কিন্তু পেটই আমাদিগকে ঘায়েল করিয়া ফেলিয়াছে।

পেট আমাদিগকে কেমন জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহার এক জলন্ত উদাহরণ বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'সাম্যবাদের গোড়ার কথা' বইতে ৩৪ হইতে ৩৬

পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন।—"আমাদের বাড়ীর পাশে কুরচি-পোঁতা। কুরচিপোঁতার বাহার সেখের ছেলে গোলাম সেখ আর রাজার ম্যানেজারের ছেলে সোমনাথ আমার সঙ্গে একত্র কেদার মাষ্টারের স্কুলে পড়তো। গোলাম আমার চেয়ে অনেক ভাল ছেলে ছিলো·········সোমনাথ আর আমার চেয়ে সে অনেক বুদ্ধিমান ছিলো। সোমনাথ প্রেসি-ডেন্সি কলেজে বি-এ পাশ করে বিলাতে গেলো—এখন সে উড়িষ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেট, আমি খবরের কাগজে কলম ঠেলি—আর আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান গোলাম কৃষ্ণনগরে রাজ-মিস্ত্রীর কাজ করে।

"যে সময়ে সোমনাথ তার বাবার পয়সার জোরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পুস্তকের পর পুস্তক শেষ করতে লাগলো সেই সময়ে ভ্রাতা গোলাম সংসারের অভাবের তাড়নায় পুস্তক ছেড়ে কর্ন্নিক হাতে করতে বাধ্য হলো, তার এমন সুন্দর মস্তিষ্ক, এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোন কাজেই লাগলো না—ছাদ পিটানো ছাড়া। এমনি করে দারিদ্র্যের মরুভূমিতে কত সুন্দর প্রতিভার কুসুম-ফোটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।·········সে এবং তার মত হাজার হাজার নিষ্পেষিত প্রতিভা ছাদ পিটিয়ে আর করাত চালিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে—আর সোমনাথের মত নিভাস্ত সাধারণ ধরণের ছেলেরা বাবার পয়সার জোরে বিলাত ঘুরে এসে সমাজকে নাকে দড়ি দিয়া চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শক্তির কি অপব্যয়!"

আমি বলি, পেটের কী অসীম ক্ষমতা! এই যে জঠর জ্বালায় মানুষ অকালেই শুকাইয়া যাইতেছে ইহাকে পেটের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ছাড়া আর কী বলা যাইতে পারে।

এই আজব পেটের ভাত আমরা জোগাইতে পারিব না বা আমাদের পৃথিবী জোগাইতে পারিবে না, ফলে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জঠর জ্বালায় জ্বলিবে, দুর্ভিক্ষের তীব্র দাহনে পুড়িয়া কতক মরিবে, কতক বাঁচিয়া থাকিবে—সেই ভয়াবহ অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া একশত বৎসর আগে হইতে ম্যালথাস (Malthus) ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।* যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাঁহারা যাহাতে নিরাপদে দুইটা পেট পুরিয়া খাইতে পারেন তাহারই জন্য সন্তানোৎপাদন বন্ধ করিবার উপায়, নূতন নূতন খাদ্য দ্রব্যের আবিষ্কারের চেষ্টায় আমাদের হোম্‌রা-চোম্‌রাদিগকে সব-সময়ে ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাহা না হইলে তাঁহাদেরও কোন কাজ থাকিত না। তাঁহারাও আমাদের মত সংসার-ময় ডিগ্‌বাজী খাইয়া বেড়াইতেন।

খাদ্য-দ্রব্যের তালিকায় খাদ্য-দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়া মানুষকে বাঁচাইবার জন্য ডাক্তার বাবুরা কী প্রকার চেষ্টা

* "Food-supply increases in Arithmetical progression while population increases in Geometrical progression To avoid positive check on Population due to want of food, famine and such other natural catastrophe people should adopt preventive check".—Malthusian Theory.

করিতেছেন তাহা একবার দেখা যাউক। পূর্ব্বে আমরা ডা'ল, চা'ল, ডিম, শাকসব্জি—সব খাইতাম সুসিদ্ধ করিয়া, আর এখন ডাক্তার বাবুরা ও ডাক্তার সাহেবেরা বলিতেছেন—"অর্দ্ধসিদ্ধ বা একদম অসিদ্ধ খাও। সুসিদ্ধ করিলে ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া যায়।" পালংশাক, পুঁইশাক, অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগ ইত্যাদি জানোয়ারের খাদ্যের মধ্যে নাকি ভাইটামিন বেশী আছে। তেলাকুচার মত যে বিদিকিশ্রি ফল—টম্যাটো বা বিলাতী বেগুন নাম দিয়া তাহার গুণ গাহিবার জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তারা পঞ্চমুখ। নির্ব্বোধেরা হয়ত বলিবে,—"ঘাসপাতা খাওয়াইবার জন্য এই প্রকার বক্র চেষ্টা (indirect attempt) কেন? কর্ত্তারা শুধু বলিলেই পারেন যে আগে ভাত, মাছ ও দুধ-কলা খাইয়া আমরা জীবন ধারণ করিতাম। এখন পৃথিবীতে পেট বেশী হইয়া গিয়াছে,—ভাত, মাছ, দুধ-কলায় আর কুলাইতেছে না। অতএব, আইস, সকলে মিলিয়া জানোয়ার সাজিয়া খড়-কুটা, সাপ-ব্যাঙ, ঘাস-পাতা খাইতে শুরু করিয়া দেই।" নূতন কোন কিছু বলিলে যে সমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে তাহা জানি। দর্শন-শাস্ত্রের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রুনোকে (Bruno) রোমে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা আমাকে মারিতে ভয় করিতেছ, কিন্তু আমি তো মরিতে ভয় করি না।" (you are more afraid to pronounce my sentence than I am to

receive it) ডাক্তার বাবুরা ঐ নূতন ফৎওয়া দিয়া যে এত বড় বিপদে পড়িবেন না তাহাও তো সত্য। তবে আর ভয় কী? লুথারের মত অতখানি শক্ত হইয়াও ডাক্তারদের নূতন মতবাদ প্রচারের প্রয়োজন হইবে না ('Determined to stand upon the Bible and my conscience' —Luther)। ডাক্তারদের ফৎওয়া আমাদের সমাজ অতি সহজেই মানিয়া লইবে। শুধু একবার বুঝাইয়া দিতে হইবে যে এটা অমুকে খায়, কিন্তু অমুকে খায় না, ওটা অমুকে খায় না, কিন্তু অমুকে খায়,—এমনি করিয়া পৃথিবীর শাক-সব্জি, গাছ-খুঁটি, ফল-মূল, কুঁচে-কুমীর, তরি-তরকারী, বাঘ-শিয়াল, সাপ-ব্যাঙ সবইতো মানুষের করালগ্রাসে পড়িয়া অজব দরিয়ায় ডুবিতেছে। "যথানুপাত-বিশিষ্ট খাদ্য (well balanced diet) শরীর গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন"—এই কথা বলিয়া ডাক্তারেরা সর্ব্ব-জাতির রসনার রসাস্বাদন বাঙ্গালীদের একাধরে (এক + অধর?) করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু, অম্ল-অজীর্ণ-পেট-ফাঁপা-প্রপীড়িত বাঙ্গালীরা—"ঊনোভাতে দুনো বল" এর দোহাই দিয়া কোনও মতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। "ভরা-পেটে রসাতল"—এই কথা ভাল করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer's 'Education'— moral, intellectual and physical)। তিনি ইশারায় বলিয়া গিয়াছেন যে, বেশী খাইলে কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ছাই-ভস্ম দিয়া অযথা পেট ভরিয়া রাখা ভাল নহে।

বেশী খাইলে শুইয়া পড়িতে হয় সকলকেই। স্পেন্সার ঘোড়া ও গরুর উল্লেখ করিয়া তৃণ-শাক-সুজি-ভোজী গো-মহিষাদি হইতে স্বল্পাহারী ঘোড়া যে বেশী শক্তিশালী ও কর্ম্মঠ তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। কেহ হয়ত বলিয়া বসিবে যে, ঘোড়া ও গরু দুই প্রকারের জানোয়ার,—গঠন প্রণালীর বৈশিষ্ট্যের জন্য ঘোড়া বেশী বীর্য্যবান এবং কর্ম্মঠ। এই প্রকার সমালোচনার বিষয় কেয়াস করিয়া তিনি আগে হইতে সাবধান হইয়াছেন। তৃণভোজী পেটুক ঘোড়া হইতে বুট ও ছোলা ভক্ষণকারী স্বল্পাহারী ঘোড়া অধিক বীর্য্যবান এবং কর্ম্মঠ। মাংসাহারী সিংহ ও বাঘ—ইহারা পেটমোটা গরু ও অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে ঢের বেশী সাহসী ও বলবান। (হিংস্রত্ব ?—গায়ে বল থাকিলে সকলেই হিংস্র হয়, যেমন—মুসোলীনি, হিট্‌লার)। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের হিন্দুদিগের চেয়ে অন্যান্য সমস্ত জাতি বেশী বীর্য্যবান এবং সাহসী তাহার কারণ ভারতীয় হিন্দুরা মাংসাহারী নহেন,—তাঁহারা সব পেটুক মিষ্ট-ভোজী বামুন বা তাঁহাদের শিষ্য। আমাদের দেশের ডাক্তারেরাও বলেন যে ফেন্‌টুকুও গালিয়া ফেলিলে ভাতে কিছুই থাকে না। এই প্রকার ফেনফেলা ভাতে ভরা-পেটে রসাতলে যাইব না, তবে কি রসাতলে যাইব মানুষ খুন করিয়া ? সেজন্য তো জেল ও আন্দামান রহিয়াছে।

পেটের ভিতরের ইঞ্জিন পাকস্থলী। ঐ ইঞ্জিন বেকল হইলেই মনুষ্য-জাহাজ সমুদ্রের অতল-জলে নিমগ্ন হয়।

যদি ঐ ইঞ্জিনখানা একবার খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করিয়া অনবরত অক্সিজেন (Oxygen) ইনজেকশন চালাইয়াও কেহ কাহাকেও বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। ঐ ইঞ্জিনের কাঠ, কয়লা ও তেল জোগাইবার জন্যইতো এত সব বিপদের ভিতরে মানুষ ড্যাম কেয়ারভাবে বেপরোয়া হইয়া চলিতেছে।

একবার গলা পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইয়া বাবার কাছেই আমাদের শিষ্য-বাড়ীতে শুইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমাইয়া পড়িলে পিপড়া বেটারা আমার গলার ভিতর হইতে চিড়াগুলি টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছিল, আর দৈ-টুকু বাহিয়া পড়িয়া বালিশ ভিজিয়া যাইতেছিল। সেই বাড়ীর কর্ত্তার এক ছোট মেয়ে চেঁচাইয়া উঠিল—"ও মশাই, উঠুন আপনার চিড়া নিয়া গেল।" হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বাবা বলিলেন, "আর তোকে লইয়া কোথাও আসিব না।" মনে মনে বাবার আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে করিতে ভাবিলাম,— আধমণে কৈলাশের নাম লোকমুখে শুনা যায়, মানুষে তাঁহার সুনাম করে। আর আমি বুঝি কেবল পেট বহিয়াই মরিব, পেটের জন্য গালাগালি খাইব, সুনাম পাইব না? কুখাদ্য খাইয়া অম্ল, অজীর্ণ ও পেটফাঁপায় বহুবার ভুগিতে হইয়াছে। কিন্তু বিদেশী ক্যাষ্টর অয়েলের গুণে সর্ব্বমুক্ত আরোগ্যলাভ করিয়া উঠিয়াছি।

পেটের থিওরী (Theory) লইয়া একবার খুব ঘাঁটাঘাঁটি

করিয়াছিলাম। "খাইয়াই মানুষ মরে, না খাইয়া কেহ মরে না"—ইহার ভাবার্থ পড়িয়া তাজ্জব হইয়া গিয়াছিলাম। কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগের বীজাণু খাবারের সঙ্গে শরীরে ঢোকে। ডাক্তারেরা বলেন,—"Mouth is the gateway of eighty per cent diseases" আবার আমি বলিব যে, Mouth is the gateway of পেট। অতএব, পেটের সহিত রোগের সম্বন্ধ সঙ্গতভাবে (Logically) স্থাপিত হইল। রোগী দেখিতে আসিয়া ডাক্তার বাবুরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন,—"পেট কেমন আছে?"

এ দেশের খাবারের দোকান-ওয়ালাদের চরিত্রবল নাই। মিঠাইয়ের দোকানে বা হোটেলে ঢুকিলেই 'ভাল ঘি, টাট্‌কা খাবার' বলিয়া হাকিতে শুনা যায়, কিন্তু দোকানে সাজাইয়া রাখিয়াছে পচা ও বাসি বিষ। খাইয়া আসিয়া জীবন ভরিয়া রোগে কাত্‌রাও—কেহ ভ্রূক্ষেপও করিবে না। পশ্চিমের সভ্যদেশগুলির খাবারের দোকান-ওয়ালারা নাকি এতখানি স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিয়াছে যে, নিজেদের লাভের জন্য, অর্থ-সঞ্চয়ের নিমিত্ত কাহারও পেটে বিষ ঢুকাইতে তাহারা ঘৃণা করে, ভয় পায়। সেই তুলনায় আমাদের দেশের মানুষের 'পেটভরা' কেবল খল ও ছলনা।

এদেশে ও বিদেশে এই পেট যখন মানুষকে এতখানি চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, মানুষের পেটে যখন

এত খল, এত ছলনার আবাস, ভগবানের সৃষ্ট রাজ্যে পেট যখন এতখানি গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে তখন আমার বামুনমার্কা পেটটী যে গোলযোগ সৃষ্টির বেলায়ও ডবল তাহাতে আর সন্দেহটীমাত্র নাই।

গোলকচন্দ্রের চরিত্রগঠনে গোল।

এ পৃথিবীটাকে একেবারে কৃতার্থ করিয়া দিবার জন্য কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ শুভ বা অশুভ লগ্নে যে আমার জন্ম হইয়াছিল তাহা জানি না। অতি শৈশবেই মিছা-কান্নায় সুপণ্ডিত হইয়া মা-বাপ্‌কে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিলাম। বাল্যের প্রারম্ভে যে সমস্ত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে—মিথ্যা কথা বলা, গাছে উঠা, জলে ডুবা, সাঁতার কাটা, মারা-মারি করা, ফুটবল খেলা, পরের দ্রব্য চুরি করিয়া নিজের পেট বা পকেট ভরিয়া রাখা এবং বিনামূল্যে, বিনা-মাসুলে পরের ঘাড়ে চড়িয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া আর লম্বা-চওড়া কথা কহা—এই গুলিই প্রধান। কোনও প্রকার

বিপদে পড়িলে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য প্রয়োজনমত অপরের গোঁফে ও মাথায় কাঁঠালের আঠা মাখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতাম। আমার ভবিষ্যত জীবনের ভয়াবহ অবস্থার কথা ভাবিয়া মা নিরুৎসাহে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন শুনিতে পাইলাম, বাবা মাকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, "তুমি অত হতাশ্বাস হইতেছ কেন? ঈশ্বরচন্দ্র কি তাঁহার মা-বাপকে ও পাড়াপড়সীদিগকে কম জ্বালাইয়াছিলেন? তিনি তাঁহার মায়ের পেটে থাকিতেই মাকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার ঠাকুরদাদা ঈশ্বরের বাবার নিকট লিখিয়া জানাইলেন, 'একটা এঁড়ে বাছুর হইয়াছে'; * দুর্দ্দান্ত বালক—ঈশ্বরের দৌরাত্ম্যে পাড়াপড়সীদের টেকা দায় হইয়াছিল। তাঁহারা ঈশ্বরের ভয়ে 'বাবা গো, মরলাম গো' বলিয়া চেঁচাইত। বিলাতের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বাল্যকালে ছিলেন একগুঁয়ে, বদমেজাজী, দুর্দ্দান্ত, যথেচ্ছাচারী এবং অনমনীয়। † হরির ঐ বিভিন্নমুখী তেজ (energy) যদি একবার সুপথে চালিত করিতে পারি তাহা হইলে ও একখানা ধারাল ইস্পাত ছেলে হইয়া যাইবে। তোমার সাহায্য পাইলে আমি উহাকে

* বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

† "Wordsworth, the poet, was in his childhood, of a stiff, moody and violent temper and perverse and obstinate in defying chastisement"—Smiles' Character.

পোষ মানাইয়া সুপথে আনিতে পারিব—এ আশা আমার আছে। শৈশবে বেশী ভাল-হওয়াটাও ভাল নহে।"*

এইকথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম,—'সেহ হইব নয়'। কিন্তু, অচিরেই দেখিলাম তাহাই হইল। বাড়ীতে বাবার নিকট এবং পাঠশালায় ক্ষুদে পণ্ডিতের নিকট কানমলা খাইয়া খাইয়া কান রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ইঁহাদের ষড়যন্ত্রমূলক কড়াশাসনের চোটে অল্পদিনের মধ্যে সমস্তই বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

ফটকেদের কাল-গাইটা মাঠে লক্ষ্মী মেয়েটার মত দাঁড়াইয়া থাকিত। রোজ দুইবেলা বাছুরের মত ঐ গাইটার পেটের নীচে যাইয়া দুধ-খাওয়াটা আমার অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল। মাঠ-ভরা তো আরও গাই থাকিত, কিন্তু আর কোনটার নীচে গেলেই লাথির চোটে হয় নাক ভাঙ্গিত, না হয় দাঁত ভাঙ্গিত। আমার এই প্রকার দুধ খাওয়া ফটকের বাপের সহ্য হইল না। একদিন ফটকের বাপের লাঠির ঘায়ে আমার পিঠে দাগ পড়িয়া গেল। সেই সংবাদ দুষ্টছেলেরা যথাসময়ে মায়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। সন্ধ্যাবেলা মা বাবার কাছে অনুযোগ করিয়া বলিলেন,— "যে-সে আমার ছেলেকে মা-বাপ-হারা জারজ পুত্রের মত মারিয়া যে পিঠে দাগ করিয়া দিবে তাহা হইবে না, ইহার

* "It is not good to be so good as good for nothing"
—Italian Proverb.

প্রতিকার করিতে হইবে।” প্রতিকারের যে প্রকার ব্যবস্থা হইল তাহা স্মরণ হইলে আজিও আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সে দিন বোধ করি, আমার পিঠে আগুন জ্বলিয়াছিল। পার্শ্বের বাড়ীর কদম আলী ছুটিয়া আসিয়াছিল তাল কুড়াইবার জন্য। সে মনে করিয়াছিল যে, আমাদের রান্নাঘরের পিছনে তাহাদের বাগানের তালগাছ হইতে দিড়িম দিড়িম করিয়া তাল পড়িতেছিল। ইহার পর কোমর সোজা করিয়া হাঁটিতে পারি নাই দশবারোদিন।

রাঙ্গাবুড়ীর গাছের শশা, বেলাদের গাছের আম আরঞ্জাম, শীতল মালার বাড়ীর পেয়ারা ও জামরুল, করম আলী মুন্সীর গাছের কুল, জীবন গাঙ্গুলীর বাড়ীর লিচু—এগুলি নাকি আমার দৌরাত্ম্যে কুঁড়িতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। গ্রামের শিউলীর এইরূপ ধারণা ছিল যে, দারুণ শীতের রাত্রেও অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া তাহার দুইটি খেজুর গাছের রস আমি-ই সাবাড় করিতাম। কে নাকি একদিন আমাকে বাঁশের নলের মুখে নেকড়া জড়াইয়া খেজুর গাছের কলসীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া মিয়া রস খাইতে দেখিয়াছিল। শিউলী আমার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একদিন বড় কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিল। সে একদিন কলসীর মধ্যে একটা বিষাক্ত দ্রব্য রাখিয়া দিয়াছিল। ফলে, সেই রাত্রে রস খাইবার পরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পঁচিশবার পায়খানায় ছুটিতে হইয়াছিল। ইহার পর হইতে ভয়ে রস খাওয়া ছাড়িয়া দিলাম।

কঠোরতার ব্যবস্থা না হইলে দুষ্ট ছেলে শান্ত হয় না—ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

আর একদিন কে নাকি দেখিয়াছিল যে, কদম আলী-দের নারিকেল গাছের নারিকেলগুলি দড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে আমাদের রান্নাঘরে ঢুকিতেছে।



নারিকেলগুলি দড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে আমাদের রান্নাঘরে ঢুকিতেছে।

এইসব হেকমতের কথা বাবার কানে পৌঁছিলে তিনি আমার কোমরে দড়ি পরাইয়া দিলেন। যাহাতে বাহিরে না যাইতে পারি সে বিষয়ে কড়া তদ্‌বির চলিতে লাগিল। বাবার কড়া শাসনের মাত্রা এত বাড়িয়া গেল যে, যদি লুকাইয়াও কোনও দিন বাড়ীর বাহির হইতাম তাহা হইলে শোর-গোল ডাক-পাড়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিত।

পরের গাছের ফল-ফলাদি চুরি করিয়া খাওয়া যখন এইসব গোলমালে পড়িয়া একেবারে বন্ধ হইয়া আসিল তখন বাড়ীতেই ঐ কার্য্য চালাইতে মনস্থ করিলাম। (Let theft begin at home.) একদিন নিজেদের বাড়ীর আমগাছে উঠিয়া কেবল দুইটি কাঁচা আম পাড়িয়া কোঁচড়ে রাখিয়াছি—অমনি বাড়ীর ভিতর হইতে কড়া-গলায় আওয়াজ হইল,—"কেরে গ্যাছে?" তাড়াতাড়ি নামিব কি উঠিব স্থির করিবার আগেই একখানা শুক্‌না ডালকে জড়াইয়া ধরিলাম। চক্ষের নিমেষে শিকড়ের উপরে চিৎ হইয়া নামিয়া পড়িলাম। মা চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"আহারে আমার সোনার যাদু বুঝি একেবারে গেল, অমন গুণের ছেলে কার আছে?" গম্ভীর গলায় বাবা প্রত্যুত্তর করিলেন,—"রাখ, গুণের পর ভাগ শিখাইতেছি।" উঠিয়া পলাইবার সমস্ত শক্তিটুকু কোমরের বেদনায় শুষিয়া লইল। বাবা আসিয়া ঘাড় ধরিলেন। "নিজের গাছের আম, না-হয় ধীরে ধীরে খা"—বলিতে বলিতে তিনি আমাকে বাড়ীর ভিতর টানিয়া লইয়া চলিলেন। ভাবিলাম, কী আর করিবে? এই বয়সে কত বাবাকেই তো দেখিলাম! বাবাগুলার মমতাতো সব অপত্য-স্নেহে ঢাকা পড়িয়া যায়! ঐতো সেদিন চাক্ষুষ দেখিলাম যে, নিধু তাহার বাপের মুখে ঠাশ্ করিয়া চড় মারিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিল। একটু পরেই নিধুর বাপ ফিক্ করিয়া হাসিয়া তাহার ভাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া সকলের কাছে বলিল,—"হঠাৎ পড়ে

খেয়ে একটা দাঁত ভেঙ্গে গেছে।" কুকীর্ত্তিমান পুত্রদের কুকীর্ত্তি-গুলি বাবারা হজম না করিলে আর কে করিবে? এই ভাবিতে-ছিলাম বটে, কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। আমার কোমরে শিকল পরাইয়া রান্নাঘরের খুঁটার সহিত তালা মারিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইল।



মায়ের প্রতি হুকুম হইল, "শয়তানের বইগুলি এইখানে এনে দিও। ওকে এইখানেই ভাত দিও। আমার বিনা-অনুমতিতে খুলে দিলে তুই মা-পুতের এবাড়ী ছাড়তে হবে।" চারিদিন ঐ অবস্থায় থাকিবার পরে বাবার নিকট কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—আর ওসব করিব না, এই প্রতিজ্ঞার পরে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এই প্রসঙ্গে আজ অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। যে গোপালভাঁড় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নাচাইল, মজাইল, ভুলাইল, নৌকায় তুলিয়া কাঁদাইল, স্থলে নামাইয়া হাসাইল, গাত্র হইতে পঙ্ক লেহন করাইল; রাজ-পিসীমাকে মিছা-চিংড়ি-ঘণ্ট খাওয়াইল; নবাবকে খট্টাঙ্গ পুরাণ দেখাইল, তাঁহার জন্য মহাভারত রচনা করিল; বর্দ্ধমানের মহারাজার সভাসদ্গণের হাসিমুখ এক নিমেষে ম্লান করিয়া দিল; নিজের জামাইয়ের শ্বশুর বাড়ীতে আনাগোনা চিরতরে বন্ধ করিয়া দিল—সেই গোপাল ভাঁড়ও তাহার একরত্তি ছেলের নিকট কুপোকাত হইল। পথে আসিতে আসিতে গোপাল ভাঁড়ের ছেলে পিছনে পড়িয়া তাহার বাবাকে, 'গোপাল! গোপাল!' বলিয়া ডাকিয়াছিল। গোপালভাঁড় রাগিয়া ধম্‌কাইল—"হতভাগা ছেলে, বাবাকে নাম ধরিয়া ডাকিস্!" ছেলে ত্বরিত জবাব দিল,—"হাঁ্যা, তোমার যেমন বুদ্ধি, এই দু'শো লোকের মধ্যে 'বাবা' বলিয়া ডাকি, আর সকলে উত্তর দিয়া আমার বাবা হ'ক।" এই দুর্দ্ধর্ষ ছেলের মত আমিও বাবাকে কাহিল

করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু, দানব-মূর্ত্তি বাবার নিকট আমার সে চাল চলিল না। অত্যল্পকাল মধ্যে আমার অদম্য বিভিন্নমুখী তেজকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংহত করিয়া আমার ভিতরেই তিনি আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। আমি যেন তখন ষ্টীম-বোঝাই ইঞ্জিনে পরিণত হইলাম। অদম্য ষ্টীমকে কাজে লাগাইবার জন্য বাবা এইবার প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। *

সেই পুরান স্মৃতি মনে উঠিয়া আজ আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু বাবার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিতেছে। এই প্রকার কঠোর শাসনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমার প্রতি যে স্নেহবারি বর্ষণ করিয়াছেন তাহাও আমি এ জীবনে ভুলিব না। এ দেশের আশুতোষ ও বিদেশের লুথারের (Luther) মত এই দানবমূর্ত্তি পুরুষ-সিংহটা বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি'র † চমৎকার মানবমূর্ত্তি। এই

* "Strong temper controlled and held in subjection —like steam pent up within organised mechanism of a steam engine, the use of which is controlled and regulated by side-valves and governors and levers may become a source of energetic power and usefulness." "Energy would expend itself in work if removed from the temptation to quarrel"—Smiles' Character.

† "Luther's rude exterior covered a warm heart" "আশুতোষ ছিলেন নারিকেলের মত, উপরের কঠিন আচ্ছাদন ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাঁহার চরিত্রের মধুরতা ভোগ করা যাইত।"

বয়সে কত অপদার্থ ও অপগণ্ড পিতাকেইতো দেখিলাম — তাহাদের কুলাঙ্গার সন্তানদিগের কুকীর্ত্তিগুলি নিঃশব্দে হজম করিয়া যাইতেছে। তাহাদের সন্তানেরাও নিত্য নূতন কঠিন-শ্রুর খোরাকের যোগাড় করিয়া দিতেছে। এই সব অপদার্থ মূর্খ পিতাগুলি অপত্য-স্নেহে এত গদ গদ হইয়া পড়ে যে পরের দোষগুলি ইহারা খুব বড় করিয়া দেখে, অথচ নিজেদের পুত্রকন্যার কার্য্যকলাপ, যত জঘন্যই হউক না কেন, তাহাদের নিকট নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হয়। তাহারা তাহাদের সন্তানাদির কুকীর্ত্তিগুলি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বীভৎস মিথ্যা ও জুয়া-চুরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কতপ্রকারেই না অপচেষ্টা করে। ইহাদের পুত্রকন্যারা অপকর্ম্ম করিতেছে দেখিয়াও ইহারা চোখ্ বুজিয়া থাকিয়া বলিবে,—"না, ওরা কিছুই করে নাই। আমি তো কিছুই জানি না।" উহারা মনে করে যে, তাহাদের কথাটাই সকলে বিশ্বাস করিয়া লইতেছে! অপকর্ম্মটা ঢাকিয়া ফেলিতে পারিল মনে করিয়া তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়!* তাহারা একবার একথা ভাবিবারও অবসর পায় না যে, অন্য মানুষের কথাতো দূরে, নিজেদের সন্তানেরাও তাহাদের এই অপচেষ্টার জন্য তাহাদিগকে মনে মনে ঘৃণা করে। এই প্রকার হীন-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মা

* "Give them but a sealed box, or some hole-and-corner to hide their act in and they will then forsooth and enjoy their liberty."

বাপের জানিয়া রাখা উচিত যে, "যার জন্য চুরি করি সে বলে চোর" এই প্রবাদটী কেবল প্রশ্নবোধক বা আশ্চর্য্য-বোধক চিহ্ন দিয়াই লেখা হয় না, সোজা দাঁড়ি দিয়াও অনেক সময়ে লিখিত হয়।

অপত্য-স্নেহে বাবাগুলি কতটুকু বিবেচনাহীন ও অন্ধ হইয়া যাইতে পারে তাহার একটা উদাহরণ খবরের কাগজ হইতে তুলিয়া বলিতেছি ঃ—

"দরদী পিতার কীর্ত্তি।

পুত্রের স্থলে পরীক্ষা দিতে গিয়া সনাক্ত।

ময়মনসিং।

......জানুয়ারী, ১৯৩৯।

সম্প্রতি স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুলে এক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। উক্ত স্কুলে সংস্কৃত পরীক্ষা হইতেছিল। দেখা যায় যে ময়মনসিংহের কাব্য উপাধির পরীক্ষার্থী শ্রী শৈ ......চ......চ......র স্থানে তাহার পিতা শ্রীযুত ধ......শা...... পরীক্ষা দিতেছেন।" ভালমন্দ বিবেচনা করিবার অফুরন্ত সময় পাইয়া, বিবেকের মাপকাঠিতে ভাল করিয়া ওজন করিয়া লইয়াও যে সব পিতারা এই প্রকার কাজ করিতে পারে তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তি অপত্যস্নেহে কতখানি নীচস্তরে নামিয়া পড়িয়াছে তাহা কল্পনা করিতেও আমার গা শিহরিয়া উঠিতেছে। ইহারা অপত্য-স্নেহে অন্ধ। সেইজন্য, নিজেদের দোষ দেখিতে পায় না। তাহাদের এই প্রকার

দুর্ব্বলতা যে ক্লৈব্য ও অঙ্গ-বৈকল্যের লক্ষণ তাহাও তাহারা বুঝিতে পারে না। *

এদেশে রামের অপরাধে শ্যামের ফাঁসি হয়। অন্যদেশেও যে না হয় তাহা নহে। † তবে অন্যদেশের মানুষের চরিত্রবল আছে, সেইজন্য সে সব দেশে কম হয়। কিন্তু, আমাদের দেশের মানুষের নৈতিক অধঃপতন খুব বেশী পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাই আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা খুব বেশী হয়। টাকার জোরে, ঘুষের জোরে মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করাইয়া দিয়া যে কত অপগণ্ড পুত্রের বাবা নিজেদের কুলকলঙ্ক পুত্রগণকে শাস্তিতে জেলের বাহিরে রাখিতেছে আর নিরপরাধ অন্য কাহারও ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপাইয়া দিয়া জেলে পাঠাইতেছে,—তাহার হিসাবও এদেশে পাইবার যো নাই। জাতীয় জীবনে ইহা হইতে বড় অপরাধ, ইহা হইতে হৃদয়-হীনতা, কলঙ্কের কথা আর কী হইতে পারে তাহাতো জানি না।

এইতো কিছুদিন পূর্ব্বে একজনের একটি পুত্র এমন

* "All weakness, whether of mind or body is equivalent to impotency and deformity"—Smiles' Character.

† "Her (Gertrude Vondert Wart) husband, falsely accused of being an accomplice in the murder of the Emperor Albert, was condemned to the most frightful of punishments—to be broken alive on the wheel"—Smiles' Character.

অপরাধ করিয়াছিল যে, আইনানুসারে তাহার বিচার হইলে তাহাকে পঞ্চাশ ঘা বেতের পরেও ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিতে হইত। তাহার এই কুপুত্রটী জেলের বাহিরে থাকিয়া পরম শান্তিতে জীবনের সমস্ত সুখ ও সৌন্দর্য্য ভোগ করিবে, আর তাহারই অপরাধের বিষফল সারা জীবন বহিয়া বেড়াইবে নিরপরাধ আর একজন মানুষ! এতবড় অন্যায় ও এতবড় অবিচারের পরেও যে পৃথিবী কেমন করিয়া টিকিয়া আছে তাহা বলিতে পারি না। ঘটনাটা খুলিয়া বলিতেছি।—কাশীর এক ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করিতেছিলাম। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পার্শ্বে শায়িত একজোড়া পিতাপুত্রের কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। তাহারা অতি নীচস্বরে কথা কহিতেছিল। কিন্তু, রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া তাহার কতক আমার কান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে আমি তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিলাম। সেঘরে আর কেহ ছিল না।

ছেলেটী বলিল,—"তুমি কাল সকালে বাড়ী যাও, না হ'লে দেশের মানুষে সন্দেহ করবে।" তাহার বাবা বলিল,—"সন্দেহ করবার আর উপায় নাই, কেদারকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। গ্রামের চৌকিদার সাক্ষ্য দিয়াছে যে, সে কেদারকে সেই বাড়ীর দিক থেকে রাত্রে আসতে দেখেছিল। এখন কথা হ'ল, মেয়েটী যদি বলে যে তার স্বামীকে তুই হত্যা করেছিস্।" ছেলেটী বলিল, "তা সে বল্‌বে না, তার

যাঁনও কো' এর সঙ্গে জড়িত। তাহার বাবা বলিল, "যদি পুলিস্ সন্দেহ ক'রে তোকে ধরে, তা'হলে খুব সাহসী হয়ে কথা বল্‌বি। ভয় পাস্ না যেন।"

কথোপকথন হইতে বুঝিলাম যে, ঐ কুপুত্রটী কোনও প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে জড়িত হইয়া মোহাবেশে একটী মেয়ের স্বামীকে গোপনে হত্যা করিয়াছে। আর তাহাকে বেত্রাঘাত ও ফাঁসি-কাষ্ঠ হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহার পিতার এই অপচেষ্টা! অবৈধ প্রণয় ও নরহত্যার মত দারুণ দুইটী ভয়াবহ অপরাধ হজম করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার পরেও নিরপরাধ কেদার ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিবে তাহা দেখিবার জন্য এই দুই কুলাঙ্গার পিতা-পুত্র বাঁচিয়া আছে। আমার ভিতরের আগুন ধুমায়িত হইয়া উঠিল। একবার ভাবিলাম, এই পশু দুইটীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হইবে। পরক্ষণেই আত্মস্মৃতি মনে জাগাইয়া দিল—আমার ক্ষমতা কোথায়? সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যে পুলিস্‌কে সব জানাইব তাহা সহ্য হইল না। মনে হইল,—দুইটী পশুকে পিটাইয়া একেবারে সোজা করিয়া ফেলি। আবার ভাবিলাম,—এই অন্ধকারে ঐ নরহন্তা পশু দুইটী আমাকে খুন করিয়া ঘাটে লইয়া গিয়া পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কী করিতে পারিব। পরক্ষণেই মনে হইল,—এতবড় অপকর্ম্ম যাহারা করিতে পারে, তাহাদের বুকের বল কিছুতেই থাকে না। উহারা আমার সহিত পারিবে না। আর তাহা ছাড়া, সত্যের জন্য কত লোকই তো এ পর্য্যন্ত

হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে। সক্রেটীস্‌কে (Socrates) আমরা বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছি, ব্রুনোকে (Bruno) পোড়াইয়া মারিয়াছি, গ্যালিলিও (Galileo) ও ভেসালিয়াসকে (Vesalius) নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছি। কিন্তু, মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও তো তাঁহারা ভয় পান নাই।* জানিয়া শুনিয়া এই পাপ হজম করাটা আমার পক্ষেও নৈতিক কাপুরুষতা। সেইজন্য, উঠিয়া মাথা খাড়া করিয়া বসিলাম। পিতা-পুত্র ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—মশাই, আপনার কয়টী ছেলেমেয়ে? জবাবে বলিল,—"ছয়টী ছেলে।" জিজ্ঞাসা করিলাম,—সব কয়টীই কি এইটীর মত কুপুত্র? পিতাটী নিরুত্তর রহিল। বলিলাম,—লোকের ও পুলিসের চোখ্‌ না হয় এড়াইলেন, কিন্তু, মানুষ হইয়া এ পাপ কিরূপে হজম করিবেন। ভয়ে লোকটীর মুখ সাদা হইয়া গেল। শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"আপনি কী বলিতেছেন বুঝিতেছি না।" ভাবিলাম,—এই পশুদুইটী পাপকর্ম্ম ঢাকিয়া

* এথেন্স সহরে সক্রেটীস্‌কে হেমলক (Hemlock) খাওয়াইয়া হত্যা করা হইয়াছিল। মরণের পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—"I to die, you to live, but which has the better destiny is unknown to all, except to the God."

আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে ব্রুনো বলিয়াছিলেন,—"You are more afraid to pronounce my sentence than I am to receive it."

"He (Vesalius) laid the foundations of a science but he paid for it with his life."—Smiles' Character.

মস্তবড় কীর্ত্তির কাজ করিয়া বসিয়াছেন; আর ত্যাজ্য-পুত্রটা যেন কোনও পিতা করেন না। ওটা যেন কেবল নিঃসন্তানেরাই করিয়া থাকেন। আমি আর সামলাইতে পারিলাম না। বলিলাম,—অধম কুকুর, তোমাদের আর নিস্তার নাই, আমি তোমাদের যম। এই বীভৎস ব্যাপারের ভিতর পড়িয়া আমি এত বেশী উত্তেজিত হইয়াছিলাম যে, সেই অন্ধকার রাত্রিতেই পুলিসকে খবর দিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পাখী যে পলাইতে পারে সে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কিছুদূর যাইয়া মনে পড়িল—উহারা তো পলাইতে পারে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—পশু দুইটী নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িয়াছে। নিজের মূর্খতার জন্য অনুতাপ করা ছাড়া তখন আর কিছুই করিবার রহিল না। আজ ভাবিতেছি,—'পাপ আর পারা হজম হয় না'* একদিন না একদিন ইহার সবই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু, ততদিনে যে সমাজ শ্মশান হইয়া উঠিবে! এই যে বিষবৃক্ষ রোপিত হইল, ইহা হইতে যে বিষফল উৎপন্ন হইবে তাহাতো এই নির্জীব অধঃপতিত সমাজকে আরও জর্জ্জরিত করিবে। ইহার প্রতিকার করিবার কেহ নাই, নৈতিক চরিত্রবল যে কবে আমাদের গঠিত হইবে তাহা জানি না।

যাক্, পরের কুৎসা গাহিয়া আমার আত্মচরিত কলুষিত

---

* "Though a lie be ever so well-dressed it is ever overcome"—George Herbert.

করিতে চাহি না। আমার অপরাধের জন্য বাবা যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন সে সম্বন্ধে অনেকের হয়ত অনেক কথা বলিবার আছে। সুপণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্‌সার 'নৈতিক শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে (Moral Education—Herbert Spencer) শাস্তির ব্যবস্থাটা প্রকৃতির (Nature) উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে—কোন ছেলে যদি আগুন লইয়া খেলা করে তবে, তাহাকে পুড়িয়া মরিতে হইবে। মা-বাপ হয়ত আজ ছেলেকে বলিতেছেন—'এটা করা উচিত', দুই দিন পরে সেই কার্য্য সম্বন্ধেই বলিতেছেন—'এটা করা উচিত নহে'। মা-বাপের নিজেদের যখন এই প্রকার বিচার-বিভ্রাট হইতেছে তখন স্বাভাবিক নিয়মের (Natural laws) উপরেই শাস্তি দিবার ভার ন্যস্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই—ইহাই স্পেন্‌সার সাহেবের অভিমত। সেইজন্য, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যতপ্রকার দোষ-ত্রুটী আছে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া মা-বাপ ও পাড়াপড়সীদের এমন কি নিজেরও একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঐসব অন্যায়ের শাস্তির কোনও উপায় হইতে পারে না। ফলে, সমাজ দ্রুত অধঃপতনের দিকে নামিয়া যায়। নৈতিক চরিত্র বিষয়ে যে সমাজের অধঃপতন ঘটে, সে সমাজকে খাড়া করিয়া রাখিবার ক্ষমতা কাহারও থাকে না। মানুষ প্রকৃতিগত সুবিধাবাদী এবং স্বভাবতঃ স্ব সম্বন্ধে বিবেচনাহীন ও আত্মবিস্মৃত। তাহার দোষগুণ

বিচারের ক্ষমতা নিজের নাই। অন্য দশজনের নিকটে তাহাকে প্রকাশিত (Exposed) হইতে হইবে। এতখানি নৈতিক চরিত্রবল (Moral courage) যে দিন প্রত্যেকে অর্জ্জন করিতে পারিবে সেইদিন জাতি জাগিবে। যেদিন মানুষ নিজের দোষক্রটী সমাজের গোচরিভূত করিয়া সমাজের নির্দ্দেশ ও বিধানানুযায়ী যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাহা হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারিবে সেইদিন এই নরকতুল্য পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে। জীবনে ভুল করা পাপ নহে,—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। কিন্তু, সেই ভুলের শাস্তি গ্রহণ করা মানুষের ধর্ম্ম, না করাটা মহাপাপ। আর একজনকে সেই পাপাগ্নিতে পোড়াইবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই ভগবান কাহাকেও দেন নাই। সুলতান গিয়াসুদ্দীন কাজীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উন্মুক্ত কৃপাণ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি এক বিধবার পুত্রহন্তা-রূপে আসামী হইয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম, যদি সূক্ষ্ম বিচার না হইত, যদি সুলতান বলিয়া আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেন তাহা হইলে, এই কৃপাণ দিয়া আপনার শিরশ্চেছদ করিতাম।" কাজীও তাঁহার মুদগর দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,— "যদি আপনি আমার আজ্ঞা পালন না করিতেন তাহা হইলে, এই মুদগরের সদ্ব্যবহার করিতাম।" এমন আসামীই বা এখন কয়টী আছে? এমন বিচারকইবা এখন কয়টী আছেন? বস্তুতঃ, এ সমাজে এমন বিচারকেরও অভাব নাই যাঁহারা সারা জীবন রামের অপরাধ শ্যামের ঘাড়ে চাপাইয়া

দণ্ডমুণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; অথচ নিজেদের ঘরের ভয়াবহ অপরাধের বিচার করিতে গিয়া কাপুরুষতার চরম অভিব্যক্তি করিয়া ছাড়িয়াছেন। ইঁহাদের যদি অপদার্থ কাপুরুষ না বলা-যায় তাহা হইলে আর কাহাকে বলা যাইতে পারে তাহাতো জানি না।

আমার বাবার এই প্রকার ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থায় হয়ত আমার পরীক্ষা-পাশের ব্যাপারে একটু ব্যাঘাত জন্মিয়াছে,* কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিতো অনেকের আছে—তাহার মধ্যে সত্যকার মানুষ হইয়াছে কয়জন ?† শিক্ষা ও সভ্যতার মানদণ্ড যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি হয় তাহা হইলে, আমার বিদ্যাশিক্ষায় যথেষ্ট গোল হইয়াছে—ইহা সত্য। কিন্তু, বাবার নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে আমাকে মানুষ করিয়াছে, আমি চরম অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি। বাবা

* "Using the rod, keeping the boy from play and keeping him constantly at learning destroys the mind and blunts the sharpness"—Imam Gajjali's Kimia Sa'adat.

(Translated by D. B. Macdonald)

† "Love of truth, honesty and amiability—that all these may be wanting in a man who may yet be very learned"
—Perthes.

"কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,
ধরণী চাহিছে শুধু—হৃদয়, হৃদয় !" —অক্ষয় বড়াল।

যে কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকে আমার বাবাকে হয়ত নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু, তাঁহার ধারণা ছিল যে শৈশবে চরিত্র শোধরাইয়া না লইলে আর কখনও ছেলেকে সুপথে আনিতে পারিবেন না।* বেত্র সংযত করিলে সন্তানের পরকাল ঝরঝরে হইয়া যায় ('Spare the rod, spoil the child')। যাঁহাবা বলেন যে, ছেলেমেয়েকে বেশী শাসনে রাখিলে খারাপ হইয়া যায় তাঁহারা জানেন না যে, ছেলেরা 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম।' ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে শাসনে রাখিয়া বিত্তাসাগব করিবাব জন্য কী প্রকার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন তাহার উল্লেখ করিয়া ৺চণ্ডীচরণ বাবু এদেশের বাপগুলিকে একচোট শুনাইয়া দিয়াছেন।—"ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁহার বয়সের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। সে পরিশ্রমের ত্রুটি হইলে পিতার নিকট অত্যধিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কখন কখন তিনি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। পিতা যদি দেখিতেন যে, প্রদীপ জ্বলিতেছে না আর তিনি ঘুমাইয়া

* "As the twig is bent so the tree grows. Bad custom, consolidated into habit is such a tyrant that men sometimes cling to vices even while they curse them. They have become the slaves of habit whose power they are impotent to resist"—Imam Gajjali.

পড়িয়াছেন তাহা হইলে আর তাঁহার অব্যাহতি থাকিত না। কোন কোন দিন এতই প্রহার করিতেন যে, সে গৃহের স্ত্রীলোকেরা বালকের সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিতেন এবং কোন কোনদিন প্রহারের অসহনীয় দৃশ্যে কাতর হইয়া ঠাকুরদাসকে বাসা পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ প্রহারের ভয়ে, নিদ্রার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, অনেক সময়ে চক্ষে প্রদীপের তৈল দিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেন।...... পিতা নিজে তাহাকে পথে যাতায়াতের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন বলিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র অল্প বয়সে মন্দ বালকদের সঙ্গলাভের সুযোগ পান নাই।* অনেক কোমলমতি, সরলচিত্ত, বুদ্ধিমান বালক অসৎসঙ্গে পড়িয়া সর্ব্বদাই বিনষ্ট হয়, এবং উত্তরকালে সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া আপনার ও আত্মীয়-গণের সর্ব্বনাশ সাধন করে। বিশেষতঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ন্যায় ধর্ম্মশীল, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও পুত্রবৎসল পিতার অভাবে বর্ত্তমান বঙ্গসন্তানগণ দুর্নীতি, দুরাচার ও কুশিক্ষার

* দুইটি ছাত্র একসঙ্গে ঘোরাফেরা করে তাহা দেখিয়া রাগবীর ডক্টর আরনোল্ড একজন সহকারী শিক্ষককে আদেশ করিয়াছিলেন, "Do you see those two boys walking together. You should make 'an special point' of observing the company they keep: nothing so tells the changes in a boy's character."—Stanley. ডক্টর আরনোল্ডের বিষয় পরে লিখিত হইতেছে।—গ্রন্থকার।

ঘৃণিত পথে বিচরণ করিয়া বঙ্গগৃহের ও বঙ্গদেশের সমূহ অকল্যাণ সাধন করিতেছে। ঠাকুরদাসের ন্যায় শ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ ও সন্তানবৎসল পিতার সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, আপাততঃ আমাদের সেই দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।”

—(‘বিদ্যাসাগর’—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

অনেকে বলেন,—‘যে ছেলে ভাল হইবে, সে আপনিই ভাল হইবে, আর যে মন্দ হইবে তাহাকে কোন প্রকারেই ভাল করা যায় না।’ কথাটা হয়ত কতক পরিমাণে সত্য। কেননা, হেরিডিটির দোষগুণও সন্তানের ভিতরে যথেষ্ট থাকে। কিন্তু, এ পৃথিবীর কুসন্তান হইয়া জীবন কাটাইয়াও জীবনের সায়াহ্নে একজন হয়ত বলিবে যে, তাহার পিতামাতা তাহাকে ভাল করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার নিজের দোষে তাহার জীবন ধ্বংস হইয়াছে, আর একজন হয়ত বলিবে যে, তাহার জীবন ধ্বংস হইয়াছে তাহার পিতামাতার অবহেলার জন্য। তাহা হইলে, সন্তানের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করাই যুক্তিসঙ্গত। এমাম গাজ্জালি সাহেব বেত্র সংযত করিতে বলিয়াছেন বটে—কিন্তু, তিনি চরিত্র গঠনের নিমিত্ত শারীরিক ও মানসিক অন্য যে-সব কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন—বেতের ব্যবহারের সহিত তাহার কঠোরতার তুলনা হয় না।* মনুর অনুশাসিত

* মহাপণ্ডিত এমাম গাজ্জালি সাহেবের ‘কিমিয়া সা’দত’ চরিত্র গঠনের ও সমাজ সংস্কারের জন্য অদ্বিতীয় বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের

ব্রহ্মচর্য্য পালন করাও কি কম দুঃসাধ্য! একখানা মাদুরের উপর মেঝেতে ছাত্রজীবন ভরিয়া শয়ন করা, মাছ-মাংস না খাওয়া, প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহার না করা, গুরুর বাড়ীতে তাঁহার জন্য ভাত রাঁধা, গরু চরান—এগুলি কি কম কঠিন শাস্তি! যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে রজ্জু ও বাঁশের কঞ্চি-দ্বারা ছাত্রকে দণ্ডিত করা যাইতে পারে—এ অনুশাসনও তো মনু দিয়াছেন (২, ১৫৯—৬১)। প্লেটো তাঁহার রিপাবলিকে (Plato's Republic) যুবককে ষ্টেটের স্বার্থের নিকট বলিদান করিয়াছেন, তাহাকে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নাগরিক (Citizen) করিয়া গড়িয়া তুলিতে যতপ্রকার কঠিন শাস্তির প্রয়োজন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব, বাবার শাসনে আমি মানুষ হইয়াছি। ঐ প্রকার শাসন না থাকিলে পশু হইয়া যাইতাম।

True Tales of Indian Life নামক একখানা পুস্তক একবার আমাদের জন্য পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উহাতে

পুস্তক পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর একখানা আছে কি না সন্দেহ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র উহা উপনিষদের মত গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। Mr. D. B. Macdonald ধারাবাহিকরূপে উহার ইংরাজী অনুবাদ International Journal of Ethics কাগজে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরম পরিতাপের বিষয় যে, বাঙলা-ভাষায় উহার ভাল অনুবাদ আজিও বাহির হয় নাই। 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' নাম দিয়া উহার কতকাংশ কোনপ্রকারে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।—গ্রন্থকার।

একটা "গল্প ছিল।—একজন ভারতবাসী চুরির অপরাধে বিচারক কর্ত্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কারাগারে প্রবেশের পূর্ব্বে সে তাহাব মাতার কানে কানে একটা গোপন কথা বলিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার হাতে হাতকড়ি লাগান ছিল। তাহার ইচ্ছানুযায়ী তাহার মাতাকে হাজির করা হইলে সে তাহার মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া এক কামড়ে একখানা কানের অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া লইল। মাতা যখন যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল তখন সে হাসিমুখে বলিয়াছিল,—"আজ আমি যে চুরির অপরাধে দণ্ডিত, তুমি তার জন্য দায়ী। প্রথম যখন চুরিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। তখন যদি তুমি নিষেধ করিতে, চুরি করার পরিণাম কী হইবে তাহা বুঝাইয়া দিতে, তাহা হইলে, আজ আমার এ দুর্দ্দশা হইত না। এখন আমি একা কেন অপরাধের শাস্তি ভোগ করিব ?" এই গল্পটী মাকে বাবা পড়িয়া শুনাইয়া বলিয়াছিলেন,— "হরির প্রতি তোমার যতটুকু দরদ আছে আমারও ততটুকুই আছে। কিন্তু, দুর্ব্বলচিত্ত রমণী বলিয়া তুমি অপত্যস্নেহে অন্ধ, আর আমি পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারি। হরির কোনও অপরাধ আমার নিকট হইতে গোপন করিও না। দুর্ব্বলচিত্ত রমণীর অপত্য-স্নেহের জন্য পৃথিবীতে অনেক ছেলেমেয়ের জীবন একেবারে বরবাদ হইয়া গিয়াছে। লাঁ-মার্টিন বলিয়াছেন,—"শৈশবে ও

যৌবনে মা আমার জীবনটীকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি আজ দেশেরও কুপুত্র।"* ফরাসীদেশের দারুণ নৈতিক অধঃপতনের কথা বলিতে যাইয়া মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন,—"ফরাসীদেশে প্রকৃত মায়ের অভাব হইয়াছিল।"† সুপণ্ডিত স্মাইলস্ সাহেব লিখিয়াছেন,—"মায়ের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অপূর্ব্ব ধী-শক্তি-সম্পন্ন সন্তানের জীবনও নষ্ট হইয়া যায়।"‡ অতএব, তোমার ঐ নিউটনের মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি চালাইয়া যেন হরির জীবন ধ্বংসের পথে টানিয়া না নেও। উহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন তুচ্ছ ঘটনা তোমার কানে আসিলেও তাহা আমাকে বলিও। একজন পণ্ডিতলোক বলিয়াছেন, "একটি চুলেরও যেমন ছায়াপাত হয়, জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও তেমনি জীবনের উপর রেখাপাত না করিয়া যায় না।"¶ তোমার চেয়ে আমার বিচার ক্ষমতা বেশী আছে। তোমার নিকট হইতে আমি কেবল এইটুকু সাহায্য চাই যে, তুমি হরির

---

* "As I am my mother's spoilt child, so I am the spoilt child of my country to the end, which is bitter and sad"—Lamartine's Confidences.

† "The great want of France was mothers"—Napoleon.

‡ "A foolish mother may spoil a gifted son"—Smiles' Character.

¶ "There is no act however trivial, but has its train of consequences as there is no hair so small but casts its shadows."—Plutarch.

সম্বন্ধে তোমার গোচরিভূত সব কথাই আমাকে বলিবে। যাহা করিতে হয় আমি-ই করিব।”

বাবার কথার শ্রীতে মা ক্রোধান্বিতা হইয়া উঠিলেন। হওয়াটা স্বাভাবিক। দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া, বুকের দুধ দিয়া একটু বড় করিয়া তুলিলেই বাবারা সন্তানগুলি টানিয়া লইয়া যায়। তাহাদের ভালমন্দ বিচার করিয়া একটা কথা বলিবার ক্ষমতাও মায়ের থাকিবে না! বেশ ব্যাপারতো! ক্রোধান্বিতা হইয়া মা বলিলেন, “হাঁ, পুরুষের চোখে মেয়েলোক চিরকালই হীন, অক্ষম, কুঁড়ে। মেয়েলোক যেন কিছুই করিতে পারে না। তোমরাই তো আমাদিগকে ঐ রকম পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছ! সুবিধা ও সুযোগ পাইলে মেয়েরাও তোমাদের মত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের যোগ্য হইতে পারে। সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, দিল্লীশ্বরী রিজিয়া—ইঁহাদের মত রাজ্য-শাসন করিতে, খাওয়লা ও লক্ষ্মীবাই—ইঁহাদের মত বীরত্ব দেখাইতে তোমাদের মধ্যেই বা কয়জন পারিয়াছে!* তোমাদের মধ্যে যদি বরাহ জন্মিয়া থাকে, তবে আমাদের মধ্যে খণা জন্মিয়াছে।”

---

* দিল্লীশ্বরী রিজিয়া ও ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সম্বন্ধে টীকা নিষ্প্রয়োজন।

রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের জামাতা এবং খৃষ্টান সেনা-নায়ক পিটার এক বিপুল সৈন্য বাহিনী লইয়া দামেশ্‌কে আরব মহিলাদিগকে [illegible] করিয়া ফেলিলেন। খাওয়লা তাঁহার “রক্তচক্ষু পিটারের

বাবা বলিলেন,—“কিন্তু, তোমরা নারী হইয়া জন্মিয়াছ, আমরা পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছি, সে অপরাধ ভগবানের। তবুও তোমরা আমাদিগকে এই বলিয়া গালাগালি করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছ যে, আমরা স্বার্থপর পশু, তোমাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলাম। তুমি যে কথাগুলি আওড়াইলে তাহা

দিকে স্থাপন করিয়া এক গণ্ডি আঁকিয়া দিয়া কহিলেন, ‘খবর্দ্দার! এই গণ্ডির মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিয়ো না—বিপদে পড়িবে।’...... পিটার মুসলিম নারীদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন।......... খাওয়লা তখন যুদ্ধের নেশায় ঘোর উন্মাদিনী।.........খৃষ্টান সৈন্য দুর্গের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইল।”—‘মুসলিম বীরাঙ্গনা’,

—মঈনুদ্দীন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে “মধ্যভারতে বিদ্রোহীদের নায়িকা হইয়াছিলেন ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই। ঝান্সির রাজার মৃত্যুর পর ডালহৌসী লক্ষ্মীবাইকে পোষ্যপুত্র রাখিতে না দিয়া ঝান্সি ইংরেজ-অধিকার ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিংশবর্ষীয়া তেজস্বিনী রাজপুত-রাণী পুরুষ বেশে ঘোড়ায় চড়িয়া সেনা পরিচালনা করিতেন। তাঁতিয়া তোপির সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মীবাই ইংরেজ সরকারের সবিশেষ আতঙ্কস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।’

—‘ভারত ইতিকথা’, নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

লক্ষ্মীবাই তেজোদৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, “মেরি ঝান্সি নেহি দেয়োঙ্গী”;

—‘আর্য্যকীর্ত্তি’, রজনীকান্ত গুপ্ত।

মিল সাহেব প্রথম মানুষের মগজে ঢুকাইয়াছেন (On Liberty—J. S. Mill)। আর ঐ ধারণাটী ইদানীং অনেকে উপন্যাসের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তোমাদের তেজ এখন আর আমরা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাই, ঘরের বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া কাউন্সিলে, আফিসে ও কল-কারখানায় স্থান করিয়া দিতেছি। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি,—ষাড় ও গাই, মোরগ ও মুরগী, সিংহ ও সিংহী, পুরুষপ্রজাপতি ও স্ত্রীপ্রজাপতি, মর্দ্দা মাছ ও মাদী মাছ—ইহারাতো কেহ কাহারও অধীনে নয়, পুরুষগুলি উহাদের মেয়েগুলিকে স্বার্থপরতা করিয়া আটকাইয়াও রাখে নাই। তবে কেন উহাদের পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে শারীরিক গঠনে, ক্ষমতায় ও কার্য্যকলাপে অতটা ব্যবধান? মেয়েরা পুরুষের অনুগত থাকিয়া সংসার মধুময় করিয়া তুলে ইহাই পুরুষের মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা। সেই স্বাভাবিক বাসনার বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ করিতেছ। পুরুষের নিকট তোমাদের যাহা কাম্য তাহা বুঝিয়া নেওয়া ন্যায়-সঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু, পুরুষের যাহা কাম্য তাহাও তোমাদের পূর্ণমাত্রায় পূরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, সংসার শ্রীহীন হইয়া যাইবে। নারীকে বাহিরে আনিবার জন্য পুরুষেরা যতপ্রকার তোড়জোড়ই করুক না কেন, পুরুষের মন কিছুতেই ঐকাজে সায় দিতে পারে না—ইহা স্বাভাবিক; ভগবানের নিয়ম। আসল কথা, তোমরা এখন ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছ। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে তোমরা

অনধিকারসত্ত্বেও প্রবেশ করিতেছ। কিন্তু, আমরা Trespassers will be prosecuted—এই বিজ্ঞাপন উঠাইয়া ফেলিয়াছি। যাক, হরির সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা মনে রাখিও।” ইহার পরেও মা একবার অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন,—“তাহা হইলে তুমি বলিতে চাও যে মায়ের প্রভাবে ছেলে প্রভাবান্বিত হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র ও কাউপারের (Cowper) কথা ভাব দেখি।” বাবা বলিলেন,—“তুমি দুইটী বলিলে, কিন্তু আমি আরও দশটী বড় লোকের নাম জানি যাঁহারা মায়ের গুণে বড় হইয়াছেন। তবুও বলিব যে, সাধারণভাবে দেখিতে গেলে মা-ই অপত্য-স্নেহে অন্ধ হইয়া ছেলেকে নষ্ট করে। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। দুর্ব্বলা জননীদের মহাসাগরে ঐ মুষ্টিমেয় শক্তিশালিনী জননী কয়টী ঐরাবতের মত ভাসিয়া যায়। বাঙ্‌লাদেশ সেইদিন জাগিবে যেদিন সব মা ঐপ্রকার শক্তিশালিনী হইতে পারিবেন,

“না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এভারত আর জাগেনা জাগেনা,” (দ্বারকানাথ)

ইহার পর মা বাবার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আমাকে কচ্‌লাইয়া, পচাইয়া আমার ভিতর হইতে সর্ব্বশেষ তিক্ততাটুকু ধুইয়া মুছিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। আমার বাবার ধারণা ছিল যে, শিশুরা যখন ভালমন্দ বিচার করিয়া লইতে পারে না, তখন অভিজ্ঞ গার্জ্জিয়ানদিগের আদেশ অন্ধভাবে পালন করা (Mechanical following) ছাড়া তাহাদের

প্রত্যন্তর নাই। পরে যৌবনে সেই শিশু বিবেক ও বুদ্ধি চালনা (Reasoning) করিয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট গুণরাজির সমষ্টি দিয়া নিজের জীবন গঠিত করিয়া লইবে।* প্রত্যেক বাবার ভিতরে লাইকার্গাস্ ও সোলন—এই উভয় পুরুষ-সিংহের বৈশিষ্ট্য † একাধারে থাকা উচিত। তবেই জাতি গড়িয়া উঠিবে, দেশ জাগিয়া উঠিবে।

"এইসব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এইসব শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

আমার সমস্ত শৈশবকাল এবং বাল্যকালের কিয়দংশ এইভাবে অতিবাহিত হইবার ফলে আমার ভিতরে যেটুকু অসার ছিল তাহা জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল, রহিল শুধু সারটুকু। অকেজো অপক্ক লোহা পোড়াইয়া পিটাইয়া ইস্পাতে পরিণত করিতে পারিলে উহা হইতে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। আগাছা পচিয়া সার হয়, গাছ পাকিয়া নিজে সার হয়, আর মানুষ পাকিয়া ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই সার (Sir) উপাধি পায়। অতি অল্পবয়সেই আমি পাকিয়াছিলাম, আবার অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাবা আমাকে ভাল কাজে নিযুক্ত করিয়া লইলেন।

মধ্য-ইংরাজী স্কুলের মায়া কাটাইয়া হাইস্কুলের উঁচু

* এমার্য গাঙ্গালির মতও তাহাই।—গ্রন্থকার।

† "In Sparta Lycargus made machine, in Athens Solon made man."

সিঁড়িতে পদক্ষেপ করিবার জন্য যেদিন বাবার সহিত শহরের হাইস্কুলে গিয়া হাজির হইলাম—সেইদিন বাবা হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"আমি চাই আমার ছেলেকে মানুষ করিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইলেই যে মানুষ হইবে তাহা আমি বিশ্বাস করি না; চরিত্রবল ও মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করা চাই।"*

বাবা আমাকেও বলিয়া আসিলেন,—"দেখ বাপু, যদি কোনও দিন শুনি যে, তোমার চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে তাহা হইলে তোমাকে এমন শাস্তি দিব যাহার তুলনা নাই। সন্তান সন্ততির অপকর্ম্ম ঢাকিয়া রাখিবার জন্য যে জুয়াচুরি ও মিথ্যার অভিনয় করিতে হয়, বিবেকের সহিত যে চিরজীবন দ্বন্দ্ব করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা আমার দ্বারা হইবে না। দেশের সমাজের বা অন্য কাহারও ক্ষতি যদি তোমার দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা হইলে, তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করিব না।"

এত সাবধানতার ভিতর দিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বাবা আমাকে এতদিনে সুপথে আনিয়াছিলেন। কিন্তু, শহরের হাইস্কুলে আসিয়া সর্ব্বনাশা ও সর্ব্বগ্রাসী প্রভাবের ভিতর

* "Intellectual culture has no necessary relation to purety or excellence of character."—Smiles' Character. "Love of truth, honesty and amiability—that all these may be wanting in a man who may yet be very learned".

—Perthes.

পড়িয়া দুই বৎসরের মধ্যেই আমি আত্মহারা, সর্ব্বস্ব-হারা ও আত্মাহারা হইয়া গেলাম। আজ চরম দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমার নিজের জীবন যখন সবদিক দিয়াই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তখন নিজের অভিজ্ঞতা পরকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দেওয়া ছাড়া আমার এখন আর কিছু কর্ত্তব্য নাই। ৺বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত বলিয়াছিল,—"পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।" আমিতো পরের জন্যই প্রস্ফুটিত হইয়া আছি।

এদেশের চণ্ডিদাস গাহিয়াছিলেন,—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

মানুষ হইয়া জন্মিয়া এদেশে মনুষ্যত্ব লাভ করিবার পথে যে-সব বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে সেগুলিকে পদদলিত করিয়া বা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যাওয়া কোনও শক্তিশালী ছেলের পক্ষেও সম্ভবপর নহে।

হাই-স্কুলে যাইয়া লেখাপড়া করিতে শুরু করিলাম। বাবার ধারণা ছিল যে, আমি শিক্ষকদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিব। বলিতে বুক ফাটিয়া যায় যে, আমি শিক্ষকদের নিকট হইতে ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদীতা, সাধুতা, নৈতিক সৎসাহস—ইহার কোনটাই লাভ করিতে পারি নাই। যুবক ছাত্ররাই জাতির মেরুদণ্ড। যাঁহাদের আদর্শে ইহারা

আসে তাঁহাদিগকে আদর্শ ধরিয়া লইয়া ইহারা গড়িয়া উঠে। আদর্শ শিক্ষক আমি জীবনে পাইলাম না, নিজেকে সেইজন্য গড়িয়া তুলিতেও পারিলাম না।

বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ইংরাজ জাতির ছাত্র-সমাজে যখন একবার চরিত্রহীনতার ঢেউ বহিয়াছিল তখন রাগবীতে (Rugby) একটিমাত্র শিক্ষক তাঁহার আদর্শ চরিত্রের প্রভাবে সমস্ত জাতিকে সেই পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। আরনোল্ডের (Arnold) নৈতিক চরিত্রের প্রভাবে ছাত্র-সমাজ এমনভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, সম্মোহিত হইয়াছিল যে, ছাত্ররা তাহাদের নিজেদের সত্তা হারাইয়া ফেলিয়া সকলেই এক একটি ক্ষুদ্রকায় আরনোল্ডে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাগবীর একটি ছাত্রের সহিত পাঁচ মিনিট কাল কথাবার্ত্তা বলিলেই যে-কেহ বলিয়া দিতে পারিত যে, সে আরনোল্ডের শিষ্য। ডক্টর আরনোল্ড রাগবীটাকে যেন একটি নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছিলেন। আরনোল্ডের এই মহাবিদ্যাপীঠের সংস্পর্শে আসিয়া কেহ কোনও প্রকার অসাধু ব্যবহার করিতে পারিত না, মিথ্যা কথা বলিতে সাহস পাইত না। আরনোল্ডের জীবন-চরিত লেখক লিখিয়াছেন,— "আরনোল্ডের নিকট মিথ্যা বলাটা ছিল লজ্জাকর।"*

* "It was a shame to tell Dr. Arnold a lie. It was not so much an enthusiastic admiration for true genius or learning or eloquence which stirred within them,

এই প্রকৃত মানুষের সন্তান মহাকবি ম্যাথু আরনোল্ডও (Mathew Arnold) প্রকৃত মানুষ হইয়াছিলেন। কিন্তু, আমাদের শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে যে মোটেই প্রভাবান্বিত করিতে পারিতেছেন না তাহা চিন্তা করিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। এদেশের কোনও কলেজে এনট্রান্স (Entrance) পাশ-করা একটি লোক এম-এ পাশ বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিয়া কলেজের অধ্যাপকের কাজ করিলেন, প্রিন্সিপালও হইলেন। তের চৌদ্দ বৎসর চাকুরী করিবার পরে তিনি ধরা পড়িলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে বিবেকের সহিত কতটুকু লড়াই করিতে হইয়াছিল, এই ভয়াবহ মিথ্যা অভিনয়টাকে গোপন রাখিবার জন্য তিনি নিজে কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে কী ভাবে যাদুমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এই মিথ্যা অভিনয় ঢাকিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষে কলেজে অধ্যাপনা করিয়া কী ভাবে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাহা সকলই বিস্ময়কর। এই কৃতিত্বের জন্য আমরা তাঁহাকে একজন মহাশক্তিশালী মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু, তাঁহাকে আমরা ভক্তি করিতে

---

it was a sympathetic thrill.......a work that was founded on a deep sense of duty and its value. There was no virtue that Dr. Arnold laboured more sedulously to instil into young men than the virtue of truthfulness."—Stanleys' Life and letters of Dr. Arnold.

পারি না, শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহার এই প্রকার অপকর্ম্ম আমরা সহ্য করিতে পারি না।*

অর্থ-সঞ্চয়ের লোভে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শিক্ষক নিজে ছাত্রের স্থানে পরীক্ষা দিতে যাইয়া বিপদে পড়িয়াছেন—ইহারও প্রমাণ এদেশে রহিয়াছে। এদেশের শিক্ষক গরীব (Poorly paid) একথা মানি। দারিদ্রের কশাঘাতে মানুষ অপকর্ম্ম করে ("Poverty leads to degradation"—Marshall) একথাও মানি। কিন্তু, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি কলুষিত করিয়া যে, শিক্ষকেরা ছাত্রগণকে কলুষিত করিয়া তুলিবেন তাহা আমরা বরদাশ্‌ত করিতে পারিব না। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কারখানায় মানুষ তৈয়ারী হয়, জাতির মেরুদণ্ড প্রস্তুত হয়। শিক্ষকদের দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য আমরা লর্ড চাথামের মত, সার ওয়াল্‌টার স্কটের মত শক্তিশালী মানুষ চাই—যাঁহারা দারিদ্রের কশাঘাতেও বিবেককে বলি দেন নাই।†

* "I could honour thy courage but I must detest and punish thy crimes"—Alexander to Robber.

† "While millions of money were passing through Pitt's hands, Chatham himself was never otherwise than poor and he died poor. Of all his rancorous libellers not one even ventured to call in question his honesty."—Smiles.

সাহিত্যিকেরা চিরদরিদ্র। Sir Walter Scott যখন তাঁহার পুস্তক প্রকাশের জন্য অর্থের সংস্থান করিতে পারিতেছিলেন না, তখন তাঁহার

এদেশে যে নৈতিক চরিত্রবান শিক্ষকের একেবারে অভাব তাহাও বলা যায় না। ৺হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সত্যবাদীতা ও ন্যায়নিষ্ঠার অনেক দৃষ্টান্তপূর্ণ গল্প এদেশের ছাত্র-সমাজে সুপ্রচলিত।

একবার তিনি ট্রেনে যাইতেছিলেন। সঙ্গে ছোট একটি ছেলের জন্য একখানা হাফ্ টিকেট ছিল। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ছেলেটী দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিল। অমনি তিনি ছুটিয়া গিয়া ট্রেনের গার্ডকে বলিলেন,—"এই ছেলেটীর বয়স অনুসারে এখন আর উহার হাফ্ টিকেট চলে না। টিকেট বদ্‌লাইয়া দিন আমি অতিরিক্ত ভাড়া দিতেছি।"

কলিকাতার রাস্তায় তিনি একদিন পদব্রজে যাইতেছিলেন। একটি যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মশাই, বল্‌তে পারেন—মনোমোহন থিয়েটার কোথায়?" যুবকটী থিয়েটারে যাইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি চটিয়া গেলেন। বলিলেন,—"যাও, ওসব আমি জানি না।" যুবকটী চলিয়া গেল। একটু পরে বোধ হয়, তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন,—"আমিতো মিথ্যা বলিয়াছি। মনোমোহন থিয়েটার কোথায় তাহাতো আমি জানি।" অমনি তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন,—"ওহে ভাই, শুন, শুন।" যুবকটীর নিকট দৌড়াইয়া

বন্ধুরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"This right hand shall work it all off. We will at least keep our honour unblemished."

গিয়া তিনি কহিলেন,—"মনোমোহন থিয়েটার কোথায় তাহা আমি জানি; কিন্তু, তোমাকে বলিব না। যাও।" যুবকটী ভাবিল,—"পাগল, না কী!" সেই যুবকটী পরে যখন সিটী কলেজে পড়িতে আসিল তখন দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, সেই পাগলই সিটী কলেজের প্রিন্সিপাল। এই বিরাট পুরুষ বাঙ্‌লাদেশের পঙ্গপাল ছাত্রদের চরিত্রে কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়া যাইতে পারেন নাই। সার আশুতোষ, প্রিন্সিপাল জে, আর, ব্যানার্জ্জি—ইঁহাদের মত মহাগুরুদের প্রভাবেও এদেশের ছাত্ররা সম্মোহিত হয় নাই। আমি সেই পঙ্গপাল ছাত্রদিগের মধ্যে পড়িয়া দুর্ব্বলচিত্ত ও চরিত্রহীন হইয়া গেলাম। তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তপস্যা-বিমুখ, শ্রমকাতর, বিলাসী হইয়া উঠিলাম। মনে বড় আফ্‌সোস্ রহিয়া গিয়াছে যে, প্রফেসর উইল্‌সন্ (Wilson) বা প্রফেসর সার উইলিয়ম হ্যামিল্‌টনের (Sir William Hamilton) মত একজন কর্ত্তব্যজ্ঞান-সম্পন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিতে পারিলাম না। এডেনবরা (Edinburgh) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পবিজ্ঞানের (Technology) বিংশবর্ষীয় প্রফেসর উইল্‌সন্ শিক্ষকতা করিবার মত দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হইয়া যেভাবে একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন তাহা আমাদের দেশের শিক্ষকের নিকট স্বপ্নেরও অগোচর। প্রফেসর উইল্‌সন্ তাঁহার লেক্‌চার নোট (Lecture note) তৈয়ারী করিবার জন্য এত খাটিতে শুরু করিলেন যে, অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। বাড়ীতে সারারাত

ধরিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন, লেকচার নোট লিখিতেন; সারাদিন কলেজে পড়াইতেন। অচিরেই বাতে তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিল, চক্ষু ফুলিয়া উঠিল। তখন নিরুপায় হইয়া নিজের বোনের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। রাশীকৃত পুস্তক পাঠ করিয়া বোনকে দিয়া লেকচার নোট লিখাইয়া লইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নিদ্রাহীনতায় ধরিল। মরফিয়া (Morphea) ইন্‌জেকৃশন চালাইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। কিন্তু, লেক্‌চার নোট তৈয়ারী করা ছাড়িলেন না। বিজ্ঞ প্রফেসর হিসাবে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। ফলে, কলাভবনের (School of Arts) শিক্ষকতা করিবার জন্য তাঁহার উপর অতিরিক্ত কার্য্যভার চাপান হইল। তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুকে এই সময়ে লিখিলেন,—"আমার কাফনের ভিতরে আর একটি পেরেক পুঁতিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি কোনও দিন প্রত্যূষে উঠিয়া শুনিতে পাও যে, আমি আর নাই তাহা হইলে বিস্মিত হইও না।"* ইহার পর শ্বাসযন্ত্র হইতে রক্ত ঝরিতে শুরু হইল। কিন্তু, পড়া ও পড়ান কোনটী থামিল না। সময় করিয়া লইয়া এই সময়ে আবার তিনি 'Five gateways of knowledge' এবং 'Life of Edward Forbes'—এই দুইখানি সুচিন্তিত বই লিখিয়া ফেলিলেন। নিদ্রাহীনতা, বাতের বেদনা ও শ্বাসযন্ত্র-নিসৃত রক্তবমন তাঁহাকে এমন কাতর

* "There is another nail put into my coffin. Don't be surprised if any morning you hear that I am gone."

করিয়া ফেলিল যে, তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তি ফুরাইয়া গেল। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছিলেন,—"পড়াইবার সময় যাহা একটু শান্তি পাই।" ("My painless moments are when lecturing.") বিশ্রামের জন্য তাঁহার বন্ধুরা পরামর্শ দিলে তিনি বলিলেন,—"কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিতে পারিব না। উহার চেয়ে বড় কিছুই নাই।" ("Duty seems to me the biggest word in the World.") ইহার পর শ্বাসযন্ত্র হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু, নিয়মিত কাজকর্ম্ম ছাড়িলেন না। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে একদিন তাঁহাকে কলেজ হইতে ফিরিয়া হামাগুড়ি দিয়া ঘরে ঢুকিতে হইল। জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গেল।

এই এডেনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন মহাপণ্ডিত প্রফেসর—সার উইলিয়ম হ্যামিল্‌টন ছাত্রদিগকে গভীর বিষয় জ্ঞানদান করিবার জন্য সারারাত্র বসিয়া তাঁহার লেক্‌চার নোট তৈয়ারী করিয়া লইতেন। একা এই দুরূহ কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার জীবন-চরিত লেখক ভিশ্‌ লিখিয়াছেন,—"প্রয়োজন হইলে সন্ধ্যা হইতে শুরু করিয়া পরের দিন নয়টা পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার লেক্‌চার নোট প্রস্তুত করিয়া লইতেন।"* এমন

* "On some occasions the subject of the lecture would prove less easily managed than on others, and then Sir William would be found writing as late as nine O'clock in the morning"—Veitch.

কর্ত্তব্যজ্ঞান-সম্পন্ন ও পরিশ্রমী শিক্ষকের সংস্পর্শে আমার জীবনে একবারও আসিতে পারিলাম না, সেইজন্য আমিও যেন খেই হারাইয়া শ্রমকাতর বিলাসী হইয়া গড়িয়া উঠিলাম। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যের প্রতি আকর্ষণ যাহা ছিল তাহাও যেন কমিয়া গেল। ফুটবল খেলায় কৃতিত্ব দেখাইয়া যে স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করা চলে সেই স্কুলের ছাত্র হইয়া আমি যেটুকু শিক্ষা ও সভ্যতা অর্জ্জন করিয়াছি সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে।

হঠাৎ একদিন বাবার নিকট হইতে একটা চিঠি পাইলাম। আমি কবে, কোন্ সময়ে বেশীক্ষণ জলে সাঁতার কাটিয়াছি, কবে কোথায় ফুটবল খেলিতে গিয়াছি, কখন মিথ্যা কথা বলিয়াছি—এইসবগুলিই সবিস্তারে লেখা। মনে হইল যেন ভূতের নিকট হইতে তিনি এইসব সংবাদ পাইয়াছেন। ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। বুঝিলাম, ঐ দানবমূর্ত্তি বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে কিছুই লুকাইয়া রাখিতে পারিব না। ভয়ে ভয়ে নিতান্ত ভাল ছেলেটার মত লেখাপড়ায় মনোযোগ দিলাম। কিন্তু, তাহাতেও ফল হইল উল্টারকমের। ছাত্রবন্ধুরা বলাবলি করিতে লাগিল আমি যুবরাজ উইলিয়মের মত একটা এক নম্বর ভ্যাবাগঙ্গারাম।* উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ছাত্ররা আমার চেয়ে

* "Prince William, the Silent was so gentle and conciliatory in his manners that his enemies even described him as timid and pusillanimous"—Motley—the historian of Netherlands.

একটু বেশী উচ্চ সব কাজেই। দেখিলাম, ইহাদের কাহারও চরিত্রবল নাই; মনের দুর্ব্বলতা তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদীতা, সাধুতা ও নৈতিক সৎসাহস,—এইসবগুলি হারাইয়া জাতিকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমিও সেই দলে মিশিয়া উঁহাদেরই মত একজন হইয়া গেলাম।*

প্রথম প্রথম কবিতা খুব বেশী পড়িতাম। কেননা, বাল্যকালের মন-কুসুম কবিতার ছন্দের দোলায় নাচে, যৌবনে মানুষের ভিতরে কবিতায় প্রেরণার সৃষ্টি করে, বার্দ্ধক্যে কবিতায় মানুষের মনে অনেক সুখ-স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।† বাঙ্‌লাভাষার কবিতার ভিতরে একটা উন্মাদনা পাইলাম। এদেশের মানুষকে জুজু-বুড়ীর ভয় দেখাইয়া কোণঠাশা করিয়া রাখিবার জন্য সকলেই বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, ইদানীং কবিতার সুর বদ্‌লাইয়া কবিরা আমাদিগকে ছন্নছাড়া, গৃহহীন করিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। কথাটা না হয় খুলিয়া বলিতেছি।—

---

* "Live with wolves and you will learn to howl"
—Proverb

"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ"—প্রবাদ।

"My best education was the example set by my brothers"—Sir Charles Bell.

† "Poets' verse slides into the current of our blood, we read them when young, we remember them when old. Words are the only things that last for ever"—Hazlitt.

শৈশবে ঠাকুরমা ও মায়ের কোলের ভিতর শুইয়া জুজু-বুড়ীর ভয়ে আড়ষ্ট হইতে হয়। দুষ্ট ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার এমন মন্ত্র এদেশের মা, ঠাকুরমা, পিসিমার আর একটাও জানা নাই। বাল্যকালে একটু বুদ্ধির খেলা দেখাইতে গেলেই আমরা গালি খাই—বেয়াড়া, বেহায়া, বেলেহাজ, বেতমিজ, বেয়াদব, বেয়কুফ, বেল্লিক,—আরও যদি কিছু 'বে' থাকে তবে তাহাও। রেলগাড়ীতে উঠিলে কলিশনের ভয়, বন্ধুদেব সহিত ঢলাঢলি করিয়া মিশিলে ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠরোগ—ইহাদের কবলে পড়িতে হইবে, রাস্তার ধুলার সহিত ক্ষয়রোগ ও যক্ষ্মরোগের জীবাণু উড়িয়া বেড়ায়; রাস্তায় বাহির হইলেই উহারা শরীরে ঢুকিবে। চাকুরী করিতে গেলে কেহ হয়ত হুইলের ফিতার সহিত জড়াইয়া পড়িবে, কেহ হয়ত ইঞ্জিনের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবে, কেহ হয়ত মফঃস্বল করিতে যাইয়া নৌকা ডুবিয়া মরিবে। মা বলিবেন,—"আমার সোনার যাদু, তোমার চাকুরী ক'রে কাজ নাই, তুমি বেঁচে থাক।" কলিকালে ঘরের বাহির হইলেই ফৌজদারি মকর্দ্দমার সাক্ষ্য দিতে দিতে প্রাণান্ত! উড়াজাহাজ চড়িয়া যে ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করা বা মরুভূমির বালুকার মধ্যে জীয়ন্ত প্রোথিত হওয়া অথবা সমুদ্রের লোনাজলে শুট্‌কি হওয়া—ইহার একটিও আমরা পছন্দ করি না। আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষের লোকেরা এপাড়া হইতে ওপাড়া রথে যাইয়া নাকি আকাশ ভ্রমণের মজা লুটিত। ঘোড়ার বলে তখন রথ চলিত, আর এখন সভ্যতার

যুগে তাহারই অনুকরণে হরস্-পাওয়ারে (Horse power) এরোপ্লেন আকাশে উঠিতেছে। সেইজন্য, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিবেন,—"এরোপ্লেন তো সেকেলে, উহাতে আর চড়িব কি? তাহার উপর আবার এত সব বিপদ!"

পৃথিবীর সর্ব্বত্র এইসব বিপদ দেখিয়া হয়ত জনক-কন্যা সীতার মত আমরাও জীবন্ত অবস্থায় পাতালপুরীতে ঘোরা-ফেরা করিতে যাইতে পারিতাম। কিন্তু, মুন্‌সী সাহেবের মুখে আজ্‌রাইলের কীর্ত্তির কথা শুনিয়া মাটির নীচে যাইবার কথা শুনিলেই দিলও কাঁপে, পাও কাঁপে। তেরখাদার হোসেন মিয়ার কবরের কাছে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে দুম্ দুম্ শব্দ হয়। নেক্কী বান্দা ছাড়া আর সকলেরই ঐ আজ্‌রাইলের মুগুরের গুতার চোটে চেঁচাইতে হইবে। হিন্দু বলিয়া আজ্‌রাইল যে কাহাকেও রেহাই দিবে তাহার তো কোন প্রমাণ নাই! শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইবার আগে পাতালে যাওয়াও আমাদের পক্ষে ভয়াবহ।

অতএব, আমরা আশৈশব জুজুর ভয়ে আড়ষ্ট। আমরা সকলেই ৺দ্বিজেন্দ্র লালের নন্দলাল হইয়া বাঁচিয়া আছি।*

"নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উল্‌টায় গাড়ীখানি;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ী চাপা-পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল,
সকলে বলিল—ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল।"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

উড়িয়া, পার্শী, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া মাটির মায়া কাটাইয়া এ দেশের গ্রামে, হাটে, মাঠে, ষ্টেশনে, মিলে, নৌকায় তাহাদের তাবেদারি ও এখ্‌তেয়ারি কায়েম করিয়া লইয়াছে। বাঙ্‌লাদেশের বড় বড় শহরে বাঙ্‌লা-ভাষায় কথা বলিলে চিংড়িমাছ আর ভেত-বাঙ্গালী বলিয়া গালি খাইতে হয়। 'কোন্ অতীতের দিনে ঈশা খাঁ লড়িয়াছিল মানসিংহের সঙ্গে, কোন বিস্মৃত যুগে বিজয়সিংহ সিংহল অভিযান করিয়াছিল বাঙ্গালী সেই স্মৃতি বুকে লইয়া চক্ষু বুজিয়া মায়ের বুক আকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে।* বাঙ্‌লার কবির চিত্ত সেইজন্য আর কোন যায়গায় গেলে ভরিত না—

"তবু ভরিল না চিত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সর্ব্বতীর্থসার
তাই, মা তোমার কাছে এসেছি আবার।" (৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

মাইকেলের মত শক্তিশালী লোকের মুখেও শুনিতে পাইয়াছিলাম—"রেখ মা দাসেরে মনে।" নজরুল, গোলাম মোস্তাফা আজ মায়ের স্নেহের বন্ধন শিথিল করিয়া, ছিন্ন করিয়া 'বিদ্রোহী বীর'এর† বেশে 'কলম্বসের মত, সেকেন্দরের মত দেশ বিদেশে ছুটিতে চাহিতেছেন।‡ তাঁহারা দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার নিশীথে লঙ্ঘন করিবার জন্য যাত্রিগণকে

---

* বাঙ্গালীর বীরত্ব—রজনীকান্ত গুপ্ত।

† 'বিদ্রোহী বীর'—অগ্নিবীণা—কাজি নজরুল ইস্লাম।

‡ 'কিশোর'—রক্তরাগ—কবি গোলাম মোস্তফা।

হুশিয়ার' করিয়া লইতেছেন। * কবীন্দ্রও বাঙ্‌লাদেশকে গরম গরম একচোট শুনাইয়া দিয়াছেন—

"সাত কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী!
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি
......দাও সবে গৃহহীন, লক্ষ্মীছাড়া করি।"

কাজি নজরুলের নিকট শিখিলাম—

"থাক্‌ব না আর বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে,
রইব না কো বদ্ধ খাঁচায়, দেখ্‌ব এসব ভুবন ঘুরে,
আকাশ বাতাস চন্দ্র তারায় সাগর জলে পাহাড় চূঁড়ে
আমরা সীমার বাঁধন টুটে দশদিকেতে পড়ব লুটে
পাতাল ফেড়ে নামব নীচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠায় পুরে।"

বুঝিতে পারিলাম যে, কবিদের এই প্রেরণা জাতীয় জীবনের মধ্যে আশার সঞ্চার করিতেছে। কবিতায় আমাকে পাইয়া বসিল। স্থির করিলাম যে, কবিতা ছাড়া আর কিছু পড়িব না।

আমার বন্ধুরা ছিল ৺শরৎ বাবুর যাদুমন্ত্রে দীক্ষিত। একদিন সুবিধামত একজন বলিয়া ফেলিল,—"তুমি কবিতার ভিতরে যেমন প্রেরণা পাও, শরৎ বাবুর বইতে তার চেয়েও

* "দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার"—নজরুল ইস্‌লাম

বেশী প্রেরণা পাইবে।” বন্ধুটী সেইদিনই ‘শ্রীকান্ত-দ্বিতীয় পর্ব্ব’টী আমার টেবিলে রাখিয়া গেল। পুস্তকখানা খুলিতেই চোখে পড়িল—বর্ম্মামুলুকে শ্রীকান্ত দাদাঠাকুরের হোটেলে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল তাহার বর্ণনা। শ্রীকান্ত বলিতেছে,—“বাঙ্গালাদেশে জাতিভেদের শৃঙ্খল দুইপায়ে পরিয়া ঝম্‌ঝম্ করিয়া বিচরণ করার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল নাই। যাঁহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং ইহার শাসনপাশ ছিন্ন করিবার দুরূহতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই—তাঁহারা একটা ভুল জিনিষ জানিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ, যে কোন দেশে খাওয়া ছোঁওয়ার বাদ বিচার প্রচলিত নাই তেমন দেশে পা দেওয়া মাত্রেই বেশ দেখিতে পাওয়া যায়—এই ছাপ্পান্ন পুরুষের খাওয়া ছোঁওয়ার শেকল কি করিয়া না জানি রাতারাতি খসিয়া গিয়াছে।”

এইটুকু পড়িয়া ভাবিলাম,—৺শরৎ বাবুকে এতদিন ভয় করিয়াছিলাম; কৈ ভয়ের তো কিছু নাই! বাবা আমাকে উপন্যাস পড়িতে নিষেধ করিতেন, ৺শরৎ বাবুর পুস্তক সব সময়ে পরিত্যাগ করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু, সমাজ-সংস্কারের জন্য ৺শরৎ বাবুর শ্রীকান্তে তো চমৎকার উপদেশ রহিয়াছে! স্থির করিলাম,—৺শরৎ বাবুর শ্রীকান্ত পড়িয়া দেখিব। ‘শ্রীকান্ত—প্রথম পর্ব্ব’ না পড়িয়া

'দ্বিতীয় পর্ব্ব' পড়িলে ক্রম বজায় থাকিবে না বিবেচনা করিয়া একখানা 'শ্রীকান্ত—প্রথম পর্ব্ব' যোগাড় করিয়া লইলাম। বড় মধুর লাগিল। ইন্দ্রের সহিত শ্রীকান্ত যেদিন জেলেদের মাছ চুরি করিয়া আনিল, মনে হইল যেন, আমিও সেদিন তাহাদের সঙ্গে ছিলাম। দেখিলাম,—মনের গভীর কোণে প্রবিষ্ট হইয়া মানুষের ভাবধারাকে ঠেলিয়া আনিয়া মনের ভিতরে জোয়ার সৃষ্টি করিবার যে অতুলনীয় ক্ষমতা শরৎ বাবুর ছিল তাঁহার তুলনা জগতে মিলে না। শরৎ বাবুর পুস্তক পাঠ করিবার পরে কবিতা আর ভাল লাগিল না, জীবনচরিত পড়িতেও স্বাদ পাইলাম না। পাইড্ পাইপার অফ্ হেমিলিনের মত শরৎ বাবু আমাকে অল্পকাল মধ্যেই সম্মোহিত করিয়া কোথায় যেন লইয়া চলিলেন।* 'শ্রীকান্ত—প্রথম পর্ব্ব' শেষ করিয়া 'দ্বিতীয় পর্ব্ব' গোড়া হইতে ধরিলাম। শ্রীকান্তের প্রতি এইবার রাগ হইল,—বেটা, একেবারে চরিত্রহীন হইয়া গোল্লায় গিয়াছে!

* হেমিলিন শহরে একবার ইন্দুরের খুব ভয়াবহ উৎপাত হইয়াছিল। ইন্দুরের ভয়ে মানুষকে পর্য্যন্ত পলাইতে হইত। শহরের লোকেরা কোনও প্রকারে উহাদের উৎপাত হইতে বাঁচিবার উপায় করিতে পারিতেছিল না। এই সময়ে বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র পরিহিত একজন বংশীবাদক (Pied piper) আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি ইন্দুরের উৎপাত হইতে শহরবাসীকে বাঁচাইতে পারেন। তাঁহার সহিত চুক্তি হইল—একহাজার মুদ্রার বিনিময়ে তিনি ঐ কাজ করিবেন। তিনি তাঁহার বাঁশী বাজাইলেন। বাঁশীর সুরে ইন্দুরেরা মাতিয়া উঠিল,

অভয়াম কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। নিজের দুইকান নিজে মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম,—আর শরৎবাবুর বই পড়িব না। কিন্তু, শরৎবাবুর প্রতিভা যে অক্টোপাসের (Octopus) মত ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বুঝিতেও পারিলাম না। চেষ্টা করিয়াও সেই অক্টোপাসের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম না। শরৎ বাবুর যাদুদণ্ডের স্পর্শে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলাম। একে একে অল্পকাল মধ্যে তাঁহার উপন্যাসরাজি প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিলাম। 'চরিত্রহীন' যেদিন পড়িতে বসিলাম সে দিন খাওয়া দাওয়া ভুলিয়া গেলাম। পাঠ্যপুস্তক কোথায় ফেলিয়া রাখিলাম তাহার খোঁজও রহিল না। মজিলাম, মাতিলাম,—রাত্রি দুইটার সময়ে শেষ করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘুম আসিল না। চোখের সম্মুখে ভাসিল কলিকাতার মেসের নোংরা চিত্র,—মাথা ঘুরিল—পঙ্কিল

বংশীবাদকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তিনি নদীর ভিতরে ফেলিয়া সব ইন্দুরকে ডুবাইয়া মারিলেন। ফিরিয়া আসিয়া মুদ্রা দাবী করিলে শহরের মেয়র বলিলেন,—"ইন্দুরতো সব মরিয়া গিয়াছে, তোমাকে আর এখন অর্থ দিব কেন? যাহা হউক, এই পঞ্চাশটী মুদ্রা লইয়া বিদায় হও।" বংশীবাদক চটিয়া গেলেন। আবার তাঁহার বাঁশীতে সুর যোজনা করিলেন। শহরের সমস্ত শিশু নাচিতে নাচিতে তাঁহার পিছনে ছুটিল। সকলে নির্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন, কাহারও বাধা দিবার ক্ষমতা রহিল না।—একবার।

আবর্ত্তে পাক খাইতে লাগিলাম। দারুণ উত্তেজনার সহিত যুদ্ধ করিয়া সারারাত্রি কাটাইলাম।

পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত একখানা বাঙ্‌লা সিলেক্‌শন খুলিলাম। কবীন্দ্রের প্রতিভা কতখানি তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার "কাব্যের উপেক্ষিতা" বাঙ্‌লা সিলেক্‌শনে স্থান পাইয়াছে। কর্ত্তারা তাঁহার প্রতিভা আর কোথাও খুঁজিয়া পান নাই।

প্রথম উপেক্ষিতা—উর্ম্মিলা। কবীন্দ্র বলিতেছেন,—"সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকাসোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভ-সময় সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নত দৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন—যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচির প্রণয়ালোকবঞ্চিত হৃদয়ে কি সেই নবীনতা ছিল?"—পড়িয়া আমার হৃদয়ের বিকাসোন্মুখ নবীনতা পাছে শুকাইয়া যায় সেই ভয়ে প্রথমতম মধুরতম প্রণয়ালোকের জন্য হৃদয়টী উন্মুক্ত করিয়া দিলাম।

ইহার পরে দুইজন 'উপেক্ষিতা'—অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার কথা কবীন্দ্র বলিতেছেন,—শকুন্তলা দুষ্যন্তের সহিত চলিয়া গিয়াছেন। "এখন হইতে অপরাহ্নে আলবালে জল সেচন করিতে কি প্রিয়ংবদা ও অনুসূয়া মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্ম্মরে সচকিত হইয়া অশোক তরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোন আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না?"

আমি ভাবিলাম—আশঙ্কা কেন? খুবই আকাঙ্ক্ষা করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আমারও আকাঙ্ক্ষা জাগিল। অগত্যা পাঠ্য-পুস্তক পাঠ করিতে বিস্মৃত হইলাম, কোন আগন্তুকের আসিবার সম্ভাবনা আছে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—"গোলকচন্দ্রের আর্টজ্ঞান নাই।" আমি বলিব—এ অবস্থায় পড়িলে কাহারও আর্টজ্ঞান থাকে না। স্বাভাবিক নিয়মকে যাঁহারা অস্বীকার করেন তাঁহারা মিথ্যাবাদী। কবীন্দ্র ঐ অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার কথাই বলিতেছেন,—"হায় তাহারা জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না, তাহা জানিয়াছে।" ...।ও যাহা ভাবিতাম না, কবীন্দ্রের দৌলতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

তারপরে আসিল 'কাদম্বরী' কাব্যের 'পত্রলেখা'। কবীন্দ্রের মতে সে-ই সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিতা। যুবরাজ চন্দ্রাপীড় অধ্যয়ন শেষ করিয়া বাড়ী আসিলেন। তাঁহার মাতা বিলাসবতী একটি অনতিযৌবনা কন্যা চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়া জানাইলেন যে, সেই কন্যা পরাজিত 'কুলুতেশ্বরের দুহিতা—নাম পত্রলেখা, উহাকে পরিচারিকার কার্য্যের জন্য যেন নিযুক্ত না করা হয়। বালিকার মত লালন পালন করিতে হইবে, শিষ্যার ন্যায় দেখিতে হইবে, সুহৃদের ন্যায় অভ্যন্তরে লইতে হইবে কিন্তু, চিত্তবৃত্তির চাপল্য হইতে উহাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে হইবে। চন্দ্রাপীড় বলিলেন,—"অম্বা যেমন 'আজ্ঞা' করিলেন তাহাই হইবে।" পরে

চন্দ্রাপীড় অন্য এক কুমারী—কাদম্বরীকে বিবাহ করিলেন। দম্পতিযুগল যে শিবিরে শয়ন করিতেন, পত্রলেখাও সেই শিবিরে শয়ন করিত। কবীন্দ্র পত্রলেখার এই প্রকার দুঃখে দুঃখিত হইলেন। তিনি বলিয়াছেন,—"পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনীও নহে, কিঙ্করীও নহে, পুরুষের সহচরী। এই প্রকার অপরূপ সখীত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী একটি বালুতটের মত—কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়? নবযৌবন কুমার-কুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক হইতেই এই সঙ্কীর্ণ বাঁধটুকুকে ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন? ....প্রেমের উচ্ছ্বসিত অমৃত পান তাহারই সম্মুখে চলিতেছে। ঘ্রাণেও কি একটা শিরার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে নাই? ....রাজপুত্রের তপ্তযৌবনের তাপটুকুমাত্র কি তাহাকে স্পর্শ করে নাই?" কবীন্দ্রের প্রেমের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আমার সম্মুখে উন্মাদনা লইয়া নাচিয়া উঠিল। ভাবিলাম,—অনেক স্কুল কলেজে ও নামকরা প্রতিষ্ঠানে তো কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে! সেইসব স্থানে যে কী প্রকারে দুই সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ বালুতট ধুইয়া মুছিয়া যাইতেছে না তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার তপ্ত-যৌবন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল—প্রেমের ঘ্রাণে শিরার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। ইহার পরেই পতন ও মূর্চ্ছা।

প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, আমার পার্শ্বে বিছানার উপর

বইখানি পড়িয়া আছে। ভূমিকার পাতা খোলা রহিয়াছে। ৺সার আশুতোষকে উদ্দেশ করিয়া লেখা রহিয়াছে—"পরম পরিতাপের বিষয় যে যাঁহার ইচ্ছায় এই সঙ্কলনকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল আমরা তাঁহাকে ইহা দেখাইতে পারিলাম না।" ভাবিলাম, সেই ব্যাঘ্রমূর্ত্তি বিরাট পুরুষকে এই পুস্তক দেখাইলে তিনি উহা পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতেন।

সেইদিন বিকালের ডাকে বাবার লিখিত একখানা চিঠি পাইলাম। চিঠিখানা খুলিতেছি এমন সময়ে একজন বন্ধু আসিয়া বলিল,—"তোমার বাবা গোপনে গোপনে তোমার সম্বন্ধে সমস্ত খবর রাখিতেছেন। এই ক্ষুদ্র শহরে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্য হইতে পাঁচ ছয় জন গুপ্তচর অনবরত তোমার সম্বন্ধে সমস্ত খবরাখবর তাঁহাকে লিখিয়া জানাইতেছে।" এইবার বুঝিলাম, বাবার নিকট কোন্ ভূতে খবর পাঠাইতেছিল। এমন সাবধান, এত যত্নশীল বাবা, তাঁহাকে আমি জীবনে শান্তি দিতে পারিলাম না, মানুষ হইলাম না, সেই দুঃখইতো আজ মর্মে কাঁটার মত বিঁধিতেছে।

যাহা হউক, চিঠিটা খুলিলাম। সাত পাতা লম্বা চিঠি। এই চিঠিতে এমন অনেক কিছু আছে যাহা অপ্রকাশিত থাকিলে অনেক কিছুই বাঙ্গালী-সমাজে অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। সেইজন্য, চিঠিটা অবিকল নকল করিয়া বলিতেছি।—

"স্নেহের হরি,

আমি জানিতে পারিলাম যে, তুমি উপন্যাস পড়িতে শুরু

করিয়াছি। আমি একদিন তোমার হাত হইতে উপন্যাস ছিনাইয়া লইয়াছিলাম, জোরে পড়িবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলাম—যাহাতে তুমি আর চুপে চুপে উপন্যাস পড়িতে না পার। আজ আমি তোমার নিকট হইতে অনেক দূরে, তাই বলিয়া মনে করিও না যে তোমার খবর আমি রাখি না। আমার মনে হয় যে—উপন্যাস পড়িও না—শুধু এইটুকু বলিলে তুমি আমার হুকুম মানিয়া চলিবে না। সেইজন্য, সব কথা তোমাকে আজ বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি। সম্ভবতঃ, একথাগুলি তোমাকে আরও আগে বলা উচিত ছিল। জানি না, তুমি কতখানি ডুবিয়াছ।

"উপন্যাস পড়িও না। কেননা, উপন্যাস আমাদের দেশের সাহিত্যিকেরা সৃষ্টি করিতে জানেন না। রাশিয়ার তুর্গেনিভের 'ভার্জ্জিন সয়েল' (Virgin Soil—Turgeniv) ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' এবং 'আদার ফায়ার্স' ('Mother,' 'Other Fires'—Maxim Gorky)—এই উপন্যাসগুলি জাতীয়-জীবনের উৎস, রুশীয়দের নিকট এগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রের চেয়েও বেশী পূজনীয়। জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 'বার্ণার্ড শ' (Barnard Shaw) যে উপন্যাসরাজি সৃষ্টি করিয়াছেন সেগুলিও বিলাতের লোকদের জাতীয়-জীবনে কতপ্রকার প্রেরণা জাগাইতেছে। এইসব উপন্যাসের মত উপন্যাস যেদিন এদেশে লিখিত হইবে সেইদিন উপন্যাস পড়িও। তাহার আগে পড়িও না।

"সাহিত্য জাতীয়-জীবনধারার উৎস। সেই উৎসে জাতি স্নাত হইয়া নিষ্কলুষ হয়, পবিত্র হয়। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে; জাতীয়-চরিত্র গড়িয়া উঠে। জাতিকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতে, জাতীয়-জীবনে উন্মাদনা আনিতে, বিশৃঙ্খল জাতিকে সত্যের ও শক্তির পথে সংহত করিতে সাহিত্যের ক্ষমতা অপরিসীম, সাহিত্যের আসন সর্ব্বোচ্চস্থানে। যোদ্ধা মুসোলীনি যাহা করিতে না পারিয়াছেন, সাংবাদিক ও বক্তা মুসোলীনি তাহা করিতে পারিয়াছেন। পঙ্গু ও ভগ্ন-আশা ইটালীকে কলমের আঘাতে সংহত করিয়া লইয়া চৌদ্দ বৎসরের মধ্যেই মুসোলীনি সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেন। ("On the 9th day of the 14th Era of the Fascist movement Mussolini founded the Roman Empire")। জাতিকে শক্তিশালী করিতে তরবারীর চেয়ে লেখনীর ক্ষমতা বেশী। ("The Pen is mightier than the Sword") মহাজনদিগের জীবনচরিত এবং প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর ইতিহাস—এইগুলিই ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ, জাতীয়-জীবনের প্রেরণা। আমাদের দেশের শক্তিশালী লেখনীগুলি এইদিকে পরিচালিত হয় নাই, সেইজন্যই আমরা অপদার্থ।

"বাইবেল, কোরাণশরীফ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ—এগুলি সবই মহাজনদিগের জীবনচরিত অথবা প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর ইতিহাস। এগুলিতে রাজা, প্রজা; বীর, ভীরু;

সাধু, অসাধু—ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার মানুষের জীবনচরিত লিখিত আছে; উহাদের সাধুতার ও বীরত্বের পুরস্কার, অসাধুতা ও ভুলের শাস্তি প্রভৃতি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সেইজন্যইতো ঐ মহাগ্রন্থগুলি মানব-জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস, প্রেরণার সর্ব্বপ্রধান উৎস, অজ্ঞ মানবের পথ-প্রদর্শক, বিপথগামী মানবের দানবমূর্ত্তি শাসক। ঐসমস্ত পুস্তক যে যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে সেই সেই ভাষা হইতে ভাষান্তরিত করিয়া লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এইসব পুস্তকে ভুলের জন্য, চরিত্রহীনতা ও পাপের জন্য যে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয় তাহা দেখানু হইয়াছে। ভুল করিয়া চরিত্রহীন হইলে সে ভুলের কোনও প্রায়শ্চিত্ত ইহকালেও নাই, পরকালেও নাই।

"কিন্তু, বাঙ্‌লাদেশের উপন্যাসক্ষেত্রে বড় ভয়াবহ উল্টা ঝড় বহিতেছে। বাঙ্‌লাদেশের উপন্যাস যাঁহারা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা মানসিক বিকারগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে, পাপীর জন্য, চরিত্রহীনের জন্য অতখানি সহানুভূতি, অতখানি দরদ দেখাইবার কী কারণ থাকিতে পারে তাহা জানি না। পুরুষমানুষ ভুল করিয়া চরিত্রহীন হইয়াও সমাজে বাস করিবে আর মেয়েলোক ভুল করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইতেছে—এই নীতি ইঁহারা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সহ্য করিতে না পারাটা ভাল কথা। মেয়েলোক ভুল করিয়া যেমন গোল্লায় যায়, পুরুষ মানুষ ভুল করিলেও

ঠিক তেমনি তাহাকে জাহান্নমে পাঠাইতে হইবে। সমাজে উহাদের কাহারও স্থান নাই। নরকের কীটগুলি নরকের পঙ্কিল আবর্ত্তে বাস করিবে—উহাদের সন্তানাদি হইবে নরকের কীট—তাহারা আলাহেদা সমাজ গড়িয়া লইবে। উহাদের ভুলের জন্য ক্ষমা করা, সহানুভূতি দেখান পাপ। উহাদিগকে সমাজের শাসনে এমন শাস্তি দিতে হইবে যে, আর দশজনে দেখিয়া শিহরিয়া উঠে। সভ্য ও নিষ্কলুষ সমাজকে কলুষিত করিবার উহাদের কাহারও অধিকার থাকিবে না।—ইহাই নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত। (Moral Ethics, Psychology, Holy Scriptures)। কিন্তু, উপন্যাস লেখকেরা উল্টাভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"পুরুষ ডুবিলেও যখন হাত ধরিয়া তুলিয়া লই, তখন মেয়েলোক ডুবিলেও উহাকে তুলিয়া লইব।" এই ধারণা প্রথম বাঙ্গালীদের মগজে ঢুকাইয়াছেন ৺শরৎ বাবু। অমনি সাহিত্যিকেরা চারিদিকে নাচিয়া উঠিলেন। যে সব নারী সতীত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাদের ভুলটাকে ইঁহারা ছোট করিয়া দেখিতেছেন—ক্ষমা করিতে বলিতেছেন! হজরত ওমরের পুত্র ভুল করিল, পিটাইয়া হত্যা করিয়া তাহার শাস্তি দেওয়া হইল। ৺বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' রোহিণী ভুল করিল—জীবনদান করিয়া সে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিল। গোবিন্দলালের ভুলের জন্য, সে নিজে জ্বলিল, পুড়িল, দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ঐ প্রকার শাস্তি-ই তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত।

গোবিন্দলালকে যদি ভ্রমরের সহিত পুনর্ব্বার মিশিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে, ভ্রমর আরও বেশী জ্বলিত, পুড়িত, তাহাদের বংশধরেরা সব হইত জাতির কলঙ্ক। কলুষিত পুরুষ বা মেয়েকে সমাজে তুলিলে সমাজ শ্রীহীন হইয়া যায়, জাতির অস্থিমজ্জা কলুষিত হইয়া উঠে। সতীত্ব হারাইয়া যে নারী মানসিক বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া গিয়াছে তাহার সন্তানাদিও মানসিক বিকারগ্রস্ত ও দুর্ব্বলচিত্ত হইবে।* মা বাপের কোনও প্রকার শারীরিক ব্যাধি থাকিলে সন্তানাদির ভিতরে সেটা যেমন সংক্রামিত হয়, ঠিক তেমনি করিয়া মা বাপের মানসিক ব্যাধিগুলিও সন্তানে বর্ত্তে। শারীরিক ব্যাধিতে যেমন অনেক সময়ে দাগ রাখিয়া যায়, মানসিক ব্যাধিতেও তেমনি দাগ রাখিয়া যায়। উহা অপসারিত করিয়া মনকে নিষ্কলুষ করিবার কোনও উপায় নাই। সেইজন্য, একবার ভুল করিয়া যে চরিত্র হারাইয়াছে তাহার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। পাগল মা বা বাপের সন্তান

*"Where she is debased, Society is debased, where she is morally pure and enlightened, Society will be proportionately elevated"—Smiles' Character.

"Nations are but the outcomes of Homes ; Peoples of Mothers"—Hitler.

"Whilst the virus of depravity exists in one part of the body-politic, no other part can remain healthy" —Social Statics.

পাগল হয়, চরিত্রহীন মা বা বাপের সন্তান চরিত্রহীন হইবে—মনোবিজ্ঞান ও সুজাতশাস্ত্রের (Psychology and Eugenics) এই তত্ত্বকথা আধুনিক উপন্যাস লেখকেরা মানেন না।

"কেহ কেহ বলেন যে, শরৎ বাবু তাঁহার নিপুণ তুলিকার স্পর্শে এদেশের মানুষের প্রকৃত চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যদি তাই হয় তাহা হইলে, মিস মেয়ো তাহার 'মাদার ইণ্ডিয়া' লিখিয়া কোনও দোষ করে নাই।

"আবার কেহ কেহ বলেন যে, কলুষিতা ও চরিত্রহীনতার ছবিও মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করা প্রয়োজন। কেননা, উহা হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে। যাঁহারা এমন কথা বলেন তাঁহাদিগকে সোজা পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতে হয়—যাও, পঙ্কের দুর্গন্ধ কেমন তাহা জানিবার জন্য পঙ্কিল আবর্ত্তে ডুবিয়া শিখিয়া আইস। আরও কতকগুলি নির্ব্বোধ আছে—তাহারা বলে যে, জাতিকে জাগাইতে হইলে কতকগুলি চরিত্রহীন মানুষেরও প্রয়োজন। যুধিষ্ঠিরকে দিয়া 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলাইয়া না হয় সাময়িকভাবে পাণ্ডবেরা কার্য্য সমাধা করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু, জুয়াচুরি ও মিথ্যা অভিনয় করিবার জন্য সত্য সত্যই কতকগুলি চরিত্রহীন মানুষের একান্ত প্রয়োজন। পেপিনের জারজ পুত্র চার্ল্‌স্ মার্টেল না থাকিলে বোধ হয়, বীর্য্যবান ধর্ম্মপরায়ণ সারাসেন জাতিকে

ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করা সহজ হইত না।* অতএব, দুই-দশজনকে চরিত্রহীন করিবার জন্য উপন্যাসের প্রয়োজন, বড় বড় নামজাদা ঘরে দুই একটি জারজ সন্তানের জন্ম হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এইপ্রকার মন্তব্য যাহারা করিতে পারে সেই নরকের কীটগুলিকেও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত।†

"এগুলিতো গেল এদেশের উপন্যাসে যেভাবে চরিত্রসৃষ্টি হইয়াছে তাহার কথা। ঐ পঙ্কিল বিষয়ের আলোচনা করিয়া এদেশের যে কী প্রকার সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। ৺শরৎ বাবু ধূমকেতুর মত বাঙলা সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার সম্মুখে অন্যান্য সাহিত্যিকদের প্রতিভা ম্লান হইয়া গেল। জাতির ভাবধারার উৎস—নিভৃত-চিন্তা, নিশীথ-চিন্তা, কর্ম্মযোগ, ভক্তি-যোগ, গীতাঞ্জলি, চরিতাভিধান, কোরাণের আলো, বিষাদসিন্ধু, স্পেনবিজয়কাব্য, কেশবসেন ও বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী—সব শুকাইয়া গেল, আর উদ্দাম জোয়ারের স্রোতে ভাসিয়া আসিল—গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, চরিত্রহীন, যেদিন ফুটল

*"But for the amours of Pepin, the Saracens might have overrun Europe, as it was his illegitimate son—Charles Martil, who overthrew them at Tours, and eventually drove them out of France"—Piscal.

†"Great evils in some cases are only to be met with resistance, they cannot be wept down but must be battled down"—Smiles.

কমল, অকাল বসন্ত, দোটানা। গৃহদাহে কেবল মহিমের অন্তর ও গৃহ দাহ করে নাই, মায়ের হৃদয় দাহ করিতেছে—যে মা 'ফুটল কমল' পাঠ করিবে তাহার পেটের সন্তান বিষফুল হইয়া প্রস্ফুটিত হইবে। নেপোলিয়ানের মা পড়িতেন যুদ্ধের ইতিহাস—আমাদের মায়েরা পড়িতেছেন—চরিত্রহীন, দোটানা। যাহারা উপন্যাস পড়িবে তাহাদের মগজে ও মনে চরিত্রহীনতার পঙ্কিল দাগ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে। কেননা, কোনপ্রকার কাজ বা চিন্তা উহার দাগ না রাখিয়া যায় না। যিনি উপন্যাস পড়িয়া বড়াই করিয়া বলিবেন—"আমার চরিত্রহানি ঘটে নাই, কোন ক্ষতিও হয় নাই"—তিনি জানেন না যে পুরুষানুক্রমে উঁহার বিষফুল প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। কলুষিত চরিত্রের সমালোচনা, খারাব ও অন্যায় কর্ম্মের আলোচনা যে বাড়ীতে, যে পরিবারে বা যে দেশে হয়, সে বাড়ীর, সেই পরিবারের বা সেই দেশের মানুষের রক্তের ধারার ভিতর দিয়া পুরুষানুক্রমে সন্তানাদির ভিতর চরিত্রহীনতা ফুটিয়া উঠে।* উপন্যাস পড়িও না, পড়িলে নিজেও ডুবিবে, বংশকেও ডুবাইবে।

"তোমার নিকট খোলাখুলিভাবে এগুলি লেখা উচিত হইল কি না তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে

*"The conversation of such persons is very injurious, for even if it does no immediate harm, it leaves its seeds in the mind and follows us when we have gone from the speakers—a plague sure to spring up in future resurrection"—Seneca.

পারিতেছি না। তবে এইটুকু বুঝি যে, সময়মত সব বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া মা বাপের কর্ত্তব্য। ইহার পরেও যদি তুমি ডোব বা মর তাহা হইলে আমার কোনও দোষ থাকিবে না। অনেক মা-বাপ এইগুলি সময়মত বুঝাইয়া না দিয়া বিপদে পড়িয়াছেন তাহা আমি জানি।

"এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার—উপন্যাস পড়িব না, তবে পড়িব কী? শুইয়া শুইয়া দিন কাটাইব?" কখনই না। আলস্য সব সময়ে পরিহার করিয়া চলিবে, নিষ্কর্ম্মা মানুষের মনে সব সময়ে দুশ্চিন্তা ও কুভাব আসিয়া বাসা বাঁধে, মনকে উপযুক্ত খোরাকের যোগাড় করিয়া না দিলে মন নিজেকে চিবাইয়া খাইয়া ফেলে, মনের সবচেয়ে ভাল খোরাক মহাপুরুষদের জীবনী ও ভাল ভাল কবিতা।* খারাব বই কখনও পাঠ করিও না। বিজ্ঞান ও দর্শনসম্বন্ধীয় আধুনিক পুস্তক পড়িবে, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের পুরান প্রবন্ধাদি ও পুস্তকাবলী পাঠ করিবে। কবিতা ও মহাজনদিগের বক্তৃতা

---

* "Be not solitary, be not idle"—Burton.
"Let every man be occupied"—Sydney Smith.
"Never be doing nothing"—Sir Walter Scott.
"Idle brain is Devil's workshop"—Proverb.
"Idleness is the Devil's Snare for the small and great"
—Caroline Perthes.
"Nothing is so injurious as unoccupied time"
—Dr. Marshall Hall.

মানুষের ভিতরে প্রেরণার সৃষ্টি করে, মানুষের কাজ করিবার ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।† অতএব, ঐগুলি বেশী করিয়া পড়িবে। প্লেটো বলিয়াছেন যে বালক বালিকারা অনুকরণপ্রিয়, নাটক নভেলের নায়ক নায়িকাগণকে বালকবালিকারা স্বতঃই অনুকরণ করিতে উৎসুক হইয়া উঠে। উহার ফলে চরিত্র নষ্ট হয়। যে সমস্ত সাহিত্যে বীরত্বব্যঞ্জক কিছুই নাই, যাহাতে কেবল ক্রন্দন, ভয়, বিচ্ছেদ ও উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি প্লেটো ঐসব সাহিত্য বাজেয়াফ্ত্ করিবার পক্ষপাতী। কেননা, উহারা জাতির অস্থিমজ্জা চিবাইয়া খায়।

"আমি আগেই একবার বলিয়াছি যে, পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি সবই মহাজনদিগের জীবনচরিত এবং প্রসিদ্ধ

"Idleness is the bane of body and mind, the nurse of naughtiness, the chief mother of all mischief, one of the seven deadly sins, the Devil's Cushion, his pillow and reposal"—Johnson.

"The human heart is like a mill-stone, if you put wheat under it, it grinds the wheat into flour, if you put no wheat it grinds on but then it is itself it wears away"
—Archbishop of Meyance.

†"Be sure to read no mean books"—Emerson.

"In Science read by preference the newest books, in literature the oldest"—Lord Lytton.

"Demosthenes was so fired on one occasion by the eloquence of Callistratus that the ambition was roused within him of becoming an orator himself"—Smiles.

ঘটনাবলীর ইতিহাস। সেইজন্য, উহারা যুগে যুগে, দেশে দেশে মানুষের মনে প্রেরণা জাগাইতেছে।

"মহাজনদিগের মনের উচ্ছ্বাস, লালসা, ভালবাসা, বিরহ, বিচ্ছেদ প্রভৃতি ফুটাইয়া তুলিয়া যদি তাঁহাদের জীবনচরিত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদ্বারা লিখিত হয় তাহা হইলে, উহাতে যে দেশের কত উপকার করে তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ প্লুটার্কের লিখিত চরিতাভিধান ('Lives'—Plutarch.)।

"এক হাজার নয়শত বৎসর পূর্ব্বে প্লুটার্ক এই চরিতাভিধানখানি লিখিয়া গিয়াছেন। উহাতে টিমলিয়ন (Timoleon), সীজার (Cæsar), ব্রুটাস (Brutus), সেকেন্দর (Alexander) প্রভৃতি মহামনীষীদের উচ্ছ্বাস, ভালবাসা, সাহস প্রভৃতি ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। প্লুটার্কের লিখিত এই চরিতাভিধানখানি যুগে যুগে ইউরোপকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। ইউরোপের জাতিসমূহ যে এত পরাক্রান্ত ও তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে বোধ করি, ঐ একখানামাত্র পুস্তক। মহাপুরুষ আলফিরি (Alfieri) ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমি এই চরিতাবলী বহুবার পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছি, মাঝে মাঝে আমার সত্তা হারাইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছি।"* নেপোলিয়ন, শিলার

* "I read the Lives of Timoleon, Cæser, Brutus, Pelopidas, more than six times, with cries, with tears and with such transports that I was almost furious"—Alfieri.

(Schiller), বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন—ইঁহারা চরিতাভিধানখানি পড়িয়া যে নিজদিগকে তৈয়ারী করিয়াছেন তাহা তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন। মুসোলীনি আজ সীজারের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে যাইতেছেন। প্লুটার্কের চরিতাভিধান হইতে তিনি সেই উম্মাদনা পাইয়াছেন। ইতিহাস মানুষ ও জাতির চরিত্রচিত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। সেইজন্য, ইতিহাস মানুষের মনে অত প্রেরণা জাগাইয়া দেয়।* কার্‌লাইল বলিয়াছেন,—"সাহিত্যে আর কিছু চাই না—শুধু চাই মহাজনদিগের জীবনী।"† স্মাইল্‌স্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, "যদি পৃথিবীর পাঠকদিগের নিকট হইতে ভোট গ্রহণ করা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে, প্লুটার্কের চরিতাভিধান সবচেয়ে বেশী ভোট পাইত।"‡

"চরিতাভিধান লিখিবার মত উপাদান এদেশে কম নাই। রামমোহন রায়, গোখেল, আশুতোষ, মোহাম্মদ আলী—ইঁহাদের মনের উচ্ছ্বাস ও নৈতিক সৎসাহস ফুটাইয়া তুলিবার

* "History infuse infinite aspirations into man."
—Emerson.

† "Biography of greatmen is almost the one thing needful."—Carlyle.

‡ "If it were possible to poll the great body of readers in all ages whose minds have been influenced and directed by books, it is probable that—excepting always the Bible—the immense majority of votes would be cast in favour of Plutarch."—Smiles.

কেই নাই ! স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো (Chicago) লেক্‌চার শুনিবার জন্য দেশ বিদেশের শত শত সুশিক্ষিত লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন ("We want to hear from Swamiji more")। কিন্তু, আমাদের দেশের যুবকেরা যেন ঐ প্রকার বক্তৃতাবলীতে কোন রসই পাইতেছে না! মতিলাল নেহরুর 'নেহরু রিপোর্ট' কংগ্রেসে পাস হইয়া যাইবার ফলে ভারতে স্বায়ত্তশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী মওলানা মোহাম্মদ আলী জওয়াহেরলালজীকে বলিতে চাহিয়াছিলেন,—"তুমি মতিলালের সন্তান না হইয়া তাঁহার বংশে বিড়াল হইয়া জন্মিলে ভাল হইত।"* এই মোহাম্মদ আলী গোলটেবিল বৈঠকে বলিয়াছিলেন, "স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হাতে না লইয়া আমি পরাধীন ভারতে ফিরিব না।"† ইহার পরে

* "I do not believe in the attainment of Dominion Status. The one thing to which I am committed is Complete Independence. In 1928, in the Convention of All Parties, the adoption of the Nehru Report Constitution was moved, the very first clause of which was about Dominion Status. Even my old Secretary, Pandit Jawaharlal Nehru, the President of the Congress to-day, was kept down by his father. There is a Persian Proverb which says, "Be a dog, do not be a younger brother." In the case of Jawaharlal I would say "Be a cat, do not be the son of your father."

† "The one purpose for which I have come is this—

সত্য সত্যই তিনি বিদেশে দেহত্যাগ করিলেন। সীজারের মনে যে প্রকার সাহস ছিল—এই বীরের মনের সাহস কি তাহা হইতে কম ছিল? কিন্তু, আজিও তাঁহার একখানা জীবনচরিত বাঙ্‌লা-ভাষায় লিখিত হইল না।

"লিখিবে কে? প্রতিভাশালী সাহিত্যিকেরা মহাজনদিগের সহিত মিলিবার, মিশিবার ও মনের ভাব আদান প্রদানের সুবিধা পাইতেছেন। কিন্তু, উঁহারা লিখিতেছেন—উপন্যাস। আর যাঁহাদের প্রতিভা মোটেই নাই—তাঁহারা জাতীয় জীবনের ইতিহাস লিখিবার ভার বহন করিতেছেন। ইহার চেয়ে অসঙ্গত ও অন্যায় কাজ কী হইতে পারে তাহা আমার জানা নাই।* প্রতিভার দিকে মানুষ ঝুকিয়া পড়ে। ৺শরৎ বাবু ও তাঁহার 'গুরুমারা সাগরেদ্' বুদ্ধদেব বাবু এবং অচিন্ত্য বাবু—

that I want to go back to my country, if I can go back, with the substance of Freedom in my hand. I would even prefer to die in a foreign country so long as it is a free country, and if you do not give us freedom in India you will have to give me grave here."—Moulana Muhammad Ali, 'Indian Round Table Conference', pp. 92 and 93.

*" What are all the novels that find such multitudes of readers, but so many fictitious biographies? What are the dramas that people crowd to see, but so much acted biography? Strange that the highest genius should be employed on the fictitious biography, and so much common-place ability on the real!"—Smiles.

ইঁহারা সমাজে যে দান দিয়া যাইতেছেন, যেভাবে ইঁহারা চরিত্রহীনতার পঙ্কে ফেলিয়া বাঙ্গালীকে চুবাইতেছেন, ঠাশিতেছেন, ডুবাইতেছেন, মারিতেছেন—বহুদিন পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালীদের ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ইঁহাদের প্রতিভা আছে—সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহারা আমাদের এইপ্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন! উপন্যাস পড়িও না, পারতো যেখানা হাতের কাছে পাও জ্বালাইয়া দিও।

অধিক আর কী লিখিব? আমার কথাগুলি মনে রাখিয়া কাজ করিও।

ইতি—

তোমার বাবা।"

বাবার পত্রখানা পড়িয়া ভাবিলাম,—হায়রে, শরৎ বাবু যদি তাঁহার সমস্ত জীবনটা এই ভুলের ব্যবসা করিয়া না যাইতেন, যদি তিনি এদেশের মনীষীদের জীবনবৃত্তান্তে তাঁহাদের উচ্ছ্বাস, লালসা, ভালবাসা, বিরহ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি উপন্যাসের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতেন তাহা হইলে, বাঙ্‌লাদেশে আজ কেমন চমৎকার সাহিত্য গড়িয়া উঠিত! বাঙ্‌লার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে উহার রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইত। কিন্তু, যাহা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা ছেলে বাবার সম্মুখে পড়িতে পারিতেছে না, বোন ভাইয়ের সম্মুখে তাঁহার বই খুলিতে পারিতেছে না! গোপনে মুরব্বিদের চোখের আড়ালে থাকিয়া যুবকেরা শরৎ বাবুর প্রতিভা ভোগ করিতেছে! ইহা হইতে

পরিতাপের বিষয় আর কী যে হইতে পারে তাহাতো বুঝি না।

মনে এইপ্রকার উত্তেজনা লইয়া সময় কাটাইতেছিলাম। একজন বন্ধু আসিয়া বলিল,—"চল, বক্তৃতা শুন্‌তে যাবে না?" বলিলাম,—"যাব বই কি!" পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া স্কুলের মাঠে বক্তৃতা শুনিতে চলিলাম।

পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, ঐদিন সন্ধ্যা-বেলা স্বাস্থ্যবিভাগের একজন বক্তা ছায়াচিত্রযোগে মিতাচার (Temperance) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। মাঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—বিরাট জনতা বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। মনে আমার দারুণ উত্তেজনা, মাঠের এককোণে দূর্ব্বাবনের উপরেই বসিয়া পড়িলাম। ছবির সঙ্গে সঙ্গে বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন। কিন্তু, তাঁহার কথা একটিও আমার কানে ঢুকিতে পারিল না। ছবিগুলি আমার মনকে যেভাবে আলোড়িত করিয়াছিল এইস্থানে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পর্দ্দায় ছবি পড়িল :—

১। আগে মানুষ পবিত্র পানীয় পান করিত, যেমন—দুধ। ফলে, পৃথিবীর সকল স্থানের মানুষ স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান ছিল। পরম সুখ-শান্তিতে বসবাস করিত।

আমি যেন দেখিলাম :—

১। আগে মানুষ ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও মহাজনদিগের জীবনচরিত পাঠ করিত। ফলে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের মানুষ ছিল—স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, [illegible]। ঘরে ঘরে শান্তি।

২। একব্যক্তি একদিন প্রথম তাড়ি খাইতে শিখিল। সে বন্ধু-বান্ধবকে তাড়ি খাইতে শিখাইল। তাহাদিগকে নেশায় মাতাইল।

৩। দুধের দোকানের পার্শ্বে ছোট একটি তাড়ির দোকান স্থাপিত হইল।

৪। তাড়ির নেশায় মানুষ মাতিল। দোকানে তাড়ি বেশী বিক্রয় হইতে লাগিল। দুধের চাহিদা কমিয়া গেল—ধীরে ধীরে দুধ সরবরাহ বন্ধ হইল। সর্ব্বশেষে দুধের দোকান মদের দোকানে পরিণত হইল।

৫। তাড়ি খাইয়া মানুষ মাতাল হইয়াছে, গাড়ীর নীচে চাপা পড়িতেছে, উলঙ্গ হইয়া নাচিতেছে, স্ত্রীকে মারিয়া গয়না ছিনাইয়া লইয়া তাড়ির পয়সার

২। বিকৃত মানসিক অবস্থার ভাব ফুটাইয়া একজন প্রথম একখানা উপন্যাস লিখিল। পড়িয়া পাঠকেরা মজা পাইল।

৩। পুস্তকালয়ের একপার্শ্বে উপন্যাস সাজাইয়া রাখা হইল।

৪। কুসাহিত্যের নেশায় মানুষ মাতিল। উপন্যাস বেশী বিক্রয় হইতে শুরু হইল। সুসাহিত্য পাঠ করিবার স্পৃহা মানুষের কমিয়া গেল। সাহিত্যিকেরা পয়সার লোভে উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। পুস্তকালয়গুলি কুসাহিত্যে ভরিয়া গেল।

৫। উপন্যাস পড়িয়া এদেশের লোক মাতাল হইয়াছে, চরিত্র হারাইয়াছে, মিথ্যা, জুয়াচুরি ইত্যাদি অপকর্ম্ম করিতেছে। আহার, নিদ্রা,

যোগাড় করিতেছে, উত্তেজনা ও অশান্তির ভিতর দিয়া দিন কাটাইতেছে, পুরুষের পৌরুষতা নাই, নারীদের সতীত্ব, গৃহিণীত্ব সব হারাইয়াছে।

৬। যুবক যুবতী স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। নারী ও পুরুষের শরীর রুগ্ন ও মনে অশান্তি। ফলে, সন্তানাদি চোর, বদমায়েস, চরিত্রহীন হইয়া গিয়াছে।

৭। দেশে অন্যায়, দুর্নীতি বাড়িয়া গিয়াছে, হৃদয়হীনতার চরমে পৌঁছিয়াছে। জেলে অপরাধীর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না, নূতন জেল তৈয়ারী হইতেছে।

ব্যায়াম ছাড়িয়া উপন্যাস লইয়া মশগুল হইয়া পড়িয়া আছে—স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হইতেছে, মায়ের মাতৃত্ব, স্ত্রীর সতীত্ব ও নারীর গৃহিণীত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে।

৬। এদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরের পরিণাম চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

৭। সমাজে কদাচার অন্যায় দুর্নীতি বাড়িয়া গিয়াছে, চরিত্র-হীনতা ও হৃদয়হীনতার চরমে পৌঁছিয়াছে। স্ত্রী স্বামীর নিকট, আয়ার নিকট সন্তান ফেলিয়া রাখিয়া বন্ধুর সহিত সিনেমায় যাইতেছে, ঘর-সংসার শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে। অপরাধীদের জন্য নূতন কারাগৃহ প্রস্তুত হইতেছে।

৮০। এইরূপ সন্ধিক্ষণে আমেরিকার পুসীফুট জন্‌সন্ বলিতেছেন,—"I saw before me with awe the gathering dusk of our end as a Nation and People."*

*অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে শুরু করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সুরারাক্ষসীর কবলে পড়িয়াছিল। আমেরিকার William Johnson মাদক-নিবারণী আন্দোলন শুরু করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় সুরা-পান আইন প্রচলিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে একমাত্র মিশিগান প্রদেশে ৩০টী কারাগৃহ কমিয়া গিয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক লক্ষ ডলার (তিন লক্ষ টাকা) ব্যয়ে একটি কারাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল। মদ্যপান নিবারণের ফলে উহাকে বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইল। জন্‌সন সাহেব

৮১। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিতেছেন,—"বিস্মিত ও বিমূঢ় হইয়া চোখের সম্মুখে দেখিলাম—জাতি হিসাবে বাঙ্‌লার প্রদোষ-অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে—ফরাসী দেশের মত রাষ্ট্রবিপ্লব শুরু হইয়াছে।"*

* "Domestic Purety no longer bound society together,—France was motherless, the children broke loose and the Revolution burst forth amidst the yells and fierce violence of women."

—Beaumarchai's Figaro.

৯। মাদক-নিবারণী সভায় পুসীফুট জন্সন্ বক্তৃতা করিতেছেন। ৺কেশবচন্দ্র ও ৺প্যারীচরণের পুণ্যস্মৃতির নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাদের ছবি টেবিলের উপরে সাজান রহিয়াছে। এদেশের বহু গণ্যমান্য লোক তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

১০। বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া সুরাপানাসক্ত ব্যক্তিরা তওবা করিতেছে।

৯। কুসাহিত্য-নিবারণী সভায় আচার্য্য রায় বক্তৃতা করিতেছেন। ৺অক্ষয় কুমার দত্ত, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত—ইঁহাদের ছবি টেবিলের উপর সাজান রহিয়াছে। প্রফেসর সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, মওলানা আক্রম খাঁ, সাধক অরবিন্দ ঘোষ, প্রফেসর বিনয়কুমার সরকার, প্রফেসর কাজি আকরম হোসেন—ইঁহারা পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

১০। কুসাহিত্যিকেরা জড় হইয়া হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—প্রতিজ্ঞা করিতেছে সুসাহিত্যের সৃষ্টি করিবে।

অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া গোপনে মদ্যবিক্রেতাদিগকে ধরিতেন। সেইজন্য, তাঁহার নাম হইল পুসীফুট বা বিড়াল-পা। আমেরিকাকে সুপথে আনিয়া ইনি ইংলণ্ডে যাইয়া অনুরূপ আন্দোলন করেন। ১৯২১ খৃঃ অব্দের ১১ই অক্টোবর ইনি কলিকাতায় আসিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।—গ্রন্থকার।

১১। মদের দোকানে ভিড় কমিয়াছে, দুধের দোকান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

১২। মদের দোকান উঠিয়া গেল, কতকগুলি কারাগৃহ বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। মানুষ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

১১। উপন্যাসের কাটতি কমিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র, জীবন-চরিত, বক্তৃতাবলী এবং জাতীয় সাহিত্য সমাদর লাভ করিতেছে।

১২। কতকগুলি 'সাহিত্য-মন্দির' ফেল পড়িল। দেশে কারাগৃহের সংখ্যা কমিয়া গেল। মায়ের মাতৃত্ব, ও নারীর গৃহিণীত্ব ফিরিয়া আসিল। ঘর-

আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। মেসে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম,—এদেশের মানুষ সত্যই উপন্যাসের নেশায় মাতাল হইয়াছে। তাহা না হইলে, "বাঙ্‌লাভাষার একশতখানি ভাল বই"য়ের তালিকায় অতগুলি উপন্যাস স্থান পাইত না। মেসে আসিয়া 'চরিত্রহীন' ও 'যেদিন ফুটল কমল'—এই দুইখানি উপন্যাস হাতের কাছে পাইলাম। টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুন ধরাইয়া দিলাম। বন্ধুরা বলিল,—"ও কী করিতেছ?" আমি বলিলাম,—বাঙ্গালীজাতির উদ্ধারের জন্য উপন্যাস-মেধ-যজ্ঞ করিতেছি।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"আরও দুই তিন হাজার কপি

বাজারে আছে,—'চরিত্রহীন' আবার থিয়েটারও হইতেছে।" রাগে আর কোনও কথা বলিলাম না। সেইদিন হইতে উপন্যাস পড়া ছাড়িয়াছি। কিন্তু, আমার চরিত্রে উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা যে দাগ কাটিয়া গিয়াছে তাহা আর এ জীবনে মুছিয়া ফেলিতে পারিব না! এইসব নানা কারণে আমার চরিত্রগঠনে গোল রহিয়া গিয়াছে। আচার্য্য রায় বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালীর ছেলেকে লেখাপড়া শিখান যেন বালিশের খোলে তুলা পূরা—কেবল ঠাশো, আর গাদো।" এদেশের যুবকদের মগজে যে এমনি করিয়া কুসাহিত্যের ভিতর দিয়া কেবল আবর্জ্জনা ঠাশিয়া, গাদাইয়া, ভর্ত্তি করিয়া তাহাদিগকে চরিত্রহীন করিয়া গড়িয়া তোলা হইতেছে তাহার কি কোনও প্রতিকার নাই?



গোলকচন্দ্রের বিবাহে গোল।

যখন ফুটবলদেবের বরকতে প্রতি বৎসর প্রমোশন (Promotion) পাইয়া শনৈঃ শনৈঃ উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছিলাম তখন অনেক ভদ্রঘরের সর্ব্বগুণ-সম্পন্না (যদিও গুণের পরিচয় দিবার বয়স তখনও কাহারও হয় নাই) পাত্রীর পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছিল। মা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও বাবা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন,—"হরির কপালে যে কত বড় ঘরে বিবাহ আছে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আর দুই-একটা বৎসর সবুর কর। সবুরে মেওয়া ফলে।" ইহার পরেও মা অনুযোগ করিলে বাবা রাগে কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিতেন,—"এত তাড়াতাড়ি কেন? বিবাহের বয়স হইলে বিবাহ দিব।" সরদা আইনের বালাই তখন ছিল না; অতএব, 'শুভস্য শীঘ্রং' হইয়া গেলে কী হইত তাহা জানি না। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাবা কৃপণের একশেষ। তাঁহার ধারণা ছিল—বি-এ পাস করিয়া একটা ডেপুটি হইতে পারিলে একটা মস্ত যৌতুক (Dowry) আদায় করা যাইবে। মেজদাদাও মনে করিতেন যে, নববধূর বদন-মণ্ডলের দিকে চাহিলেই বিদ্যামন্দিরের দ্বার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। অতএব, সে সময়ে বিবাহ হইল না।

তারপর, বড় হইয়া প্রবেশিকার প্রবেশদ্বারে যখন বারে বারে চিৎ হইয়া পড়িতে শুরু করিলাম তখন বাবার টাকার নেশা টুটিয়া গেল। আর মেকী কেমন করিয়া চালাইতে হইবে সেই চিন্তায় মায়ের দিন কাটিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতএব, বাবা বিবাহের চেষ্টায় নামিলেন। যে সব কন্যা-পক্ষ হইতে পূর্ব্বে প্রস্তাব আসিয়াছিল এবং যাঁহারা অনেকদিন অবধি আশায় বুক বাঁধিয়া ছিলেন তাঁহাদের কন্যাগণ এই সময়ের মধ্যে প্রায় সকলেই বিবাহের উপযুক্তা হইয়া উঠিয়াছিল। এক এক করিয়া প্রায় সকলেরই বিবাহ হইয়া গেল। বাবা মনে করিয়াছিলেন যে, হয়তবা পাত্রের অভাবে দায়ে পড়িয়া কোনও কন্যার পিতা আবারও বাবাকে অনুরোধ করিবেন। তখন বিনা আপত্তিতে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে একেবারে কৃতার্থ করিয়া দিবেন। কিন্তু, সে রাস্তায় কেহই আসিলেন না। কেননা, এতদিনে কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আমি লেখাপড়ায় ভোঁতা, বুদ্ধিতে ভ্যাবাগঙ্গারাম, আবার এদিকে ইঁচড়েপাকা। আমার মুরদ কতখানি তাহা জানিতে পারিয়া এই সময়ে কন্যাদান করাটা কন্যাপক্ষ পছন্দ করিতেছিলেন না। কিন্তু, আগেই যদি বিবাহ হইয়া যাইত তাহা হইলে, এই সময়ে উহা কতখানি অশান্তিময় হইত তাহা ভাবিয়া আজ মানুষের বেয়াকুফির কথা মনে পড়িতেছে। মনে হয়, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা হয় না বলিয়া অনেক বিবাহ অশান্তিময় হয়।

এইভাবে দুই বৎসর কাটিবার পরে বাবা উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেই কন্যাপক্ষের নিকট প্রস্তাব দিতে শুরু করিলেন। কিন্তু, পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক যায়গায় আমার যতপ্রকার দোষ আছে তাহাই বাবা কন্যাপক্ষের নিকট সর্ব্বাগ্রে পেশ করিতে লাগিলেন।

পাটুলীগ্রামে এক ভদ্রঘরের একটি কন্যার সন্ধান পাইয়া বাবা সেখানে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু, আমি যখন শুনিলাম যে, কন্যা দেখিতে কুরূপা তখন মায়ের নিকট নিজের অমত প্রকাশ করিয়া বসিলাম। মা আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাবার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দুইমাস ধরিয়া চেষ্টার ফলে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিল—মায়ের দুই ফোঁটা অশ্রুতে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল।

ইহার পরে কমলাপুরে প্রস্তাব গেল। সন্ধান লইয়া জানিলাম যে, কন্যাটী মন্দ নহে। বাবা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে মা জানিতে পারিলেন যে, কন্যার মা ও ভাইবোন কেহই নাই—আছে কেবল বাপ। আবার মা কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কান্না শুরু করিয়া দিলেন। বাবাকে বলিলেন,—"যেখানে শাশুড়ী, শালা-শালী নাই সেখানে ছেলেকে বিবাহ দিতে দিব না।" আমি মাকে বুঝাইলাম,—"তোমার অতসব দিয়া কী দরকার?" মা বলিলেন,—"তুই সংসারের কিছুই জানিস্ না, শাশুড়ী, শালা-শালী না থাকিলে বিবাহ করিয়া কোন সুখ নাই। চিরকাল একলা আফ্‌সোস্

থাকিয়া যাইবে।” আমি বলিলাম,—“তবে কি তুমি বলিতে চাও যে, ও মেয়ের বিবাহ হইবে না?” মা বলিলেন,—“তোর যেমন বুদ্ধি! আরে গাধা, আফ্‌শোস্‌টা তো দুনিয়া হইতে উঠিয়া যায় নাই!” এইসব কথা শুনিয়া বাবা মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“তবে থাক্‌, তোমার যখন অনিচ্ছা তখন ওখানে সম্বন্ধ করিব না।”

শেওড়াফুলীতে একটী পাত্রীর সন্ধান পাইয়া বাবা ছুটিয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। মায়ের নিকট সব কিছু খুলিয়া বলিবার পরে মা বলিলেন যে, আগে অতসব বড় বড় উঁচু সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া এখন এত নীচ-ঘরে সম্বন্ধ করিলে মানুষের কাছে আর মুখ দেখান যাইবে না। শেওড়াফুলীর কন্যা-পক্ষ দুই চারিদিন ঘুরিলেন। তারপর, সব চুপচাপ।

গোপালপুরে কন্যা দেখিতে গিয়া বাবা সব কথা পাকাপাকি করিয়া আসিলেন। ঘরও ভাল, কন্যাটীও ভাল। মনে করিলাম,—এতদিনে কপাল ফিরিল। কিন্তু, যখন দিন-তারিখ ফেলিবার জন্য বাবা পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন তখন কন্যা-পক্ষ লিখিয়া জানাইলেন যে, কোনও অপরিহার্য্য কারণ-বশতঃ তাঁহারা আমাদের সহিত সম্বন্ধ করিতে পারিবেন না। লোক-মারফতে জানাইলেন যে, বাবা কন্যা দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসেন নাই। এ প্রকার নিদারুণ অপমান হজম করিয়া তাঁহারা এখানে সম্বন্ধ করিবেন না।

মায়ের কানে এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি ক্ষেপিয়া

আগুন হইয়া উঠিলেন। বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ধৈর্য্য-হারা হইয়া বলিলেন,—"তোমার জন্যইতো আমার সোনার যাদুর বিবাহ হইতেছে না। টাকার জোরে, মিথ্যা ও জুয়াচুরির জোরে কত মানুষ তাহাদের অচল ছেলে-মেয়ে চালাইয়া দিতেছে,—আর তুমি কোথাও সম্বন্ধের কথা বলিতে গেলে আমার ছেলের যত দোষ আছে সব বলিবে। কন্যাপক্ষকে ভুলাইবার জন্য দুইটা টাকাও ব্যয় করিবে না,—শাইলকের মত ব্যবহার করিয়া আসিবে। এমন হইলে কেহ ছেলে-মেয়ে বিবাহ দিতে পারে?" জবাবে বাবাও 'যেমন বুনা ওল তেমনি বাঘা তেঁতুলের ব্যবস্থা' করিয়া বলিয়াছিলেন,—"কথাগুলি তুমি মেয়েলোকের মতই বলিলে। কিন্তু, আমি যে তোমার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট মেয়েলোক নহি তাহা তোমার জানিয়া রাখা উচিত। দুর্ব্বল-চিত্ত অপগণ্ড মা-বাপেরা তাহাদের ছেলে-মেয়ে বিবাহ দিবার সময়ে ফাঁকি ও জুয়াচুরির অভিনয় করে। আমি মিষ্টি খাওয়াইয়া, দুইখানা গহনা দিয়া কন্যাপক্ষকে আয়ত্তের ভিতরে আনিব, তেমন চোরামি বুদ্ধি আমার নাই। পৃথিবীর অন্য-সব ব্যাপারে স্বার্থপরতা চলিলেও এই একটি-মাত্র কাজ আছে যেখানে স্বার্থপরতা চলে না। এখানে আগের তিক্ত ব্যবহার পরে মিষ্ট আচারে পরিণত হয়, কিন্তু আগের মিছা-মিষ্টতা পরে বিষে পরিণত হয়। বিবাহটা ভাগের কারবার। এ কারবারে অন্যকে প্রলোভন দেখাইয়া জড়িত করিয়া লোকসানের ভাগী করা কশাইয়ের কাজ। ছেলে-মেয়ে

বিবাহ দেওয়া গরুমহিষাদি বিক্রয় করিবার মত নহে যে একদিনেই ফুরাইয়া যাইবে। এ জীবন-ময় কারবারে জুয়াচুরি যাহারা করে তাহারা নির্বোধ পশু। এখানে সব কিছু খোলসা করিতে হয়, বিবাহ হওয়া বা না-হওয়া উভয় পক্ষের ইচ্ছাধীন।

"এ সমাজে এমন ছেলের অভাব নাই,—যাহার আঙ্গুলে হীরার আঙ্‌টী; কিন্তু, হৃদয় নাই, চরিত্র নাই,—যক্ষ্মা, কুষ্ঠ বা অনুরূপ ছোঁয়াচে কুৎসিত ব্যাধিতে ভরা। তাহার পাপিষ্ঠ মা-বাপ বক-ধার্ম্মিক সাজিয়া এই প্রকার বিবাহের অনুপযুক্ত ছেলের সহিত আর একজনের নিষ্কলুষ চরিত্রবতী কন্যার জীবন জড়িত করিয়া দিয়া হয়ত একেবারে ধ্বংস করিয়া দিল! এ সমাজে এমন মেয়েরও অভাব নাই—যাহার গা-ভরা গহনা, কিন্তু বাপের বংশমর্য্যাদা ও টাকার মিছা-অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না, মনের মধ্যে সমুদ্র-প্রমাণ অপবিত্রতা। এই প্রকার অধঃপতিতা কন্যার গার্জ্জিয়ান নরপিশাচের মত স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া,—মেষ-শাবকের মত নিরীহ সাজিয়া হয়ত অন্য একটি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবান যুবকের জীবন বিষাক্ত করিয়া দিল, কুচিন্তা ও কুভাব ঢুকাইয়া দিয়া সমস্ত উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিল,—জীবনটী বরবাদ করিয়া দিল! এই প্রকার মিথ্যা ও জুয়াচুরির ভিতর দিয়া বিবাহ দেওয়া এদেশের মানুষের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ফলে, ঘরে ঘরে দারুণ অশান্তি এবং অস্বস্তি। বিবাহের পরেই কন্যার বাবা হয়ত ছেলের বাবাকে শাসাইতেছে—"তোমার নামে আমি মকর্দ্দমা করিব। বিবাহের অনুরূপ

ছেলেকে আমার মেয়ের সহিত বিবাহ দিয়াছ।” কোথাও বা ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে শাসাইতেছে—“তুমি যে মেয়ে দেখাইয়াছিলে সেই মেয়ের সহিত বিবাহ দাও নাই। ইহা ছাড়াও অনেক সাংঘাতিক ঘটনা গোপন রাখিয়া ফাঁকি দিয়াছ; চোরামি করিয়াছ।” এই প্রকার বিবাহে জড়িত দুইটী মানুষের আত্মার চরম অবনতি ঘটে।* উহারা এই প্রকার অপ্রীতিকর বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া পশুর মত মানসিক প্রবৃত্তি লইয়া, অশান্তিতে ও পরম উত্তেজনার মধ্যে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়, পশুর মত মরে, মরিবার সময়ে তাহাদের নাম বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য রাখিয়া যায় আর কয়েকটী পশু। উহাদের সন্তানাদি হয় সবই কুৎসিত, কুৎসিত ব্যাধিতে জর্জ্জরিত। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রোটোপ্লাজ্‌মের (Protoplasm) ভিতর দিয়া রক্তধারার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রহীনতা ছড়াইতে থাকে। উহাদের উত্তরাধিকারেরা মা-বাপের দেহ ও মানসিক পশুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পরবর্ত্তীকালে সমাজের কণ্টক হইয়া ফুটিয়া উঠে; চরিত্রহীনতার আগুনে চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়া গরম করিয়া তুলে। এইভাবে পুরুষানুক্রমে উহারা দ্রুত অধঃপতনের দিকে নামিয়া যায়। মায়ের উৎকট মানসিক প্রবৃত্তি সন্তানের ভিতরে সংক্রামিত হইয়াছে—ইহা

* “The mind soon learns to run in small grooves, the heart grows narrow and contracted and the moral nature becomes weak which is fatal to all generous ambition or real excellence.”—Smiles.

চাক্ষুষ দেখাইয়া দিলেও এইসব নরকের কীটেরা বিশ্বাস করে না। এই গণ্ডমূর্খগুলিকে তিনদিন ধরিয়া ঠেঙ্গাইলেও উহাদের পেট হইতে বায়লজি, সাইকোলজি বা সুজাতশাস্ত্রের (Eugenics) একটা সূত্রও বাহির হইবে না—হয়ত উহাদের চৌদ্দ পুরুষেও একখানা মনোবিজ্ঞানের বইয়ের পাতা উল্টাইয়া দেখে নাই,—অথচ, ইহারাই আবার অন্যকে অশিক্ষিত বলিয়া গালি দিবে। পশ্চিম দেশের স্ত্রী-পুরুষেরা বিবাহের পূর্ব্বে একসঙ্গে উঠা-বসা করে, খাওয়া-দাওয়া করে, মনের ভাবের আদান প্রদান করে—সবদিক দিয়া উভয়ের পছন্দমত হইলে বিবাহ হয়। আমরা এই রীতিকে ঘৃণা করি! কিন্তু, তাহাদের বিবাহিত জীবন কত সুখী, তাহাদের জাতি কত শক্তিশালী, সেইসব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি কেমন চরিত্রবান। উহাদের ভিতরে যে দুই-চারিটী বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা হয়—সেইসব নজির দেখাইয়া আমরা বলি যে, উহাদের নৈতিক চরিত্রবল নাই। অথচ, একথা আমরা একবারও ভাবি না যে, উহারা মোটেই অশান্তিময় জীবন যাপন করে না ;—যখনই স্বামী-স্ত্রীতে গরমিল হয় তখনই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। আর আমাদের দেশে দুইটী ছেলে-মেয়ের জীবন একবার একসঙ্গে গাঁথিয়া দিতে পারিলেই আর খুলিবার উপায় নাই। সেইজন্য, বিবাহের পূর্ব্বে সব বিষয় ভাল করিয়া জানাজানি হওয়াটা আমাদের দেশে বেশী দরকার। পরিণামদর্শী মুরব্বিদের এ বিষয়ে ভুল হওয়া উচিত নহে। অথচ, আমাদের দেশেই এইসব বিষয় বেশী গোপন

হইয়েছে। কেন? বিবাহের কথা পাকাপাকি করিবার সময়ে যদি বাপমায়েরা বলিয়া দেন যে,—মেয়েটা হাই-হিল জুতা পরিয়া রাস্তায় ঘুরিতে, পার্কে বেড়াইতে ও বায়স্কোপ দেখিতে ভালবাসে, লেখাপড়ার দিকে কিন্তু তেমন মন নাই, অথবা মেয়েটা খুব লাজুক, ঘরের বাহিরে কিছুতেই তাহাকে নেওয়া যাইবে না, ভয়ানক চড়া-মেজাজের, তবে গুণের ভিতরে এই যে, বই পড়িতে খুব ভালবাসে—তাহা হইলে কি সেইসব মেয়ের বিবাহ হইতে পারে না? ছেলের বাবাও তাহার ছেলের কোনও রোগ শোক আছে কিনা বা তাহার ছেলে কেমন ধরণের মেয়ে পছন্দ করে, তাহা জানাইয়া দিলে কি ছেলের বিবাহ হইতে পারে না? বিবাহের পূর্ব্বে ছেলেমেয়েকে আমরা মিশিতে দেই না—সেটা ভাল কথা। কিন্তু, বাপেরা খোলাখুলিভাবে সব বিষয় আলোচনা না করিয়া ভাগ্যের উপর এতটা নির্ভর করেন বলিয়াইতো আমাদের বিবাহিত জীবনে এত অশান্তি এত অস্বস্তি। কতকগুলি অপদার্থ বাপের ধারণা এই যে, দুইটা ছেলে-মেয়েকে শাস্ত্রের মন্ত্র দিয়া বাঁধিয়া দিতে পারিলেই জোড়া লাগিয়া যাইবে। এই নরপিশাচ গার্জ্জিয়ানগুলি নিজেদের সুখ ও স্বার্থটাকেই বড় করিয়া দেখে। যাহা অপ্রীতিকর তাহা সব সময়ে অপ্রীতিকর। শাস্ত্রের মন্ত্র দিয়া মিথ্যার জালে আবদ্ধ করিয়া দিলে তাহা প্রীতিকর হয় না, বরং বিষাক্ত হইয়া উঠে।

"বিবাহ হইয়া গেলে এই মিথ্যা ও জুয়াচুরি ধরা পড়িলে

পশু গার্জ্জিয়ানগুলি আবারও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিবে,—"আমি জানিতাম না যে, আমার সন্তানের এই প্রকার ব্যাধি ছিল বা সে এই প্রকার চরিত্রহীন।"—যেন তাহাদের সন্তানের বিষয় অন্য মানুষের খোঁজখবর রাখা উচিত ছিল—তাহারা সন্তানের জন্মদান করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ফেলিয়াছে! যে মা-বাপ এই প্রকার নীতি অবলম্বন করে তাহাদের পিঠে গোটা-পঞ্চাশেক বিরাশি দশ আনা ওজনের কীল, আর কান ধরিয়া দুই গালে গোটা পঞ্চাশেক জুতার বাড়ি দিয়া দিলেও বোধ করি, তাহাদের পাওনার উপযুক্ত দান দেওয়া হয় না।* মানুষের মনের সুখ-শান্তি যাহারা কাড়িয়া লয়, জাতির মেরুদণ্ড যাহারা ভাঙ্গিয়া দেয়—তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়াও আর এক মহাপাপ। ("It's toleration is a national crime.")। তোমার ছেলের বিবাহ হউক, আর না হউক, বিবাহ ব্যাপারে আমি মিথ্যার অভিনয় করিতে পারিব না। এখন বলিব যে, ছেলে আমার খুব ভাল, এম-এ পাস করিতে একটুও আটকাইবে না; তাহার পর বিবাহ হইয়া গেলে যখন সব জানাজানি হইবে তখন পুত্র ও পুত্রবধূ পশুর মত অশান্তিময় জীবন যাপন করিবে—এমন ব্যবস্থা আমার দ্বারা হইবে না।"

* "Great evils are in some cases only to be met by resistance, they cannot be wept down but must be battled down"—Smile.

বাবার এহেন সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া মা নিরুৎসাহে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। আমি পাশের ঘরে বসিয়া সবই শুনিলাম। শুনিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। আমার বিবাহ করিবার সাধ ও মায়ের বিবাহ দিবার নেশা একেবারে মিটিয়া গেল।

ইহার পর কিছুদিন সব চুপচাপ রহিল। মাস-দুয়েক পরে একদিন হঠাৎ বাবা আসিয়া মাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হরির বোধ করি, কপাল ভাল। আমতলা গ্রাম হইতে একখানা সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছে। মস্তবড় হাকিমের একমাত্র কন্যা, অজস্র টাকার মালিক, মেয়েটী লেখাপড়াও নাকি বেশ জানে। মেয়েটীর মামারা বড় লোক—তাহার পিসামশাইও একজন বড় হাকিম।" বাবার কথা শুনিতে শুনিতে আমি আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেলাম। জানালার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলাম। জানালার ফাঁকের ভিতর দিয়া দেখিলাম—মা যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। পুরাপুরি ডাউরীটা আদায় হইয়া যাইবে ভাবিয়া বাবাও যে একটু উৎফুল্ল হইয়াছেন তাহাও ভাবে টের পাইলাম।

তিন চারিদিন পরেই বাবা আমতলায় গেলেন। দুইদিন বাদে যখন সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন দেখিলাম,—বাবার মুখখানা শুকাইয়া যেন একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছে—চক্ষু দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। মা ছুটিয়া আসিয়া বাবার এই প্রকার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ও আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিলেন। বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়াছে কি না বা কোন্ পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হইতেছিল। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করিবে কে? (Who is to bell the cat?)

সন্ধ্যার পরে ধীরে-সুস্থে মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কী করিয়া আসিয়াছ, তাহাতো বলিলে না!" বাবা চক্ষু দুইটাকে একটু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"করিব কী? একবার মনে হইয়াছিল যে, ঐ শুয়ার হাকিমটাকে ধরিয়া একশত ঘা জুতা লাগাই। উহার মনে পর্ব্বত-প্রমাণ অপবিত্রতা; অথচ, বিদ্যা ও বড় চাকুরীর গৌরবে উহার পা মাটীতে পড়ে না। 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' মার্কা নামাবলীর বস্ত্র গায়ে দিয়া বদ্‌মায়েসি ও চোরামির একশেষ করিয়া ছাড়িতেছে। সেই শুয়ারের মুখে, আর তার টাকার মুখে তিন লাথি মারিয়া চলিয়া আসিয়াছি।" এইটুকু শুনিয়াই আমি সেস্থান হইতে চম্পট দিলাম। বাবার রাগের মাত্রা এতখানি বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার কথাগুলি দূর হইতেও শুনা যাইতেছিল। রান্না-ঘরের পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম। শুনিলাম,—মা বলিতেছেন,—"কেন, কী হইয়াছে, এইতো কয়দিন আগে তাহাদের খুব সুনাম করিলে!" বাবা বলিলেন,—"দূরের বাদ্য শূন্য হাওয়ায় ভালই শুনায়। না জানিয়া শুনিয়া বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া ভালই বলিয়াছিলাম। চাঁদের মুখে পড়িয়া, চাকুরীর জোরে ও টাকার জোরে কত শয়তান পাষণ্ড বড়লোক হয় জান? ঐ হাকিমটা তাহাদেরই মত

একজন। বিবাহের কথা পাকাপাকি করিয়া বাড়ী আসিতে-ছিলাম। একটা পরিচিত শিক্ষিত ছেলের সহিত রাস্তায় দেখা হইলে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা বল্‌তে পার, এদের স্বভাব-চরিত্র কেমন?" ছেলেটী বলিল,—"মশাই, ওরা বড় লোক, আমি আর কী বলিব! অমন ব্যবহার আমাদের হইলে আমরা আর মুখ দেখাইতে পারিতাম না। বড়লোকেরা নাকি সবই হজম করিতে পারে। যাহার মেয়ের সহিত আপনার ছেলের বিবাহ হইবে উহার এক বোনকে এক হাকিমের কাছে বিবাহ দিয়াছে। সেই পক্ষের এক ভাগিনেয় নৈতিক চরিত্র হারাইয়া অন্যের একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়া দিল। সেই ভাগিনেয়-বধূ ছয় মাসের মধ্যেই এক জারজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। অথচ, তাহাকে দিব্য সংসারে স্থান দিয়াছে, সব বউয়ের চেয়ে সেই বউয়ের আদর বেশী। উহার স্ববংশীয় দূর-সম্পর্কীয় আর একটি বোন বিধবা অবস্থায় এক জারজ সন্তান প্রসব করে। উহার আরও একজন পরম আত্মীয়—সেও নাকি বড় চাকুরী করে—তাহার এক কন্যার বিবাহের ছয়মাসের মধ্যেই এক সন্তান হয়। উহাদের নিজেদের বাড়ীতে, বাড়ীর আশে পাশে, ছোট বড় সকলের মধ্যেই চরিত্রহীনতার বিষ ঢুকিয়াছে। উহাদের বাড়ীতে গেলে এইসব কু-আলোচনা ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোক, পুরুষলোক, ভাই ও বোনেদের

ভিতরে ঐ সব আলোচনা ছাড়া আর কিছুই পাইবেন না। যাহাদের মধ্যে এতগুলি ঘটনা চাক্ষুষ ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহাদের সমাজে পাপ কতখানি ঢুকিয়াছে, তাহা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে। অথচ, এই সমস্ত ঢাকিয়া রাখিয়া গোপনে গোপনে ছেলেমেয়েগুলিকে দূরদেশে রাখিয়া বিবাহ দিতেছে। দূর হইতে মানুষে বড় চাকুরী দেখিয়া, চাকচিক্য দেখিয়া উঁহাদের সহিত সম্বন্ধবাদ করিতেছে, কিন্তু পরে পস্তাইতেছে। উঁহাদের মত নৈতিক চরিত্র হারাইয়া যাহারা বদমায়েস ও শুয়ার বা নরকের কীট হইয়া গিয়াছে তাহারাই উঁহাদের সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করিতে পারিতেছে। মশাই, একথা যদি সত্য হয় যে, মানুষের কলঙ্কের হাজার ভাগের একভাগও সমাজে জানাজানি হয় না, তাহা হইলে যাহাদের সমাজে এতগুলি ঘটনা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহারা মানুষ, না পশু তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন কোনও ভদ্রলোক উঁহাদের সহিত সম্বন্ধ করিবে না। বড় বড় চাকুরী থাকিলে কী হইবে?" এইটুকু শুনিয়া ব্যাপারটা কী জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলাম। তারপরে, আর কয়েকজনের নিকট খোঁজখবর লইয়া জানিতে পারিলাম যে, ছেলেটা যাহা বলিয়াছে তাহা হইতেও ঢের ভয়াবহ কাণ্ড-কারখানা উঁহাদের অন্দর-মহলে চলিতেছে। অথচ, হাকিমটা আমার নিকট অবাধে কতকগুলি মিথ্যা কথা বলিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি বিষয় গোপনও করিয়া গিয়াছে। রাগে আমার

শরীর কাঁপিতে লাগিল। ফিরিয়া সেই শুয়ার হাকিমটার বাড়ীতে গেলাম। ঐগুলি সমস্ত বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমরা পশু, না মানুষ? ইহার জবাবে সেই নির্লজ্জ হাকিম বলিয়াছিল,—"আমাদের মত বড় বড় সমাজে তো আপনারা মেশেন নাই। উঁচু সমাজে অমন দুই একটা হয়।—আর তা ছাড়া আমার মেয়েকে তো আমি ঐ সব আবহাওয়া হইতে দূরে রাখিয়াছি।" আমি বলিলাম,—দূরে রাখিলে কী হইবে? জাতের ধারা যাইবে কোথায়? তুমি নিজে বৃদ্ধ হইয়াছ, পৃথিবীর ভালমন্দ অনেক কিছু দেখিয়াছ; অথচ, আমার নিকটও নিরীহ মেষ-শাবক সাজিয়া মিথ্যা কথা বলিতে ও জুয়াচুরি করিতে ভয় পাইতেছ না।* তোমার মেয়ে কেমন হইবে তাহা আমার আর বুঝিতে বাকী নাই। আর তোমাদের এই পশু সমাজগুলি যদি উঁচু হয় তাহা হইলে, নরকের কীটগুলি স্বর্গে বাস করে বলিতে হইবে। তোমার মেয়ের সহিত আমার ছেলের বিবাহ কিছুতেই দিব না। সে বলিল,—"তোমার ছেলে না হইলেও আমার মেয়ের বর জুটিবে।" আমি বলিলাম,—হাঁ, তোমাদের মত নরকের কীটওতো

* "The wise will profit by the suffering they cause and eschew them for future; but there are those on whom experience exerts no ripening influence, and who only grow narrower and bitterer and more vicious with time."—Smiles.

অনেক রহিয়াছে—টাকা ব্যয় করিতে পারিলে তাহারাই আসিয়া জুটিবে। শুনিয়াছি—সেরকম দুই একটি নরকের কীট তুমি এখনও পুষিয়া রাখিতেছ। এই কয়টা কথা বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি। হরিকে ওখানে আমি কিছুতেই বিবাহ দিব না। মা বলিলেন,—"তাহার আত্মীয়-স্বজন বা বংশের অন্য সকলের মধ্যে চরিত্রহীনতা ঢুকিয়াছে তাহাতে তাহার মেয়ের কী দোষ হইয়াছে?" বাবা মাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমি একটা হস্তিমূর্খ! বলিলাম তো যে, সে নিজেও একটা জুয়াচোর—মিথ্যাবাদী। আত্মীয়-স্বজন ও বংশীয় লোকদের কলঙ্ক ঢাকিয়া রাখিবার জন্য তাহাকে মিথ্যার অভিনয় করিতে হয়! শিক্ষা ও পদমর্য্যাদা থাকিলে কী হয়, সে একটা Moral coward; তাহার চরিত্রবল নাই।* একটি সমাজে কোনও অংশে চরিত্রহীনতা ঢুকিলে অন্য অংশ কিছুতেই ভাল থাকিতে পারে না। কেননা, ঐ চরিত্রহীন মানুষগুলিইতো ভিতরে ভিতরে কলুষতা ছড়ায়। উহাদের সংস্পর্শে যে আসিবে সে-ই ডুবিবে। আর যাহারা একবার ডুবিয়াছে শত চেষ্টা করিয়াও তাহারা উহার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না—ইহা বিজ্ঞানের কথা। যে সমাজ বা যে পরিবারে একটিও স্ত্রী বা পুরুষের চরিত্র নষ্ট হইয়াছে সে সমাজে বা সে পরিবারে বিবাহাদি হওয়া

* "The man who has any dignity of character, should conquer with honour and not use any base means even to save his life."—Sertorius.

একান্ত বিগর্হিত। নরকের কীটেদের নিজেদের ভিতরেই আবদ্ধ থাকা উচিত।*

বায়লজি, সাইকোলজি ও সুজাতশাস্ত্রের শত শত পুস্তকে হাজার হাজার নৈতিক অধঃপতিত বংশের ও পরিবারের প্রকৃত তত্ত্ব (Experimental data) প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাদের বংশে বা পরিবারে চরিত্রহীনতার বিষ ঢুকে তাহাদের মেয়েগুলি ভদ্রসমাজের অনুপযুক্ত হইয়া যায়; তাহাদের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না।† কেননা, যতদূর পর্য্যন্ত ঐ চরিত্রহীনতার রক্ত যাইবে, শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইবে ততদূর পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠিবে। এ বিষয়ে যে শত শত ভাল পুস্তক আছে তাহা পড়িবার ক্ষমতাতো তোমার নাই! অন্ততঃপক্ষে সুপণ্ডিত ৺অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক পুস্তকখানা পড়িয়া দেখিও। ঐ বইখানা জর্জ্জ কুম্ব সাহেবের "কন্‌স্টিটিউশন অব ম্যান" (Constitution of man) নামক

* "So long as the assimilating influences productive of it continue at work, it is folly to suppose any one grade of a community can be morally different from the rest. In whichever rank you see corruption be assured it equally pervades all ranks—be assured it is the symptom of a bad social diathesis."—Social Statics Chap. XX.

† "Most men specially women are the moral slaves of the class or caste to which they belong."—Smiles.

পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। শেলফ হইতে বইখানা বাহির করিয়া আন—এখনই তোমাকে দেখাইতেছি।

আমি সেই রান্নাঘরের পিছনে থাকিয়াই টের পাইলাম যে, মা শেল্‌ফ্ খুলিয়া বই বাহির করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বাবার গলা শুনিতে পাইলাম। বলিতেছেন,—“এই নেও, এই ১১৫ পৃষ্ঠা হইতে ১২৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দাগ দেওয়া জায়গাগুলি পড়িয়া দেখ। জোরে পড়।” মা পড়িতে লাগিলেন ঃ—

“শরীরের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় কপালস্থ মস্তিষ্করাশি এবং তদনুসারে মনোবৃত্তি সমুদায়ও পুরুষানুক্রমে একরূপ হইয়া আইসে। এইরূপে, জনক জননীর জ্ঞানজ্যোতিঃ স্বকীয় সন্তানে অবভাসিত হয়, এবং এইরূপেই তদীয় পুণ্য-বল সন্তানেতে প্রকাশ পায়। ও, স, ফৌবর্ সাহেব লিখিয়াছেন, শত বর্ষের অধিক হইল, এক ব্যক্তির কোন রিপু অত্যন্ত প্রবল ছিল; যখন তাহার বয়ঃক্রম ৯৫ বৎসর তখন চারি স্ত্রী থাকিতেও সে এক গৃহস্থের স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া আনে। এক্ষণে তাহার বংশোদ্ভব এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লাম্পট্য কর্ম্মে বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত আপনার কাম রিপুকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ভ্রষ্টা স্ত্রীকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে। তাহার ভগিনীদিগের বিবাহ না হইতেই সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই যে অত্যন্ত কাম-পরায়ণা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার এক

ভাগিনেয়ী চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইতেই এক জারজ সন্তান প্রসব করে। এই বংশের পুরুষদিগের মধ্যে সকলে এবং স্ত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। ফলতঃ, পিতৃ-গত মাতৃ-গত গুণ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহার দুই এক প্রমাণ কি? শরীরের অঙ্গসৌষ্ঠব, অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য, বল, পুষ্টি, দীর্ঘতা, হ্রস্বতা, কৃশতা প্রভৃতির ন্যায় মনেরও সকল প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে পুরুষানুক্রমে একরূপ হইয়া আইসে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেশেই দৃষ্টি করা যায়। সন্তান পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক নৈমিত্তিক গুণ সমুদায়ও প্রাপ্ত হয়। অপত্যোৎপাদন কালে পিতা মাতার এবং বিশেষতঃ মাতার শরীর ও মনের যাদৃশ ভাব থাকে, সন্তানের স্বভাবও কিয়দংশে তদনুরূপ হয়। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত থাকিয়া যতগুলি কন্যা পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, সকলেই পানাসক্ত, এবং সেই দুর্জ্জয় দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে পরে তাঁহাদের যত সন্তান জন্মিয়াছে, সকলেই এ বিষয়ে নিতান্ত নিস্পৃহ। কলিকাতার কোন কোন পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিই যে মদ্যপায়ী হয়, পৈতৃক দোষ ও কুদৃষ্টান্ত উভয়ই তাহার প্রধান কারণ। অবৈধ পাণিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতির দুঃখ ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলও তদুপরি বিস্তর নির্ভর করে। পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসমবুদ্ধি ও বিপরীত-মতাবলম্বী স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সত্যবাদিনী ও অতিশয় ধর্ম্মভীতা হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী ও চরিতার্থ বোধ করেন, আর তাঁহার চির-সহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরম শোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে যেরূপ অসুখ সঞ্চারের সম্ভাবনা, তাহা অনেকানেক স্বামীই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিদ্যাবান, উদার-স্বভাব, মহাশয় পুরুষের সহিত কোন বিদ্যাহীনা, কলহ-প্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। ইহার উদাহরণ সংগ্রহার্থে আর অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই; এ দেশের অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিষ্টরূপ দৃষ্টান্তস্থল। বিদ্যাবান্ পতি মানব জন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞান-রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন, ইহাতে মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মে না, এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন মতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। অতএব, এ বিষয়ে পিতা মাতার উপর কি গুরুতর ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কন্যা ও পাত্রের গুণাগুণ চরিত্র বিবেচনা না করিয়া সন্তানের বিবাহ দেন,

তাঁহারা পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তদ্দ্বারা সংসার রূপ অপার সাগরের দুঃখ-প্রবাহ প্রবল করিতেছেন, এবং আপনারাও সন্তানের দুঃখে দুঃখী হইয়া সে অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা ইহা জ্ঞাত নহেন, যে পুত্র ও কন্যা উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদের যেরূপ স্বভাব তদুপযুক্ত কন্যা ও পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতা মাতার অবশ্য পরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ। তাহা নিঃশেষে পরিশোধ না করিলে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর সমীপে সাপরাধ থাকিতে হয়। উদ্বাহ-ক্রিয়া যে কি পর্য্যন্ত গুরুতর ব্যাপার তাহা কেহ বিবেচনা করেন না। এই এক কার্য্যের উপর প্রায় ৫।৬ ভাবী জীবের মরণ, জীবন, রোগ, আরোগ্য, দুঃখ, সুখ সম্যক্‌রূপে নির্ভর করে। ইহা অতি শুভ কর্ম্ম বটে, কিন্তু যাহাতে পরিণামে অশুভ-জনক না হয়,—পুত্র-পীড়ক, সন্তান-ঘাতক, ভ্রূণঘাতী না হইতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কয় ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে? সহস্র সহস্র ব্যক্তি অযোগ্য কন্যা ও পাত্রের সহিত পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া এককালে স্ববংশ ও দৌহিত্রবংশের সুখ সৌভাগ্য জলাঞ্জলি দিতেছেন, বা তাহার উচ্ছেদ-দশা সাধনের অমোঘ সূত্র সঞ্চার করিতেছেন। এখনও সচেতন হওয়া উচিত, এবং উদ্বাহ-বিষয়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করিয়া সম্যক্‌রূপে পালন করা কর্ত্তব্য।"

মায়ের পড়া শেষ হইলে বাবা বলিলেন,—"পুত্রকন্যা বিবাহ

দিবার মত এইরূপ গুরুতর ব্যাপারে যে গার্জ্জিয়ানেরা মিথ্যার অভিনয় করে, ভগবান তাহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। বিবাহ ব্যাপারে ভুল করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। প্রত্যেক ছেলে বা মেয়ের গার্জ্জিয়ান ভাল করিয়া না জানিয়া শুনিয়া, ছেলে বা মেয়ে ভাল করিয়া না দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিলে পরে অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে। অল্প বয়সের ছেলে বা মেয়ের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সেইজন্য, তাহাদের মা-বাপের জীবন বৃত্তান্ত ও সামাজিক চালচলন ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া তবে ছেলে-মেয়ের বিবাহ ঠিক করা উচিত।* অনেক গার্জ্জিয়ান আছে তাহারা লজ্জার খাতিরে ভাবী জামাতা বা ভাবী বধূকে দেখিবার ও তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ণভাবে তত্ত্ব লইবার আয়াসটুকু স্বীকার করিতে পারে না। ইহারা বিবাহের সুখ শান্তিটা ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। ইহারা মূর্খ, কৃপার পাত্র।"†

---

* "It is an action of thy life like unto stratagem of war wherein a man can err but once. Enquire diligently of her disposition and how her parents have been inclined in their youth."—Lord Burleigh.

"My mercy was to light upon a wife whose father and mother were accounted godly."—Bunyan.

"Take the daughter of a good mother."—Fuller.

† "The great commander leaves nothing to chance but provides for every contingency."—Smiles.

বাবার কথা শুনিয়া মা বলিলেন,—"সত্যই, আজকালি মা-বাপ কোনওমতে কয়েকটা বৎসর মেয়েদিগকে অগ্নিময় আব্‌হাওয়ার ভিতর দিয়া টানিয়া ঠেলিয়া একটু বড় করিয়া জামাইদের ঘাড়ে তুলিয়া দিয়াই যেন নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করে! বোধ করি, সম্প্রদানের সময়ে বাবারা মনে মনে জামাইকে এইকথা বলে যে, মেয়েকে আপ্‌টুডেট্ (Up to date) তথা বিলাসী করিয়া গড়িয়া তুলিয়া তোমার কাঁধে চাপাইয়া দিলাম,—এখন এই হাতীকে জীবন ভরিয়া টানিয়া বুঝ—বিবাহ করা কেমন মজা! জামাইগুলি চিরজীবন জ্বলুক, পুড়ুক—তাহাতে তাহাদের কিছুই আসিয়া যায় না,—তাহাদের কর্ত্তব্য সমাধা হইয়া গেল মনে করিয়া নিজেরা একেবারে কৃতার্থ হইয়া যায়। এই সব মা-বাপ মনে করে যে, তাহাদের কন্যারা স্বামীর বাড়ী গেলেই সব সুখ ফুরাইয়া যাইবে;—থিয়েটার দেখা, বায়স্কোপ দেখা, লেকে বেড়ান—এই সর্ব্বপ্রকার ভোগের ও বিলাসের ব্যবস্থাগুলি বাপের বাড়ীতে থাকিতে না হইলে আর বুঝি হইবে না! এইভাবে যে সব মেয়ের কুমারী জীবন গঠিত হয় তাহাদের নিকট হইতে আর কী আশা করা যাইতে পারে? স্বামীর বাড়ীতে যাইয়া ভোগ করিবার জন্য কিছুই ইহারা বাকি রাখে না। মেয়েদিগকে উপযুক্ত গৃহিণী, স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, লজ্জাশীলা ও সন্তানবৎসল করিবার কোনও চেষ্টা এদেশের মা-বাপ আজকাল করিতেছে না। লজ্জাশীলা হওয়াই নারীচরিত্রের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, লজ্জাই নারীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আভরণ (Safe-guard), লজ্জাশীলা নারীই পুরুষের প্রধান আকর্ষণ। লজ্জাহীনা নারীর প্রতি কোনও পুরুষ অনুরক্ত থাকিতে পারে না। নারীকে যতই বেপরোয়াভাবে বাহিরে টানিয়া আনা হইবে, তাহার লজ্জা ততই কমিয়া আসিবে। মেয়েকে লজ্জাশীলা করিয়া গড়িয়া তুলিবার কলাকৌশলও মা-বাপের জানা থাকা প্রয়োজন। ('To make a girl shy and shameful is an art—and an art should always be diligently cultivated.') কিন্তু, আজকাল লজ্জা, ভয়, বাৎসল্য, প্রীতি, অনুরাগ প্রভৃতি নারীচরিত্রের মানসিক সদ্‌গুণরাজি ও সুপ্রবৃত্তিগুলি (Finer sentiments) ধ্বংস করিয়া অপদার্থ মা-বাপগুলি তাহাদের কন্যাগণকে রাস্তায় ছুটাইতেছে, স্কুল-কলেজে পড়াইতেছে, লাঠিখেলা, তরবারী ভাজা শিখাইতেছে। ফলে, বিবাহের পরে বিদ্যার দৌড় দেখাইবার, লাঠি ও তরবারী চালনা করিবার আর কোনওরূপ সুবিধা না পাইয়া স্বামীর সহিতই কসরৎ আরম্ভ করিয়া দিতেছে! মনুর অনুশাসন ছিল—নারীকে বাল্যে বাপের কর্ত্তৃত্বে, যৌবনে স্বামীর আনুগত্যে এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের উপদেশানুসারে চলিতে হইবে। আর এখন—'তোম্ কোন্ হায়' বলিয়া পুরুষকে উপেক্ষা করিয়া নারী ব্যাগ বগলে পুরিয়া হন্ হন্ করিয়া রাস্তায় ছুটিতেছে। ভগবানের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নারীর দেহ ও মন উভয়ই দুর্ব্বল হইয়া থাকে,—সেই নারীর এই প্রকার বিদ্রোহের ফল যাহা হইবার

তাহাই হইতেছে। কতকগুলি চরিত্রহীন পুরুষ আমার ঐকাজে সায় দিয়া বলিতেছে—"হাঁ, নারীকে বাহিরের আলো বাতাসও পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে দিতে হইবে।"—কেননা, নারী বাহিরে আসিলে এই চরিত্রহীন লোকগুলির যথেষ্ট সুবিধা হয়। অথচ, বিবেচনাহীন মেয়েরাও বুঝিতে পারে না যে, নারীজন্মের জন্য তাহারা দায়ী নয়, দায়ী হয় তাহাদের কর্ম্মের জন্য। চতুর্দ্দিকে শত শত মেয়ের বিপদ দেখিয়াও এদেশের মা-বাপেরা সাবধান হইতেছে না—এই জিনিষটাই আজ বেশী আশ্চর্য্যজনক মনে হইতেছে।

"আমরা দুইটী বোন শৈশবেই মাতৃহারা হইয়াছিলাম। কিন্তু, বাপের স্নেহে ও সাবধানতার ভিতর দিয়া যেভাবে আমরা মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলাম তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। আমাদের দুইটী বোনকে তিনি নিজে পড়াইতেন। স্বামীর প্রতি কেমন করিয়া অনুরক্ত হইতে হয়, সংসারকে কী করিয়া মধুময় করিয়া গড়িয়া লইতে হয়—এইসব উপদেশপূর্ণ শত শত গল্প তিনি আমাদের নিকট বলিতেন। বাবার নিকট হইতে আমরা ছোটকালে শুনিয়াছিলাম যে, এদেশের নারীরা স্বামীর সহিত সহমরণ বরণ করিতেন, বেহুলা তাঁহার মৃত স্বামীর পচা দেহ বক্ষে ধরিয়া ভেলায় ভাসিয়াছিলেন, তাঁহার অশ্রুর স্রোতে মহাদেবের পাষাণ হৃদয় বিগলিত করিয়া তাঁহার স্বামীর জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন; সতী রহিমা তাঁহার অন্ধ স্বামীর গলিত দুর্গন্ধময় দেহ বক্ষে লইয়া যে সাধনা

করিয়াছিলেন—খোদার আরশ সে সাধনায় কম্পিত হইল—তাঁহার স্বামীর জরাজীর্ণময় ও রোগক্লিষ্ট দেহকে খোদা চক্ষের নিমেষে নিরাময় করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। সাবিত্রী তাঁহার সাত্বিক প্রেমের তেজে নির্ম্মম যমরাজের হস্ত হইতে তাঁহার স্বামীর প্রাণ কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইলেন। প্রাণের প্রতিমার অকৃত্রিম ও সাত্বিক ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ সম্রাট শাহ্ জাহান বিশ বৎসরের সঞ্চাত অশ্রু ও প্রাণের দরদ দিয়া প্রেয়সীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাবার নিকট হইতে আরও জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সাত্বিক ভাবাপন্না ও ধর্ম্মশীলা স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া সার ফ্রান্সিস্ বরদত্ (Sir Francis Burdett) এতখানি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী রমিলির (Romilly) মৃত্যুর পর তিনি শোকে কাতর হইয়া স্নানাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীর মৃতদেহ কবরস্থ করিবার পূর্ব্বেই তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং উভয়ের মৃতদেহ এক কবরে প্রোথিত করা হইয়াছিল।* ঠিক এমনি অবস্থায়, সার আলবার্ট মর্টনের (Sir Albert

* "Sir Francis Burdett fell into such a state of profound melancholy on the death of his wife—Romilly—that he persistently refused nourishment of any kind and died before the removal of her remains from the house, and husband and wife laid side by side in same grave."

—Smiles.

Morton) মৃত্যুর পরে তাঁহার শোকাতুরা স্ত্রী যেন নিদারুণ শোক সহ্য করিয়া আর একাকী বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেন না, স্বামীর অব্যবহিত পরে তিনিও পরলোক গমন করিলেন।* স্যার উইলিয়ম নেপিয়ার (Sir William Napier) এবং তাঁহার স্ত্রী—ইঁহারাও যেন একের বিরহ অন্যে সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীর মৃত্যুর পর কয়েকদিনের মধ্যে স্ত্রীও মরণকে বরণ করিলেন এবং একটী সমাধির ভিতরে উভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।† বাবা বলিতেন যে, সাত্ত্বিক ভাবাপন্না, ধর্ম্মশীলা এবং আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্না স্ত্রীর নিকট স্বামী অনুরক্ত না হইয়া পারে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিতেন যে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক 'পিলগ্রীমস্ প্রগ্রেস' (Pilgrims Progress) প্রণেতা বানিয়নের (Bunyan)

---

* "When Sir Albert Morton died his wife's grief was such that she shortly followed him, and was laid by his side"—Smiles.

'He first deceased; she for a little tried
To live without him, liked it not, and died."
—Wotton.

† "When Sir William Napier lay on his death-bed, Lady Napier was also at the same time dangerously ill; but she was wheeled into his room on a sofa, and the two took their silent farewell to each other. The husband died first and the wife followed him and they sleep side by side in the same grave."—Smiles.

চরিত্র প্রথমে তত ভাল ছিল না। কিন্তু, বিবাহের পরেই চরিত্রবতী এবং আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্না স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি সুপথে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।* জিনজেনডোরও (Zinzendorf) নাকি স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার চরিত্রবতী স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি আর কোনও প্রকার অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন নাই। মহাপুরুষ ফারাডেও (Faraday) নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া পৃথিবীর সমস্ত প্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে পারিয়াছেন, মনকে নিষ্কলুষ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন।† ডি টকেভিলি (De Tocqueville) চরিত্রবতী স্ত্রী পাইয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাপারে ভগবান তাঁহাকে অপরিসীম সুখ ও শান্তি দিয়াছিলেন

* "Helped by the kindly influence of his wife, Bunyan was gradually reclaimed from his evil ways, and led gently into the paths of peace."—Smiles.

"Who lived so spotlessly before the world, who so wisely aided me in my rejection of a dry morality."

—Count Zinzendorf.

† "An event which, more than any other, had contributed to my earthly happiness and healthy state of mind."—Faraday.

বলিয়া তিনি উন্মুক্তপ্রাণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।* জন ষ্টুয়ার্ট মিলের (J. S. Mill) স্ত্রী নাকি এত বেশী ধর্ম্মভাবাপন্ন এবং স্বামীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন যে, মিলের মত মহাপুরুষও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, যাহা কিছু ভাল পুস্তকাদি তিনি লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর প্রভাবে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন তাঁহার প্রকৃত বন্ধু। সেইজন্য, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক 'লিবার্টি' (On Liberty) তিনি তাঁহার স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।† প্রফেসর সার হ্যামিল্‌টনের সাধ্বী স্ত্রীও তাঁহাকে কম প্রেরণা দান করেন নাই। ভিশ্ সাহেব সার হ্যামিল্‌টনের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, সার হ্যামিল্‌টনের লেক্‌চার-নোট অথবা যে সমস্ত পুস্তক তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সবই তাঁহার স্ত্রী লিখিয়া দিতেন। এই কাজে হয়ত তাঁহার স্ত্রীকে রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ করিতে

---

* "I have to thank Heaven for having bestowed on me true domestic happiness, the first of human blessings."
— De Tocqueville.

† "To the beloved and deplored memory of her who was the inspirer, and in part the author, of all that is best in my writings—the friend and wife, whose exalted sense of truth and right was my strongest incitement, and whose approbation was my chief reward—I dedicate this volume."—John Stuart Mill.

হইত। কিন্তু, স্বামীর প্রতি তাঁহার যে প্রাণের দরদ ছিল—সেই দরদের জন্য তাঁহার এই প্রকার রাত্রি জাগরণ ও অনবরত লেখনী চালনা করা মোটেই কষ্টকর মনে হইত না। এমন অবস্থাও হয়ত অনেক সময়ে হইয়াছে যে, সার হ্যামিল্‌টন সারারাত্রি জাগিয়া লিখিয়া যাইতেছেন, আর তাঁহার স্ত্রী পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেই খস্‌ড়া হইতে অন্য কাগজে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিতেছেন। পরের দিন নয়টার সময়ে সার হ্যামিল্‌টন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার স্ত্রী একখানা সোফার উপর ঘুমের আকর্ষণে ঢলিয়া পড়িয়াছেন।*

"বাবা আমাদিগকে একটিমাত্র উপদেশ দিতেন। সব সময়েই তিনি বলিতেন,—'দেখিও, যেন আমাদের বংশের এবং তোমাদের মা-বাপের স্থনাম বজায় রাখিতে পার, দুর্নাম হইতে পারে এমন কোনও কাজ করিও না।' আমাদের

* "Everything that was sent to the Press, and all the courses of lectures, were written by her, either to dictation or from a copy. This work she did in the truest spirit of love and devotion. But for it, the serene sea of abstract thought might have held him becalmed for life. His wife sat up with him night after night to write out a fair copy of the lectures from the rough sheets, which he drafted in adjoining room Sir William would be found writing as late as nine o'clock in the morning, while his faithful but wearied amanuensis had fallen asleep on a Sofa."—Vietch's Memoirs of Sir William Hamilton.

মনে হইত যে, ইহার চেয়ে বড় উপদেশ আর কিছুই হইতে পারে না। কোনও কোনও সময়ে বাবা বলিতেন—'তোমাদের মৃত্যু হইলেও বোধ করি, আমি সহ্য করিতে পারিব; কিন্তু, বিবাহের পর যদি জামাইয়েরা তোমাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হয় তাহা হইলে, সে দুঃখ আমি সহ্য করিতে পারিব না। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিও—উহার চেয়ে বড় কিছুই নাই। সতী, সাধ্বী ও ধর্ম্মশীলা স্ত্রীর সাহচর্য্য লাভ করাই পুরুষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা,—চরিত্রবতী স্ত্রী পাইলেই পুরুষ মানুষ জীবনের চরম শান্তি ভোগ করিতে পারে,—চরিত্রবতী স্ত্রীকে পুরুষ মানুষ প্রাণ খুলিয়া হৃদয়ের মধ্যে স্থান না দিয়া পারে না।* দুশ্চরিত্রা নারীর সংস্পর্শে আসিয়া পুরুষের জীবন বরবাদ হইয়া যায়, মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের শোচনীয় অধঃপতন ঘটে। এ অবস্থায় পড়িলে কোন শক্তিশালী পুরুষও আত্মসম্বরণ করিতে পারে না'।† আমি তোমাকে অনুরোধ করি, আমার হীরের সহিত ধর্ম্মভাবাপন্ন

* "The utmost blessing that God can confer on a man is the possession of a good and pious wife, with whom he may live in peace and tranquillity,—to whom he may confide his whole possessions, even his life and welfare."
—Luther.

† "There are few men strong enough to resist the influence of a lower character in a wife. She will speedily reduce him to her own level."—Smiles.

পরিবারের সুশীলা কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিও না।" বাবা বলিলেন,—"তোমাদের জীবন অতখানি সাবধানতার ভিতর দিয়া গঠিত হইয়াছিল বলিয়াইতো আজ তোমরা দুইটী বোনই পরম শান্তিতে আছ। কিন্তু, আজকাল মা-বাপেদের যেন মেয়েদের প্রতি কোনও কর্ত্তব্যই নাই। মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন মধুময় করিবার জন্য মা-বাপেরা মোটেই চেষ্টা করিতেছে না।* তাহারা মনে করে যে, মেয়ে যাহা খুশী তাহাই করুক না কেন, শুধু প্রাণে বাঁচিলেই জামাই পাওয়া যাইবে। এই সব মা-বাপ সত্যই কৃপার পাত্র। ইঁহারাইতো জুয়াচুরি ও মিথ্যা অভিনয় করিয়া তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ দেয়। ফলে, অশান্তিময় জীবন যাপন করিতে অপারগ হইয়া অনেক যুবক যুবতী এদেশে আত্মহত্যাও করে।† আজকাল মেয়ে বাছিয়া বাহির করাও দুরূহ। এ দেশের যুবকেরা যে কেন বিদ্রোহ করিতেছে না—সেইটাই আমার কাছে আশ্চর্য্যজনক মনে হইতেছে। বিবাহটা এদেশে আগে কত মধুর ছিল, এখন এদেশে বিবাহটা

---

* "There is the duty which children owe to their parents on the one hand and the duty which parents owe to their children on the other."—Smiles.

† "A good death is far better and more eligible than ill life. The longer life is not always the better."
—Henry Vane.

'দিল্লীকা লাড্ডু' হইয়া গিয়াছে,—'যো খায়া ও পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওভি পস্তায়া।"

মা ও বাপের ভিতরে এ সম্বন্ধে আরও কথা হইতেছিল। কিন্তু, মশার ও পিঁপড়ার কামড় সহ্য করিয়া রান্নাঘরের পিছনে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। আমার ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—বিবাহটা যদি এ জীবনে অন্যপ্রকার নূতন কিছু না আনিয়া দিতে পারিল তবে সে বিবাহে লাভ কি ?

তাহা ছাড়া, বাবার কথা হইতে বুঝিয়াছিলাম যে, অনেক গণ্ডমূর্খ গার্জ্জিয়ান পুত্রকন্যা বিবাহ দিতে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। উহারা সত্যই এ পৃথিবীর নরাধম কশাই। এখন বিবাহের কথা শুনিলে প্রাণ কাঁপে। যদি ঐ-প্রকার দুষ্ট প্রকৃতির কশাইয়ের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া আমার জীবন ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে তো আর এ জীবনে সে শোক সামলাইতে পারিব না !

যে বিবাহ করে নাই—সে কতটুকু পুড়িয়াছে তাহা জানি না। কেননা, আমার জীবনে বিবাহ করিবার বাসনা এমন ভয়াবহ রূপ লইয়া কোনওদিন দেখা দেয় নাই যে, উহাকে দমন করিয়া আমাকে মর্ম্মান্তিক ভুগিতে হইয়াছে। সত্য বটে,—এক সময়ে মনে হইত যে, বিবাহটা আমার জীবনের স্পর্শমণি, হয়ত কোনও প্রকারে উহার স্পর্শ পাইলে

এ ছন্নছাড়া জীবন একেবারে ধন্য হইয়া যাইবে।* কিন্তু, সে নেশা এখন আর নাই। বিবাহ করিয়া কেহ যে সুখ ভোগ করিতে পারিয়াছে তাহাতো কোনও দিন কাহারও মুখে শুনি নাই। সৌরেন বাবুর 'নিলামী ইস্তাহারের ৩ নং লাটে' স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে—"এক কবি বিবাহ করিবার পরে সংসার পালনের গুতায় কবিতা লেখা ছাড়িয়াছেন।" আমার পরিচিত যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহাদের সকলের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহার সার-সংগ্রহ করিলে কেবল এই কথা কয়টী দাঁড়ায় যে—বিদেশে বিরহ-ব্যথা আর সহ্য হয় না; স্ত্রীর পৈশাচিক আচরণ ও নিষ্ঠুরতা জীবনটাকে একেবারে বরবাদ করিয়া দিল; ছেলে-মেয়েদের অত্যাচারে, উৎপীড়নে একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া গেলাম; দশ-বারোটী ছেলে-মেয়ের সংসারে ডাক্তার ডাকিতে, পড়ার খরচ জোগাইতে, মেয়ের বিবাহ দিতে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছি। আজ নিজের মাথা-ধরা, কাল গিন্নীর অম্লশূল, পরশু ছেলেটার জ্বর। শীতকালে দুই দণ্ড লেপের মধ্যে আরামে ঘুমাইবারও যো নাই। সারারাত প্যান প্যান, ট্যা ট্যা। ছেলেমেয়ের কান্না লইয়া গিন্নীর সহিত বচসা, পরে মান অভিমানের অভিনয়। এগুলি

---

* "Family life may be full of thorns and cares, but they are fruitful: all others are dry thorns."

—Sainte Beuve.

ছাড়া আরও বিপদ আছে। ৺বঙ্কিম বাবু রায় মুচিরাম গুড় বাহাদুর যখন বিচক্ষণ ডেপুটি কালেক্টার হিসাবে চাটিগাঁ বদ্‌লী হইলেন তখন তাঁহার গিন্নী ভদ্রকালী দেবী বলিয়াছিলেন,—"তুমি যদি যাও, আমি বিষ খাইব।"

গিন্নীদের মৃত্যু-ব্যাপারও রহস্যে আবৃত। গিন্নীর শোকে অতবড় রসের খনি ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রস ফুরাইয়া গেল। তিনি গাহিয়াছেন,—

"হাস্য শুধু আমার সখা ? অশ্রু আমার কেহই নয় ?
হাস্য করে অর্দ্ধ জীবন করেছিতো অপচয়।
চ'লে যারে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়" ইত্যাদি।

মা ও বাপের মৃত্যু-শোকে মানুষকে একবার কুল্লিয়া কাঁদিতে হয়। কিন্তু, গিন্নী-মৃত্যুর আগুনে অনেককে অনেকবার জ্বলিতে হইয়াছে।

বিবাহের সহিত জড়িত হইয়া কত বড় বড় লোকের জীবন যে পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে তাহার খবর কয়জন রাখে ? আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু সুধীরের কলিজা-ফাটা রুদ্ধ মর্ম্মবেদনার কালিমা-মাখা ও বিভীষিকাময় ছবি আমার বুকের পাতায় বিবাহের যে স্বরূপ আঁকিয়া দিয়াছে তাহা আমি এ জীবনে শত চেষ্টায়ও মুছিয়া ফেলিতে পারিব না।

স্কুলে সুধীরের মত বন্ধু আমার আর কেহ ছিল না। সে ছিল সদা-প্রফুল্ল, মুখে যেন হাসিটী লাগিয়াই আছে। এই তীক্ষ্ণ, মেধাবী জ্যোতিষ্কটীর সঙ্গলাভ করিয়া আমি নিজেকে

তখন ভাগ্যবান্ মনে করিতাম। মনের প্রফুল্লতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রখর মেধাশক্তি, অমায়িক ব্যবহার, সূক্ষ্ম বিবেচনা-শক্তি ও মনের উদারতা প্রভৃতি গুণরাজির এমন পবিত্র নিখুঁত জীবন্ত মূর্ত্তি আমার চোখে আজও পর্য্যন্ত দ্বিতীয়টী পড়ে নাই।

আট বৎসর আগে একদিন একটা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহাকে বলিয়াছিলাম,—'বিবাহিত জীবনে তুমি এত সুখী হইবে যে, তোমার অন্য বন্ধুরাও তোমার সুখ ও শান্তি দেখিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরিবে।' সুধীর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"কী করিয়া বুঝিলে যে, আমি বিবাহিত জীবনে সুখী হইব?" একবার মনে হইল যে বলিয়া ফেলি যে, তোমার মত পবিত্র চরিত্রবান, সদা-উৎফুল্ল, উদার প্রকৃতির মেধাবী স্বামী পাইয়া যে নারী তোমার জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে না পারিবে, মধুরতা দিয়া তোমার প্রাণ কানায় কানায় ভরিয়া দিতে না পারিবে, সে পাপিষ্ঠার নারী-জন্ম বৃথা। অতগুলি কথা চাপা দিয়া শুধু বলিলাম,—"তুমি বড় সুন্দর সকলেই তো তোমাকে ভালবাসে।" তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য বুঝাইবার জন্য—সে বড় সুন্দর—এই কথা কয়টীর চেয়ে ভাল অভিব্যক্তি আমি আজিও খুঁজিয়া পাইতেছি না। সে-দিন সুধীর আমাকে দুই চারিটী কথায় শুধু এইটুকু জানাইয়া রাখিয়াছিল যে, বিবাহ করিয়া সকলেই সুখী হয়, নিতান্ত সর্ব্বহারা হতভাগা না হইলে বিবাহিত জীবনে অসুখী হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কথা কয়টী বলিবার সময়ে

যে একটা কাল্পনিক আতঙ্কে তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিতেছিল তাহা আমি বেশ্ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

ইহার পর সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। সুধীর বি-এ পাস করিয়া একটা সওদাগরী আফিসে মাসিক তিনশত টাকা বেতনে চাকুরী পাইল। আমি হাইস্কুলেই ঘানি টানিতে লাগিলাম। এই সময়ে সুধীরের বিবাহ হইল। বিবাহে যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু, নানা কারণবশতঃ যাইতে পারি নাই। তারযোগে বিবাহের দিন শুভাশিস্ পাঠাইয়াছিলাম,—"Wish you a sweet happy married life."

বিবাহের দশদিন পরেই একটা চিঠি পাইলাম। সুধীর লিখিয়াছিল,—"সুখের সংসার পাতিবার যে আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়াছিলাম তাহা আকাশেই শুকাইয়া গিয়াছে। এ পৃথিবীতে যাঁহারা বিবেচক ও সচ্চরিত্রবান তাঁহারাই যাহা কিছু কঠোর, অপ্রীতিকর, অন্যায় ও শাস্তিমূলক তাহা মাথা পাতিয়া বহন করিতেছে। 'অমুক ব্যক্তি ছাড়া এমন ভয়াবহ হৃদয়হীন অত্যাচার আর কেহ বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না'—এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান ও বিবেচনাপূর্ণ মানুষের বুকে সকলেই অনবরত নির্ম্মম আঘাত হানিতেছে। ইঁহারা যে-সব শোক-দুঃখ বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া যান, ভগবান নিজেও বোধ করি, সেগুলির আঘাত সহ্য করিতে পারিতেন না।* আমি যাহাদের কোনও ক্ষতি করি নাই,

* "God, who in mercy and wisdom governs the

যাহাদের সরল কথায় সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহারা আমার সরলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাকে বুক-ভাঙ্গা আঘাত দিয়াছে। অন্য মানুষের পৈশাচিকতা ও ভুলের বোঝা বহন করিবার জন্যই এ সোনার জীবন এমনি-ভাবে গঠন করিয়াছিলাম। যাহাদিগকে শিক্ষিত, অভিজ্ঞ এবং বিবেচক বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহারা হৃদয়-হীন কশাই। নেহায়েত সাদাসিধা নিরীহ প্রকৃতির গোবেচারি সাজিয়া তাহারা বাহুবিস্তার করিয়া আমাকে দারুণ প্রবঞ্চনাময় আলিঙ্গন করিয়াছে। আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন তাহারাই আমার আর্ত্তনাদ দেখিয়া প্রাণের আনন্দে হাসিতেছে। একটা শিক্ষিত অভিজ্ঞ নরপশুকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া আজ আমার এই অবস্থা। আগে বুঝিতে পারি নাই যে, কতকগুলি নরপিশাচ বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কূটনীতিবিশারদ ও প্রবঞ্চক হইয়া উঠে। ('There are those on whom experience exerts no ripening influence and, who only grow narrower, bitterer and more vicious with time.'—Dr. Johnson.) ন্যায় ও ধর্ম্মের অস্তিত্ব যদি এ পৃথিবীতে থাকিত তাহা হইলে, সেই নরপশুটার মাথায়

---

world, would never have suffered so many sadnesses and have sent them specially to the most virtuous and the wisest men."—Jeremy Taylor.

আজ বজ্রপাত হইত। জানি না, আমার এ সর্ব্বহারা জীবনের পরিণতি কোথায়।"

চিঠিটা পড়িতে পড়িতে বড় ব্যথায় আমার প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে হইল যে, সেই পরম সহিষ্ণু বিবেচক সুধীর যে-সে ব্যাপারে এতখানি বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই। হয়ত তাহার জীবনটা একেবারে বরবাদ হইয়া গিয়াছে। কী লিখিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা দিব তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

ইহার এক মাসের মধ্যেই শুনিলাম যে, সুধীর চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া, পৃথিবার সমস্ত প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিরালা একাকী প্রবাসে দিন কাটাইবার জন্য এক নিভৃত পল্লীতে চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তাহার আত্মীয়স্বজন বহু চেষ্টা করিয়াও নাকি তাহার মত বদ্‌লাইতে পারে নাই। সে নাকি তাহার ভগ্নীপতির নিকট লিখিয়াছিল,—"পৃথিবীতে অতি বড় ঘটনা যেটা সেইটাই মানুষের কাছে সহানুভূতি পায় না। স্ত্রীর পৈশাচিকতা, শ্বশুরকুলের নির্দ্দয়তা, ষণ্ডামি ও গুণ্ডামির জন্য যেখানে পুরুষমানুষের জীবন ধ্বংস হইয়া যায়, বরবাদ হইয়া যায় সেখানেও কেহই পুরুষমানুষকে সহানুভূতি দেখায় না। নারীর ব্যথা ফেনাইয়া বড় করিয়া দেখাইবার অনেক ব্যবস্থা এদেশে আছে। কিন্তু, সর্ব্বংসহ পুরুষের হৃদয় যে কত প্রকার অসহায় অবস্থায় পড়িয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায় তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবারও কেহ

নাই। এইপ্রকার বিপদের সময়ে বন্ধু-বান্ধবেরা কেবল ধর্ম্মের বাণী আওড়ায়—"ধৈর্য্য ধর, পরকালে এ অন্যায়ের বিচার হইবে। যাহা ভাগ্যে ছিল তাহাই হইয়াছে—উহাতেই সুখী থাকা বুদ্ধিমানের কাজ" ইত্যাদি। কিন্তু, মনে শান্তি নাই, জীবনে সুখ হইল না—ইহা জানিয়া শুনিয়া আত্মপ্রবঞ্চক নিরেট মূর্খ (Self-deluded fool) হইয়া বাঁচাটা যে কত বড় কষ্টকর এবং পাপময় তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না। পুরুষের এইপ্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অন্য সকলে অবজ্ঞার হাসি হাসে।"

সেই সদা-উৎফুল্ল, উদারচেতা নির্ভীক যুবকটী কেন যে হঠাৎ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সব ছাড়িয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া যে এত সহজে সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সর্ব্বপ্রকার কোমলতায়-ভরা সেই তুল্‌তুলে হাসিমাখা মুখখানি সন্ন্যাসধর্ম্মের কঠোরতায় কতখানি মলিন হইয়া গিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম।

যে নিভৃত পল্লীর একপার্শ্বে সামান্য একটা ছোট উঁচু প'ড়ো ভিটার উপরে একখানা কুঁড়ে ঘরে সে তাহার জীবনের বাকি দিন কয়টা কোনওমতে কাটাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে, সে গ্রামখানি রেল্-ষ্টেশন হইতে বেশী দূরে নহে। একখানি ধুতি ও একখানা গামছামাত্র বগলে করিয়া যখন

আমি সেই গ্রামে গিয়া প্রবেশ করিলাম তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। একজন অর্দ্ধবয়স্ক লোকের সহিত দেখা হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মশাই, সুধীর বাবু কোথায় থাকেন জানেন?" লোকটা থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"কোন্ সুধীর বাবু? সন্ন্যাসী সুধীর?" আমি সন্ন্যাসী সুধীরকেই চাই জানাইলে লোকটী আমাকে অল্পদূরে সুধীরের কুটীর দেখাইয়া দিল।

মিটিমিটি করিয়া একটা আলো জ্বলিতেছিল। আলোটী লক্ষ্য করিয়া নিস্তব্ধ সাঁঝের আলো আঁধারের মধ্য দিয়া সেই ছোট কুঁড়ে ঘরখানির সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম,—কুঁড়ে ঘরখানির দক্ষিণ দিকে একটুখানি খোলা যায়গা, সেখানে গুটীকতক বেলফুল ও গুটীকতক পাতা বাহারের গাছ। সুধীর উপুড় হইয়া তাহাদের গোড়ার মাটী খুড়িয়া আল্‌গা করিয়া দিতেছে, আর নীচ-সুরে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। আমি নিঃশব্দে তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পদশব্দ শুনিবার মত ক্ষমতা তখন বোধ করি, তাহার ছিল না। একটু মনোযোগ দিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে,—"পাগলা মনটারে তুই বাঁধ, তুই একলা ঘরে নয়ন ভ'রে কাঁদ"—এই দুইটী ছড়া প্রাণের সমস্তটুকু দরদ মিশাইয়া সে বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিতেছে। সেই গুন্ গুন্ স্বরের মধ্যেও বাষ্পোচ্ছ্বাসের ভারী গলার মৃদু কম্পন শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, তাহার শক্ত হিয়ার ভাঙ্গাটীনা —

রেস্থরে বাজিতেছে। একটা গভীর বেদনায় যেন তাঁহার গলাটা ধরিয়া গিয়াছে।

ঘরে কেরোসিন-ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তাহারই একটু রশ্মি বেড়ার ফাঁক দিয়া আসিয়া নিস্তব্ধ সাঁঝের অন্ধকার ভেদ করিয়া সুধীরের মুখে পড়িয়াছিল। স্পষ্ট দেখিলাম,— তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ছুটিয়াছে। মনে হইল,— অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসের দরদর ধারা বহিতেছে,—তাই দিয়া সে গাছের গোড়ায় জল সেচন করিতেছে। বোধ করি, তাহার চোখ-দুইটী একেবারে ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য, একবার হাত তুলিয়া চোখ-দুইটী মুছিয়া লইল।

সেই নীরব নিস্তব্ধ আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে অনেকক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল,—পাছে শুনিতে পাইয়া সে চমকিয়া উঠে। তাহার অবস্থা দেখিয়া অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমারও কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে মুখ লুকাইয়া কাঁদে নাই—সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না। কিন্তু, কোন্‌খানে, কবে, কী আঘাত লাগিয়া একজনের হৃদয় চিরিয়া যায়, চঞ্চল হইয়া উঠে—অন্য কেহ তাহা জানিতেও পারে না। সে আপনার মনে কাঁদিয়া যায়, না কাঁদিয়া সে থাকিতে পারে না। কিন্তু, তাহার সেই হৃদয়-মথিত অশ্রুবিন্দুতে কতদিনের গভীর সুখ-দুঃখের

স্মৃতি লুকাইয়া আছে তাহা সে নিজেই জানে না, পরকেও জানাইতে পারে না।* হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া যাহা বাহির হইয়া পড়ে তাহাই অশ্রুজল,—উহা হৃদয়ের সুগভীর বেদনার উচ্ছ্বাস, নীরব ভাষা।

গাছ কয়টার গোড়ার মাটী আল্‌গা-করা শেষ করিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতে পাইল। সুধীর আমার স্তব্ধ কঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমেষে নিজেকে সামলাইয়া লইল। ম্লানমুখে হাসির আভা ফুটাইতে বৃথা চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কী হে, তুমি কখন এলে? কোথা হ'তে?" তাহার গলাটা যেন কাঁপিয়া গেল। মনে হইল,—সে যেন কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল, কত অপটু, কত অসহায়। সে যেন সর্ব্বহারা হতভাগা। আমি যেন মর্ম্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িলাম, দুঃখে ও শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। নিজেকে সামলাইয়া রাখিবার সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিলাম। আমার বাক্‌রোধ হইল।

আমার নিস্তব্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া সে সমস্তই বুঝিল। হাত ধরিয়া বলিল,—"এস ভাই, ঘরে এস।"

---

* "It seems to me impossible in the actual state of society for any man to exhibit his secret heart, the details of his character as known to himself, and above all, his weaknesses and his vices to even his best friends."

—Chamfort.

গিয়া বাহিরের উনানে আগুন ধরাইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বাকস্ফুরণ হইতেছিল না, আমি হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম।

বোধ হয়, মনটাকে একটুখানি হাল্‌কা করিবার জন্য সে বৃথা চেষ্টা করিল। আমাকে শুনাইয়া জোরে জোরে বলিতে লাগিল ঃ—

"আমি চাই ছোট ঘরে বড় মন ল'য়ে,
নিজের শ্রমের অন্ন খাই সুখী হ'য়ে।"

আমিও সুযোগ পাইয়া দুই একটা কথা বলিলাম। তাহার নিজের জন্য ভাত ও ডা'ল আগেই রান্না করিয়া রাখিয়াছিল। আমার জন্য যে চা'ল কয়টী উনানে চড়াইয়াছিল তাহা নামাইয়া লইয়া সে আমাকে বলিল—"এস ভাই, হাত মুখ ধোও, ভাত খাইগে চল।" আমাকে হাত মুখ ধুইবার জল দিয়া সে থালা দুইখানি ধুইয়া লইল। দুইজনে খাইতে বসিলাম। চোখ তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম,—তাহার চোখে অবিরল ঝরণা-ধারা বহিতেছে। আমার মনে হইল যেন, আর এক ঘণ্টা তাহার সহিত থাকিলে তাহার সেই ব্যথার তাপে আমি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইব। তাড়াতাড়ি নাকে মুখে দুইটা গিলিয়া হাত ধুইলাম। বলিলাম, ট্রেনে বড় কষ্ট হইয়াছে, আমি এখন শুইগে। একটা মাদুরের উপর একটা ময়লা বালিশ ফেলিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম,—বুকে যাহার দীর্ঘ নিশ্বাসের শেল বিঁধিয়া আছে, অনবরত যাহার

চোখ দিয়া জল গড়াইতেছে তাহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আশা ভরসা কিছুই নাই।

থালা-বাসন ও হাঁড়ি ধুইয়া রাখিয়া সে আমারই পার্শ্বে একটুখানি যায়গা করিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। বোধ করি, সে মনে করিয়াছিল যে, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, কলিজা-ফাটা উচ্ছ্বাসগুলি সে নীরবে নিঃশব্দে চাপিয়া যাইতেছে। নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। ডাকিলাম,—'সুধীর'! কোনও সাড়া দিল না। তাহার হৃদয়ে যে বহ্নি জ্বলিতেছিল তাহার শিখার আভাস পাইলাম। তাহার বালিশটাতে হাত দিয়া দেখিলাম— নীরব অশ্রুতে সেটা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। সে সমস্ত বুঝিতে পারিল। আর বোধ করি, সহ্য করিতে পারিতেছিল না। বামহস্তে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া বাহিরে বসিয়া রহিল। মনে হইল,—শূন্য আকাশের নীচে প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ নিরালা অশ্রু বর্ষণ করিতে পারিলে তাহার হৃদয়টা হাল্কা হইয়া যাইবে—এই ভাবিয়া হয়ত সে বাহিরে গিয়াছে। ক্রন্দন, শোক, বেদনা, উচ্ছ্বাস—যাহার যাহা থাকুক না কেন, তাহা স্বাভাবিক নিয়মে কমিয়া আসে। কিন্তু, সুধীরের বেলায় ওগুলি যে কেবল বাড়িতেছে! এই যে তিল তিল করিয়া সে মরণের পথে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে,—ইহার জন্য কোন্ হৃদয়হীন নির্ব্বোধ পাপিষ্ঠ দায়ী তাহা জানি না। তবে, এইমাত্র

বুঝি যে, যদি কেহ স্ব-সুখ বাসনার অপরিমার্জ্জিত নিষ্ঠুর বেদির নিকট ন্যায়, ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনীকে অ-ভ্রূভঙ্গে বলিদান করিয়া এই নিরপরাধ জীবনটীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে,—উহার সোনার কোমল তনু আগুনে পোড়াইয়া আনন্দে খল খল করিয়া হাসিয়া থাকে; তবে, ইহকালে না হউক, পরকালে সে অন্যায়ের বিচার হইবে। যে ভণ্ড-তপস্বী সাধুতার প্রতারণা-জাল বিস্তার করিয়া, উহার সরল বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া—উহার জীবনের সমস্ত সুখ ও শান্তি কাড়িয়া লইয়াছে—ভগবানের হাতে তাহার নিস্তার নাই।

সারারাত্রি নানাপ্রকার উত্তেজনার মধ্যে আর ঘুমাইতে পারিলাম না। 'শরীরের দিকে একটু নজর রাখিও, তোমার কাছে আর কিছুই চাহি না'—এই কথা কয়টা সুধীরকে বলিয়া পরের দিন ভোরের ট্রেন ধরিবার জন্য যাত্রা করিলাম। আসিবার সময়ে সে বলিয়াছিল,—"সংসার, সংসারের আনন্দ—ইহার কোনটীতেই আমার আর অধিকার নাই। মনের সুখ ও শান্তি ধ্বংস হইলে পৃথিবীতে বাচিয়া আর কী লাভ আছে তাহাতো জানি না।* তিল তিল করিয়া মরিতেছি। জানি না কতদিনে চিরশান্তিময় মরণ আমাকে টানিয়া লইবে। অপমান, লাঞ্ছনা ও গ্লানি যে কত কুড়াইতে হইবে তাহাও জানি না। যে-স্থান সকল দীন-দুঃখীর শেষ আশ্রয়, সব ত্যাগ করিয়া

* "What is the loss of fortune to the loss of peace of mind?"—Captain Basil Hall.

সেইখানে আসিয়াছি। ভগবান এ দ্বার বন্ধ করিবেন না—এ বিশ্বাস আমার আছে। যদি পার, তোমরা আমাকে মাফ্ করিও।"

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু, এই অভিজ্ঞতা লইয়া আসিলাম যে, সারা-জীবন জীবন্মৃত হইয়া থাকাই বিবাহিত জীবনের চরম সার্থকতা। নিস্ফলতার দুঃখ সারা-জীবন বহিয়া বেড়ান এবং জীবন-ময় অশ্রু বর্ষণ করাই বিবাহিত জীবনের সাধনা।

'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' * সোজনের আত্মহত্যার পূর্ব্বে তাহার করুণ বাঁশীর সুর কানে শুনিয়াছিলাম। সকাল-বেলায় সোজন ও দুলালীর নিস্পন্দ মৃত-দেহদুইটী দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু, সুধীরের নীরব অশ্রু ও রুদ্ধ উচ্ছ্বাস তাহার জীবনটাকে যে তিল তিল করিয়া পোড়াইয়া খাক্ করিয়া দিতেছে তাহা স্মরণ হইলে আমি এমন মর্ম্মবেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়ি যে, আমার হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া একটা নিস্ফল অস্থিরতা উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠে।

এই সঙ্গে আজ মনে পড়িতেছে ৺শরৎ বাবুর 'গৃহদাহের' মহিম—যে দারুণ অন্তর্দাহে পুড়িয়াছিল—তাহার কথা। কিন্তু, সেখানেও আশার ক্ষীণরশ্মি দেখিতে পাই। মহিম ডিহ্রীতে অন্ধকার রাত্রিতে চলিয়াছে। অচলাও পিছনে

* 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কবি জসীম উদ্দীনের কাব্যগ্রন্থ।—গ্রন্থকার।

ছুটিয়াছে! অচলা মহিমকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"আমি কী ক'রব ব'লে দেও।" মহিম বলিতেছে,—"আমি কী ক'রে বলব? তুমি তো আমার সঙ্গে পথ-চল্‌তে পারবে না!" অচলা বলিতেছে,—"তুমি আমার হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, আমি তা'হলে চল্‌তে পারব।" দুইজনে পথে চলিতেছে। অচলা হঠাৎ প্রশ্ন করিতেছে,—"এ পথ কোথায় চলেছে?" মহিম বলিতেছে,—"জানি না।" অচলা বলিতেছে,—"এ যাত্রা থাম্‌বে কখন? কী ক'বে?" মহিম বলিতেছে,—"তাও জানি না।" তবুও তাহারা দুইজনে একই পথে চলিতেছে। কিন্তু, সুধীর যে পথও হারাইয়াছে। ৺বঙ্কিম বাবুর গোবিন্দলাল নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কবিবাব জন্য ঘর ছাড়িয়াছিল,—সমস্ত সুখ ও শান্তি বিসর্জ্জন দিয়াছিল। সেই অপরাধীর জন্য আমাদের সহানুভূতি হয় না। ভ্রমবের দুঃখে আমরা কাঁদিয়া বুক ভাসাই। সুধীরের অবস্থা ভাবিতেও আজ আমার কলিজাটা ফাটিয়া যাইতেছে। তাহার কী উপায় হইবে? সে-তো কাহারও ক্ষতি করে নাই! তবে তাহার উপর এ অবিচার কেন করা হইল? তাহার জীবনের পরিণতিইবা কোথায়?

যদি বিবাহের পর বাকি দিনগুলি শুধু জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেই হয়; যদি স্ত্রীর নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা, সন্তানাদির দৌরাত্ম্য—এইগুলি জীবনের সম্বল হইয়া দাঁড়ায়; যদি স্বার্থপরতার প্রবঞ্চনায় পড়িয়া নীরবে রুদ্ধ আবেগ চাপিয়া



তাহার জীবনের পরিণতিইবা কোথায় ?

অবিরত অশ্রু বর্ষণ করাই বিবাহিত জীবনের চরম সার্থকতার নিদর্শন হয়, তাহা হইলে, অমন বিবাহ-বিভ্রাট যেন আমার জীবনে না ঘটে। জীবন লইয়া টানা-হেঁচড়া আমি করিতে পারিব না।

বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়াটা মানুষের প্রকৃতিদত্ত ও জন্মগত অধিকার (Natural birth-right of a man)।

স্বার্থসিদ্ধির মোহে পড়িয়া, প্রবঞ্চনা ও জুয়াচুরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মানুষের সেই অধিকার হইতে নিরপরাধ নরনারীকে বঞ্চিত করা নিশ্চয়ই অধর্ম্ম এবং মহাপাপ। অথচ, এদেশে যখন তখন, যেখানে সেখানে সেই অধর্ম্ম ও মহাপাপ নির্ভয়ে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া এ-ধারণাও আজ আমার জন্মিয়াছে যে, এখানে সুখের সংসার পাতাইবার জন্য যাঁহারা উপদেশ দেন তাঁহারা নিঃস্বার্থে উহা করেন না। বিবাহ না করিলে মা-বাপের নাম রক্ষিত হইবে না, বংশের লোপ ঘটিবে, জাতির পরিপুষ্টি সাধিত হইবে না—এই সব স্বার্থপর পরোপকারের বাণী ব্যতীত বিবাহের পক্ষে খাড়া করিবার মত কোনও যুক্তি আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। অতএব, অন্য সব ব্যাপারের মত বিবাহটাও আমার জীবনে একটা গোল পাকাইয়া রাখিয়াছে।

